বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ

অমলেন্দু দে

বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ

অমলেন্দু দে

রত্না প্রকাশন
১৪/১, পিয়ারী মোহন রায় রোড
কলিকাতা-২৭

প্রকাশক : শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে
রত্না প্রকাশন
১৪/১, পিয়ারী মোহন রায় রোড, কলিকাতা-২৭

প্রথম প্রকাশ : ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮১
৯ মে, ১৯৭৪

প্রচ্ছদ : শ্রীখালেদ চৌধুরী

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : শ্রীসন্তোষ কুমার চন্দ্র
প্যারাডাইস প্রিণ্টার্স
১৩২, বি, কে, পাল এভিনিউ, কলিকাতা-৫

মূল্য : ৬৫·০০ টাকা

Bangali Buddhijibi O Bichchinnatabad
(Bengali Intelligentsia and Separatism)
by Amalendu De, Lecturer in History,
Jadavpur University, Calcutta-32.

Price : Rs. 65·00

শ্রদ্ধার্ঘ

পিতৃদেব শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দে পূজ্যবরেষু

যাঁর নিকট হতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা
আলোচনার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলাম

ভূমিকা

এই গ্রন্থের সময়কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ভারত বিভাগ পর্যন্ত প্রসারিত। এই গ্রন্থে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই হিন্দু ও মুসলিম প্রধান দুইটি সম্প্রদায়ের অসমান বিকাশের ফলে বাঙালী জীবনে বিচ্ছিন্নতাবাদের উপকরণসমূহ ক্রমপ্রসারিত হয়। সমগ্র বাঙালী জীবনের পটভূমিতে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক আলোচনা না করলে বাঙালী জীবনের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। অথচ এক সীমিত পরিসরে দীর্ঘকালব্যাপী জটিল ও ঘটনাবহুল বিষয় আলোচনা করা এক দুঃসাহসিক কাজ। তাছাড়া বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, সংখ্যাতত্ত্ব, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের ওপর যথেষ্ট নির্ভর করতে হয়। এইসব বিষয়ের পরস্পর নির্ভরশীলতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এইসব তথ্যের সাহায্যে ইতিহাস রচনা কেবলমাত্র সুযোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। এই বিষয়ে আমার যে বিশেষ দক্ষতা নেই, সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। তবুও অনেক বছর ধরে এখানে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে যে সামান্য চর্চা আমি করেছি এবং সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি প্রান্তর যেভাবে ঘুরে বেড়িয়ে এখানকার জল, মাটি ও মানুষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তার ফলেই এই দুঃসাধ্য কাজে হাত দিতে ভরসা পেয়েছি। আমি গ্রামবাংলা ও শহুরে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী জীবনকে দেখার চেষ্টা করেছি। স্বভাবতই এই আলোচনায় ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থষ্ট ভূমি ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব

আরোপ করা হয়েছে। বস্তুতঃ ভূমি ব্যবস্থার মূল কাঠামোটি ভিত্তি করেই বাঙালী জীবনের সংঘাতের চিত্রটি অঙ্কন করেছি। আমি হিন্দু-ব্রাহ্ম বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি মুসলিম সমাজের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা, আর কি পরিবেশে শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানেরা আত্মপ্রতিষ্ঠালাভে সচেতন হন, তা বিশ্লেষণ করেছি। প্রসঙ্গতঃ বাঙালী মুসলিম সমাজের একটি সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরেছি। যে কাঠামো গঠন করে ও স্তরভাগ করে সমগ্র বিষয়টি এখানে আলোচনা করেছি তা একান্তই আমার নিজস্ব। এক বৃহৎ ও জটিল পটভূমিতে বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিক কারণেই সব ঘটনার ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব হয়নি। তবুও যেসব বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বিষয়টি আলোচনা করেছি, তা কতটা সার্থক হয়েছে তা বিচারের ক্ষমতা কেবলমাত্র পাঠক সমাজেরই রয়েছে।

এই গ্রন্থের নামকরণ দেখে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ঃ কি অর্থে এখানে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' শব্দটি চয়ন করা হয়েছে ? আমি ইংরেজি 'separatism' শব্দের বাংলা করেছি 'বিচ্ছিন্নতাবাদ'। হিন্দু মুসলিম বিভেদ বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছি। যেহেতু ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশভাগের সময় পর্যন্ত ঘটনাবলী এখানে আলোচিত হয়েছে সেজন্য 'বাংলাদেশ' শব্দটি সমগ্র বাংলাদেশ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। আর অনেক সময় অগ্রসর হিন্দু-ব্রাহ্মদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে কেবলমাত্র 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহার করেছি।

এই গ্রন্থের তিনটি অধ্যায়ের রচনাকাল ১৯৭২-১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হলেও দীর্ঘকাল ধরে আমাকে এই গ্রন্থের মাল-মশলা সংগ্রহ করতে হয়। প্রধানতঃ যেসব জায়গা থেকে এই গ্রন্থের জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছি, তা এখানে উল্লেখ করা হল ঃ (ক) নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্র—বাংলা একাডেমী, ঢাকা ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী ;

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলোজি বিভাগ; ঢাকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অফিস; 'সওগাত' মাসিক পত্রের সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাহেবের নিজস্ব লাইব্রেরী ও তাঁর অপ্রকাশিত রচনা-বলী। (খ) ভারতবর্ষ—ন্যাশন্যাল আরকাইভস অব ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লী; নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এণ্ড লাইব্রেরী, তিনমূর্তি, নিউ দিল্লি; স্টেট আরকাইভস, কলকাতা; সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, কলকাতা; ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, কলকাতা; এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা; কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ লাইব্রেরী; অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস; কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় লাইব্রেরী; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী; কেরী লাইব্রেরী, শ্রীরামপুর; কয়েকটি পারিবারিক লাইব্রেরী। এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর যে অপ্রকাশিত ডায়েরী আছে তা থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। কলকাতার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত ও প্রকাশিত রচনাবলী আমার খুবই কাজে লাগে। আমি এই দুটো প্রতিষ্ঠানের ফিল্ড স্টাডির ফলাফল দেখে নিজের চিন্তাকে অনেকটা স্বচ্ছ করতে পারি। এই গ্রন্থের দুটো ম্যাপই সংগ্রহ করেছি প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ সম্পাদিত 'সংখ্যা' পত্রিকা থেকে ('Sankhya' vol. 7, Part 4, July, 1946).

অনেক অপ্রকাশিত, দুষ্প্রাপ্য ও অব্যবহৃত তথ্যের সাহায্যে এই গ্রন্থ রচনা করেছি। 'তথ্য নির্দেশে' তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্যসমূহ বিশ্লেষণও করেছি। নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে রক্ষিত তথ্যসমূহ এবং ওখানকার প্রখ্যাত লেখক ও গবেষকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারায় আমার খুবই সুবিধা হয়। মুসলিম সমাজের সমস্যা আলোচনায় কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেও উপকৃত হয়েছি। এই গ্রন্থে স্বরাজ্য পার্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। কারণ হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের

জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আন্তরিক প্রয়াস খুবই উল্লেখযোগ্য। স্বরাজ্য পার্টি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখি নয়াদিল্লির ন্যাশন্যাল আরকাইভস-এ নিম্নে উল্লিখিত তথ্যসমূহ পাঠানো হয়নি (Not Transferred to National Archives of India): (১) Election Manifesto of the Swaraj Party (Home-Political—File No. 252 of 1923); (২) Report of a Speech made by C. R. Das at Madras on 31st May, 1923 (Home-Political—File No. 167 of 1923). এই কারণে এই দুটো ডকুমেন্ট আমার পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। তবে আমি সরকারী ও স্বরাজ্য পার্টির সূত্র থেকে যেসব তথ্য পেয়েছি তাতে স্বরাজ্য পার্টির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

এবার এই গ্রন্থের তিনটী অধ্যায়ের রচনা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। আমি ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে রামমোহনের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কয়েকটি আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করি। তখন যেভাবে আমি বাংলার নবজাগরণের বিষয় আলোচনা করি তাতে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই আমার বক্তব্য বিষয় লিখে প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। তার ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই তা লিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক (অবসর-প্রাপ্ত) ডঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ মহাশয়কে দেখাই। তিনি যত্নসহকারে সমগ্র রচনাটি পড়ে 'ইতিহাস' পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ইতিহাস পত্রিকায় বাংলা ১৩৭৯ সালের কার্ত্তিক-পৌষ মাস থেকে রচনাটি ধারাবাহিকভাবে বাংলা ১৩৮০ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয় [ইতিহাস, নবপর্যায়, এই প্রবন্ধ প্রকাশের সময়কাল: (ক) রামমোহন, কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৭৯; (খ) রাধাকান্ত দেব, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮০; (গ) ডেভিড হেয়ার, শ্রাবণ-পৌষ, ১৩৮০; (ঘ) বাঙালী মুসলিম সমাজে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন এবং (ঙ) জাতীয়

চেতনা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি রচনায় কৃষক বিদ্রোহের ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিচালিত উদারনৈতিক-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভূমিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৮০]। তবে রচনাটির কোন কোন অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে 'ইতিহাস' পত্রিকায় প্রকাশ করেছি, যথা— বাঙালী মুসলিম সমাজে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন। আর 'ইতিহাস' পত্রিকায় 'ভারতীয় সামন্ততন্ত্র' ও 'কৃষক বিদ্রোহগুলির' ওপরে যে সব মতামত ব্যক্ত করেছি, তা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিনি। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে 'ইতিহাস' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার একটু পার্থক্য আছে। তবে যেভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে আমি বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি ঠিক সেইভাবেই বিষয়টি এখানে উল্লেখ করেছি।

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় অধ্যায় রচিত হয়। আমি ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম দিকে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাসেম মুহম্মদ আবদুল আলিম এর নিকট হতে মে মাসে ঢাকায় বাংলাদেশ ইতিহাস কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণপত্র পাই। এই ইতিহাস কংগ্রেসের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ। তাঁরা এই কংগ্রেসের জন্য আমাকে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলেন। এই উপলক্ষে আমি 'বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদের পটভূমি রচনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রভাব' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করি। ১৪ মে (১৯৭৩ খ্রী) যে অধিবেশনে আমার প্রবন্ধটি পেশ করা হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন ডঃ হবিবুল্লাহ। আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করে। ঢাকা শহরের বিখ্যাত দৈনিক 'ইত্তেফাক' কাগজে আমার প্রবন্ধের সমস্ত অংশই ফুট নোট বাদ দিয়ে তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (দ্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ মে, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা : ৯-১০ ; ২৭ মে, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা : ১০ ;

৩ জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ঃ ৯-১০)। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সহ-সম্পাদক জনাব রাহাত খান খুবই আগ্রহ করে এই প্রবন্ধটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-অক্টোবর মাসে এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় রচিত হয়। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুলাই বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আবদুল মমিন চৌধুরী একটি পত্রে আমাকে ফজলুল হক জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ইতিহাস সমিতি কর্তৃক আয়োজিত 'ফজলুল হকের জীবন ও সময়কাল' বিষয়ক সেমিনারে অংশ গ্রহণ ও একটি প্রবন্ধ পড়বার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তার ফলেই 'বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ঃ একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা' নামক প্রবন্ধটি রচনা করি। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর যে অধিবেশনে আমার প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করি তাতে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ আবদুল করিম। আমার প্রবন্ধের ওপর অনেকেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ছাত্ররা সমগ্র রচনাটি টাইপ কপি করে নিজেদের মধ্যে বিতরণ করেন। ঢাকার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বিচিত্রা' (১৬ নভেম্বর, ১৯৭৩) আমার প্রবন্ধের সারাংশ প্রকাশ করে। উল্লেখযোগ্য এই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ মফিজুল্লাহ কবীর, ডঃ আবদুল মমিন চৌধুরী, ডঃ সিরাজল ইসলাম, ডঃ কে. এম. মহসীন ও ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য বন্ধুদের আগ্রহেই এই প্রবন্ধটি রচনা করেছি।

সুতরাং এই গ্রন্থের প্রধান দুটো অধ্যায় বাংলাদেশের প্রবীণ ও তরুণ ঐতিহাসিক-গবেষকদের আগ্রহের ফলেই রচিত হয়। আজ যখন প্রবন্ধ দুটো পূর্ণাঙ্গরূপে এই গ্রন্থে প্রকাশিত হল তখন তাঁদের সকলের কথাই আমার বারে বারে মনে পড়ছে এবং তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গ্রন্থ রচনায় আরও কয়েকজনের নিকট হতে সাহায্য ও অনু-প্রেরণা পেয়েছি। ডঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ প্রথম অধ্যায় পড়ে আমাকে এই বিষয়ে লিখতে উৎসাহিত করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) ও বর্তমানে ইউ. জি. সি. অধ্যাপক ডঃ জগদীশ নারায়ণ সরকার এই গ্রন্থের তিনটি অধ্যায় যত্নসহকারে পাঠ করেন এবং অবিলম্বে আমার বক্তব্য বিষয় গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করতে উপদেশ দেন। ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজের বিষয়ে লিখতে গিয়ে যখনই কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি তখনই তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ হওয়ায় আমার খুবই সুবিধা হয়। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস পাঠ করার সুযোগ না পেলে আমার পক্ষে আধুনিক ভারতের মুসলিম সমাজ আলোচনায় প্রবেশ করা দুঃসাহস হত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করার ফলে কৃষকদের প্রতি লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের মনোভাব এবং কেশব চন্দ্র সেনের ভূমিকা বুঝতে আমার বিশেষ সুবিধা হয়। বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরী ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক ডঃ অম্বিকা ঘোষের সঙ্গে ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ের ভূমি ও কৃষক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারায় এই বিষয়ে আমার চিন্তা অনেক স্বচ্ছ হয়। ইন্‌স্টিটিউট অব হিস্টরিকাল স্টাডিজের ডিরেক্টর ডঃ শিবপদ সেন আমার লেখা সম্পর্কে যেভাবে নিয়মিত খোঁজ-খবর নেন ও ইন্‌স্টিটিউটের কাগজে প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন তাতে আমি খুবই অনুপ্রেরণা লাভ করি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটার অধ্যাপক নিশীথ রঞ্জন রায় আমার রচনা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে উৎসাহিত

করেন। প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক শ্রীকালিপদ বিশ্বাস আমার গ্রন্থ 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক' পড়ার পরেই আমাকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলমানদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে উপদেশ দেন। পরে তিনি 'দৈনিক ইত্তেফাক' কাগজে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধটি পড়ে খুশী হয়ে আমাকে আমার বক্তব্য বিষয় গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করতে বলেন। তাঁর মত একজন বিদগ্ধ সাংবাদিকের সস্নেহ উপদেশ আমাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করে। বলা বাহুল্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকর্মীরা সব সময়ে আমাকে উৎসাহিত করেন।

এই গ্রন্থ রচনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিনয় ভূষণ রায় নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহায্যেই রাধাকান্ত দেব লিখিত দুষ্প্রাপ্য ও অব্যবহৃত রচনা সংগ্রহ করতে পেরেছি (এই গ্রন্থের ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা ও পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য)। আর নির্দেশিকাটিও তিনি তৈরি করে দেন। কেরী লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীসুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় এই লাইব্রেরী থেকে তথ্য সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেন। শ্রীশোভন বসু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট আরকাইভসে তথ্য সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেন। চেতলা নিবাসী শ্রীঅসিত নাথ চন্দ্র তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরী আমাকে ব্যবহার করার সুযোগ দেন। ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীমতী সুলেখা ভট্টাচার্য কয়েকখানি গ্রন্থ আমাকে ব্যবহার করতে দেন। রত্না প্রকাশনের শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দে, শ্রীমতী ঝর্ণা মিত্র ও শ্রীসমীর মিত্র উদ্যোগী হয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করাতেই এই গ্রন্থ দ্রুত প্রকাশ করা সম্ভব হল। বর্তমানের ভয়াবহ বিদ্যুৎ সঙ্কট সত্বেও প্যারাডাইস প্রিন্টার্স যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে মুদ্রণের দায়িত্ব পালন করেন। প্রুফ দেখার সময়ে প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে আমাকে নিয়মিত সাহায্য করেন চেতলা নিবাসী শ্রীমোহনলাল মণ্ডল (টুলু)। আর

দুইটি ম্যাপ প্রকাশে সাহায্য করেন শ্রীঅরুন গুপ্ত (স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী, কলেজ স্ট্রীট)। প্রখ্যাত শিল্পী খালেদ চৌধুরী প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেন। আর এই গ্রন্থের নামকরণ করেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী নাসিমা বানু।

বিদ্যুৎ সংকটের ফলে হ্যারিকেনের আলোয় প্রুফ দেখতে বাধা হওয়ায় কয়েকটি মুদ্রণ ত্রুটি থেকে গেলো। সেজন্য পাঠকবর্গের নিকট মার্জনা প্রার্থনা করছি।

যাঁদের নিকট হতে সাহায্য পেয়েছি ও অনুপ্রেরণালাভ করেছি তাঁদের প্রত্যেককেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

অমলেন্দু দে

২৫শে বৈশাখ, ১৩৮১ সাল
ইংরেজি, ৯ মে, ১৯৭৪
লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা-৩২

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলার নবজাগরণ ঃ কয়েকটি প্রশ্ন

সম্প্রতি রামমোহনের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে নতুন করে রামমোহন ও বাংলার নবজাগরণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। স্বভাবতই অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের মনে অনেক প্রশ্ন জমা হচ্ছে। আমার মনেও যে সব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তাই এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এই আলোচনার প্রধানতঃ দুটো অংশ আছে ঃ (১) রামমোহন, রাধাকান্ত ও ডেভিড হেয়ার-এর ভূমিকা; (২) মুসলমান সমাজে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন।

(১) রামমোহন, রাধাকান্ত ও ডেভিড হেয়ার ঃ

(ক) রামমোহন রায় (১৭৭২?—১৮৩৩ খ্রী)—রামমোহন প্রসঙ্গে কোন কোন লেখক এমনভাবে বিভিন্ন ঘটনাবলী পরিবেশন করেন যার ফলে সমসাময়িক ভারত ইতিহাসের পটভূমিকায় রামমোহনের ভূমিকা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে না, আর ইংরেজ শাসনের প্রকৃত রূপটিও ধরা পড়ে না। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে ঃ রামমোহনের আগেও কি ধর্ম-সমাজ সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়? তার কি কোন প্রভাবই আমাদের জীবনে ছিল না? প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে উদার যুক্তিশীল মননের পরিচয় আমরা পাই। আর নানাভাবে তার প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগেও আমাদের জীবনে উদারতা ও যুক্তিশীলতার একটি প্রবাহ বিদ্যমান ছিল। অবশ্য বিভিন্ন যুগে এই ধারাটি নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকরূপে রামমোহনের আবির্ভাবের পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে হিন্দু সমাজের মধ্যে কয়েকটি ধর্মীয় গ্রুপ

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের সপক্ষে, জাতিভেদ প্রথা ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়। কয়েকটি গ্রুপের নাম এখানে উল্লেখ করা হল: কর্ত্তাভজা, বলরামী, খুশী বিশ্বাসী, সাহেবধনী, রামবল্লভী, জগমোহনী, ন্যাড়া, সহজী, আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই, সংযোগী, যত্নপাতিয়া প্রভৃতি। হিন্দুসমাজের নীচু তলার অব্রাহ্মণ সংস্কারকেরাই কলকাতার বাইরে মফস্বল অঞ্চলে এই সব ধর্মীয় গ্রুপ গঠন করেন। অবশ্য কোন কোন গ্রুপের শাখা কলকাতাতেও ছিল। মুসলমানেরাও কোন কোন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন। এই সব গ্রুপের উপর সহজমত, নাথমত ও নিরঞ্জন মতের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাছাড়া তাদের উপর মুসলমান ভাব ও সাধনার প্রভাবও পড়ে। কবীর, দাদূ প্রভৃতির প্রভাবও খানিকটা পাওয়া যায়। এরা "জাতি, পংক্তি, প্রতিমা ও শাস্ত্র মানেন না।" এদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম বলেও "কোন বাদ-বিবাদ" নেই। কোন কোন গ্রুপে মুসলমান গুরুর নিকট ব্রাহ্মণ পর্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করতে পারত। কোন কোন গ্রুপের মুসলমান সভ্যসহ প্রায় কুড়ি হাজার সভ্য ছিল। কর্ত্তাভজাদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অক্ষয় কুমার দত্ত লেখেন যে, "লক্ষ লক্ষ লোক এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।" এদের যে গণভিত্তি ছিল তা এই সব তথ্য থেকে বোঝা যায়। এইসব ধর্মীয় গ্রুপ হিন্দু সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে আঘাত করে এবং এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। মনে রাখা দরকার, এই সব গ্রুপের সাধকেরা কেউ ইংরেজি শিক্ষিত ছিলেন না অথবা ইংরেজ কর্মচারীদের সংস্পর্শেও আসেন নি। এইসব গ্রুপের প্রভাব রামমোহনের উপর কতটা পড়েছে তা নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনার অবকাশ আছে। তবে এইসব গ্রুপের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ইংরেজ শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে ভারতবর্ষের সবটাই মধ্যযুগীয় তমিস্রায় আচ্ছন্ন ছিল না। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে রস আহরণ করে অনেক সাধক ও সংস্কারকের

আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা গ্রাম বাংলায় আলো বিকিরণ করেছিলেন —এক উদার মানবতাবাদী ভাবধারা প্রচার করেছিলেন। আমরা কলকাতা শহরের প্রভাবশালী শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীদের কথাই মনে রেখেছি। কারণ কর্মে ও চিন্তায় আমরা নিজেদের তাঁদেরই আত্মজ মনে করি। গোটা বাংলার প্রাণ প্রবাহের অংশীদাররূপে নিজেদের ভাবতে পারি না। তাই গ্রাম বাংলার সংস্কারকদের কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। অথচ এইসব গ্রুপের গণভিত্তি রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসভার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও এই ধরণের ধর্মীয় গ্রুপের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধর্মীয় গ্রুপগুলির (অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর) ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে এদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[১]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার, বাংলা দেশের উত্তর অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাউল ও জিকির নামক মণ্ডলী প্রভাব বিস্তার করে। এদের ঠিক কোন জাতি বা কোন সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করা যায় না। এরা না ছিল মুসলমান, না ছিল হিন্দু। অবশ্য বাউলরা কতক পরিমাণে মুসলমান ছিল। ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার নামে এদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করে এদের সংখ্যা কমানোর চেষ্টা হয়। রংপুর জেলায় ও উত্তরবঙ্গের কতগুলি স্থানে বাউল জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। ময়মনসিংহের পূর্বদিকে মেঘনা নদীর তীরে জিকির জাতির বাসস্থান। বাউল ও জিকিরদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের গোঁড়ামির কোনটাই ছিল না। এরা সঙ্গীতের মাধ্যমে সাধনা করে এবং উদারমত পোষণ করে। কিছুটা বৈষ্ণব, কিছুটা সূফী মতবাদ এদের অনুপ্রাণিত করে।[২] ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে করম শা নামক একজন ফকির সুসঙ্গ পরগণায় গারো ও হাজংদের সাম্যমূলক পাগলপন্থী বা বাউল ধর্মে দীক্ষিত করেন। পাগলপন্থী ধর্মের মূলনীতি সত্যনিষ্ঠা, সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সহজেই

গারো ও হাজংদের আকৃষ্ট করে, আর জমিদারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের অনুপ্রাণিত করে। তাদের মধ্যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। কিন্তু ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বাংলাদেশে রামমোহনের সমসাময়িক ছিলেন মরমী কবি লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০ খ্রী)। এই বৎসরের (১৩৭৯ বাংলা সন) ১ কার্ত্তিক লালন শাহর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী পূর্ণ হল। কিন্তু এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে কোন প্রবন্ধ বা আলোচনা সভা চোখে পড়েনি। অথবা রামমোহন প্রসঙ্গে তাঁর সম্পর্কে কোন আলোচনাও কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। তাঁর বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের কুষ্ঠিয়ার ছেউরিয়া গ্রামে। এই সর্বত্যাগী বাউল কবি লালন ফকির নামেই খ্যাত ছিলেন। তিনি সারা জীবন ধরে অজস্র সঙ্গীতের মাধ্যমে নিজের ধর্ম ও দর্শনকে রূপ দিয়েছেন। লালনের পরে তাঁর শিষ্য দুদ্দু শাহ লালন-দর্শন প্রচার ও ব্যাখ্যা করেন। গ্রাম বাংলায় বিভিন্ন বাউল সাধক ও মরমী কবি রচিত অসংখ্য গান ছড়িয়ে আছে। এই সব গান নিয়ে আলোচনা করলে বাউল ধর্ম ও দর্শনের প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। আর উদার মানবতাবাদী ভাবধারা বিকাশে লালন শাহের ও রামমোহনের ভূমিকার এক তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। আর তার ফলেই কলকাতা শহরের বুদ্ধিজীবীদের ও গ্রামের উপেক্ষিত জনসাধারণের চিন্তাধারার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা দেখতে পাই, পশ্চিমী হাওয়ার সংস্পর্শে না আসতে পারলেও গ্রামের সাধক ও মরমী কবিদের প্রভাবে এই উপেক্ষিত জনসাধারণের মনোজগৎ কলকাতার শিক্ষিতদের তুলনায় কম সমৃদ্ধ ছিল না। গ্রামবাংলায় লোক সংস্কৃতির এই ধারাটির প্রভাবের কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন: "এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্ব্বরতা। বাঙলা দেশের

গ্রামের গভীর চিত্তে সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেচে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেচে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।”[৪] দুর্ভাগ্যবশতঃ রামমোহনের ভূমিকা আলোচনায় লোকসংস্কৃতির প্রবাহটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

রামমোহনের সমসাময়িক যে সব সংস্কারক অন্যত্র ছিলেন তাঁদের কথা মনে রাখলে সর্বভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিকায় রামমোহনের ভূমিকা আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামমোহনের সমসাময়িক দেধরাজ (জন্ম ১৭৭১ খ্রী) ও পলটু সাহব (১৭৫৭-১৮২৫ খ্রী) এর কথা বলা চলে। দেধরাজ নারনৌল জেলার ধারস্থ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই কর্ম্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে তাঁকে আগ্রা যেতে হয়। সেখানে তিনি এক দেওয়ানের বাড়িতে কাজে ঢোকেন এবং হিন্দু-মুসলমান সাধকদের সংস্পর্শে আসেন। এইভাবে তিনি ধর্মজীবন লাভ করেন এবং ৩৩ বৎসর বয়সে “স্বাধীন ও উদারমত প্রচার করতে আরম্ভ করেন”। তিনি জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা করেন এবং নিজে বৈশ্য সম্প্রদায়ের কন্যাকে বিবাহ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আগ্রা থেকে দেশে ফিরে এসে তিনি পৌত্তলিকতার এবং জাতিভেদ ও পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। তাঁর শাস্ত্র বিরুদ্ধ মতের জন্য নারনৌলের শাসক ঝাঝরের নবাব নজারত আলি তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। বন্দী অবস্থায় বহুদিন তাঁকে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। ঝাঝরের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য তিনি জেল থেকে মুক্ত হতে পারেন। তারপর তিনি খেতরী জেলার ছুরীনা গ্রামে তাঁর মত প্রচার করতে থাকেন। সেখানেই ৮১ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপরে তাঁর শিষ্যরা এই ধর্মমত প্রচার করেন। ঝাঝর, নারনৌল ও গুরগাঁওতে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব ছিল।

গুরগাঁও জেলার ভীরানীতে তাঁদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই মতের সাধকেরা একেশ্বরবাদের সমর্থক। তাঁরা মনে করেন, সাধনায় স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার আছে। এই সম্প্রদায়ের মহিলারা পর্দা মানেন না। উপাসনা সঙ্গীত মেয়েরাই করে থাকেন। তাঁরা হিন্দু-মুসলমান উভয় সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁরা রামায়ণ, মহাভারত থেকে নীতি উপদেশ নিলেও এইসব শাস্ত্রকে অভ্রান্ত মনে করেন না। আর চলতি ভাষাতেই তাঁদের বাণী প্রচার করা হয়। ভাবতে দুঃখ হয় যে, দেধরাজের মত একজন বলিষ্ঠ মানুষ আমাদের প্রায় অজ্ঞাতই রয়ে গেছেন।[৫]

এই যুগের আর একজন সাধক হলেন পলটু সাহব। কবীরের ভাবের সঙ্গে তাঁর ভাবের গভীর মিল থাকায় তাঁকে দ্বিতীয় কবীর বলা হয়। পলটু সাহব ফৈজাবাদ অহিরৌলার অধিবাসী গোবিন্দর শিষ্য ছিলেন। পলটু সাহব ফৈজাবাদ জেলার নগপুর-জলালপুর গ্রামে এক বানিয়া বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৃহে থেকেই তাঁর মত প্রচার করেন। কিন্তু গ্রামের লোকেরা নানাভাবে তাঁকে গঞ্জনা দেয়। খুবই সুন্দর ভাষায় তিনি একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যে মত প্রচার করেন তা তাঁর ভাষাতেই উল্লেখ করছি : "নীচ জাতিকে নষ্ট করিল উচ্চ জাতিরা, এবং নিজেরাও নষ্ট হইল। যে সত্যকে দেখিয়াছে তার আর দেশ বিদেশ নাই। প্রত্যক্ষ সত্য বড় সত্য নহে, অন্তরে দেখা সত্যই বড়। সাধকের সংযম ও বীর্য্য চাই। ভগবান্ কোন সম্প্রদায়-বিশেষের সম্পত্তি নহেন। জাতি-পংক্তির ক্ষুদ্র পরিচয় ছাড়। নম্রতায় দোষ নাই। মধুর হও, সেবাব্রত হও। সহজ সত্যকে সহজ না হইলে পাওয়া যায় না। সত্য আছে অন্তরে—বাহিরে খোঁজা বৃথা। যে মানবের মধ্যে দেবতাকে না দেখিল সে মন্দির হইতে দেবতাকে নির্ব্বাসন দিল।" পলটু সাহবর মতাবলম্বীর সংখ্যা প্রচুর ছিল। "ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই সম্প্রদায়ের সাধক" ছিলেন।[৬] এই ধরনের অনেক সাধক ভারতবর্ষে ছিলেন। অনেকদিন আগে অপরিসীম

পরিশ্রম করে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ভারতের মধ্যযুগের উদার মানবতাবাদী সাধনার ধারা পুনরুদ্ধার করেন। বিভিন্ন সাধকদের মতবাদ ও কার্যাবলী আলোচনা করে তিনি মন্তব্য করেন : "রামমোহন রায়ের অল্প পূর্ব্বে বর্ত্তমান কালের শিক্ষা না পাইয়াও ইঁহারা অভ্রান্ত শাস্ত্র, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা না মানিয়া সকল ধর্ম্মের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়া এক অপ্রতিম ঈশ্বরের উপাসনা ঘোষণা করিয়াছেন।"[৭] ক্ষিতিমোহন সেনের আশা ছিল উৎসাহী গবেষকেরা যদি এই ধারাটিকে পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন তাহলে আরও অনেক হিন্দু-মুসলিম সাধকের পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি নিজে প্রায় দুইশতজন সাধকের পরিচয় সংগ্রহ করেছেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, এখনই উদ্যোগী না হলে এইসব সাধকের কথা অবলুপ্তির গহ্বরে চলে যাবে। তিনি বলেন : "ক্ষেত্র বিরাট্ ; কিন্তু কাজ করিবার লোক কৈ ? এইসব দিকে কয়জন লোকের অনুরাগ আছে ?" ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অধর মুখার্জি লেক্‌চর' দেবার সময় তিনি এইসব মন্তব্য করেন। তারপরে অনেক বছর কেটে গেছে।[৮] কিন্তু ক্ষিতিমোহন প্রদর্শিত পথে গবেষকেরা আর অগ্রসর হননি। এমনকি যে ধারাটি তিনি পুনরুদ্ধার করেছিলেন তার প্রতিও এক অবজ্ঞার ভাব বর্তমানে কোন কোন লেখকের রচনায় পাওয়া যায়। কারণ তাঁদের ধারণা মধ্যযুগের সব কিছুই তমিস্রায় আচ্ছন্ন ছিল এবং ইংরেজ শাসনে ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে মধ্যযুগের তমিস্রা কেটে যায়, এক আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। তাঁরা মধ্যযুগের সাধনার ধারাটিকে কোন গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত নন। শুধু তাই নয়, মধ্যযুগে ভাবজগতের এই আলোড়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক জীবনেও যে কিছু কিছু নতুন উপকরণ, যা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত, প্রকাশিত হতে থাকে, তাও তাঁরা আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেন না। ফলে আমাদের জীবনধারার নিজস্ব প্রবাহটি আমরা উপলব্ধি করতে পারি না।

ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে রামমোহনের মনোভাব নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা হয়ঃ রামমোহন ভারতে ব্রিটিশ শাসন সমর্থন করেন। ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণতার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি ভারতে ব্রিটিশ কলোনাইজেশন সমর্থন করেন। এমন কি ব্রিটিশ নীলকরদেরও তিনি প্রশংসা করেন। কারণ তাঁর মতে নীলকরেরা দেশের উপকার সাধন করছে। তাছাড়া তিনি ভারতীয়দের সভ্য করার বিষয়ে ইংরেজের ভূমিকার প্রশংসা করেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন জমিদারী প্রথার সমর্থক। মোটকথা, দেশাত্মবোধের বাস্তব প্রকাশ রামমোহনের মধ্যে পাওয়া যায় না।[২] যেসব উক্তি এখানে উল্লেখ করা হল তার যথাযথ বিশ্লেষণের প্রয়োজনে সমগ্র রামমোহনকে সামনে রাখা দরকার এবং যুগের সীমার কথাও মনে রাখা উচিত। প্রধানতঃ রামমোহনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা নিয়েই এখানে আলোচনা করেছি। একখানি পুস্তিকায় রামমোহন ভারতবর্ষের সীমানা ও ইতিহাস সম্পর্কে নিজের মতামত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। এখানে তিনি প্রাচীনকাল থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর শাসনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। তিনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার বিবরণ দিয়ে ভারতবর্ষের ঐক্যবদ্ধ রূপ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ধর্ম ও সংস্কৃতি ভিত্তি করে চিরকালই ভারত-বর্ষের এক অখণ্ড ভাবমূর্তি ছিল। তিনি একথাও বলেন, ইউরোপের সংস্পর্শে এসে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের স্থাবরতা হ্রাস পাবে এবং এখানে একটি গতিশীল শক্তির সৃষ্টি হবে। তাই তিনি এই দেশের মঙ্গলের জন্যই ইংরেজ প্রভুত্ব কামনা করেন। সর্ব বিষয়ে উন্নতি সাধন করায় তিনি ইউরোপের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি একথাও মনে করেন যে, রাজতন্ত্রে মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন হয় না। তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক শাসন

ব্যবস্থার প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন। তাঁর মতে, কর্নওয়ালিশের আমলেই ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় হয় এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শাসনতন্ত্রের প্রতিটি বিভাগে, বিশেষ করে ভূমি রাজস্ব ও বিচার বিভাগে, পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে রামমোহন মন্তব্য করেন : "These changes approximating to the institutions existing in England, are calculated to operate beneficially, if regularly reduced to practices." কি কারণে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল? এই প্রশ্ন নিয়েও রামমোহন আলোচনা করেন। তাঁর মতে, দেশীয় শাসকেরা পরস্পর কলহে লিপ্ত থাকায় ও কাপুরুষ হওয়ায় এবং প্রাচ্যের অজ্ঞানতা, এই সব কারণেই এই বিপর্যয় হয়। আধুনিক যুদ্ধ পদ্ধতি এবং নৌবহর ও সামরিক শক্তির সাহায্যেই ইংরেজরা সাফল্য অর্জন করে।[১০]

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে ও রামমোহনের অন্যান্য রচনাবলী থেকে আমরা জানতে পারি, রামমোহন ব্রিটিশ শাসনকে মধ্যযুগের শাসনব্যবস্থা থেকে উন্নততর মনে করেন এবং তাঁর ধারণা হয় যে, ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন জীবন গঠনে সহায়ক হবে। ইংলণ্ডের মতই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলিত হলে সাধারণ মানুষের উপর নিপীড়ন অনেকটা কমে যাবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তির স্বাধীকারবোধের এমন বিকাশ ঘটাবে যার ফলে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যও ছিল তাই। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টারী শাসনে ওখানকার অধিবাসীরা যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সে সব অধিকার ভারতীয়দেরও প্রাপ্য। এই ছিল রামমোহনের ধারণা। এই কারণেই রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য এতটা উদ্যোগী হন। তাঁর ধারণা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকলে গণতান্ত্রিক প্রশাসন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। প্রজাবর্গের অভাব-অভিযোগ প্রকাশের ব্যবস্থা না থাকলে বিপ্লব ঘটতে পারে। কিন্তু স্বাধীন

মুদ্রাযন্ত্র তা নিবারণ করতে পারবে। তাতে ইংরেজ শাসনও শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হবে।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রামমোহন বিশ্ববিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল, ইংরেজ জাতি কেবলমাত্র নিজেই civil and political liberty ভোগ করে না, অন্যজাতিকেও সে সুযোগ-সুবিধা দেয়। প্রশ্ন হল ঃ কতকাল ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন করবে? এই বিষয়ে রামমোহনের ধারণা কি? যিনি বিদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎসাহ প্রদর্শন করেন, আর দাসপ্রথার অবসানে উল্লসিত হন, তাঁর পক্ষে চিরকাল ব্রিটিশ শাসন মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই রামমোহন আশা পোষন করেন যে, ভারতবর্ষ ইউরোপের বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার সাহচর্য পেলে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা লাভ করলে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জানাবে। রামমোহন মনে করেন যে, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর এই দেশে ব্রিটিশ শাসন থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র ভারতবাসীর চিন্তায় আমূল পরিবর্তন আনলে আর বিদেশী শাসনের প্রয়োজন হবে না।[১১] একই উদ্দেশ্য নিয়ে রামমোহন ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের বসবাস করার নীতি সমর্থন করেন। এই বিষয়ে তাঁর সমগ্র রচনাটি (On Settlement in India by Europeans) পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই তিনি এর সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, গণতান্ত্রিক আদর্শে আলোকপ্রাপ্ত এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও কৃষিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি বসবাস সুরু করেন তাহলে সবদিক থেকেই ভারতবর্ষের পক্ষে তা মঙ্গলজনক হবে। তাঁর মতামত নিঃসন্দেহে বিতর্কমূলক।[১২] কিন্তু এই প্রশ্ন আলোচনায় আমরা যদি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ডে কলোনাইজেশন নিয়ে যে বিতর্ক হয় তা লক্ষ্য করি তাহলে আরও ফলপ্রসূ আলোচনা করা সম্ভব হয়। নেপোলীয় যুদ্ধের পরেই

ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। বেকার সমস্যা, অল্প মজুরী ও পুওর রিলিফের জন্য যে অর্থনৈতিক বোঝা ইংলণ্ডের কাঁধে চাপে তার ফলেই ইমিগ্রেশন থিওরি নিয়ে আলোচনা সুরু হয়। কলোনাইজেশন মারফত উদ্বৃত্ত শ্রমের (surplus labour) ও উদ্বৃত্ত পুঁজির (surplus capital) সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করা হয়। ১৮২৬-১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে 'ইমিগ্রেশন কমিটি' নিয়োগ করে তার রিপোর্ট সমূহ পাঠ করলেই তৎকালীন অর্থনৈতিক সমস্যার ও ইমিগ্রেশন থিওরির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। তাই এই রিপোর্ট সমূহ সামনে রেখে যদি আমরা রামমোহন কর্তৃক প্রচারিত ইউরোপীয়ান সেটলমেণ্টের সমস্যাটি আলোচনা করি তাহলে তাঁর মতামত আমাদের কাছে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।[১৩]

তখন অবাধ বাণিজ্য নীতির সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্য নীতির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। রামমোহন কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের বিরোধিতা করেন। মনে রাখা দরকার, ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪ খ্রী) ও রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩ খ্রী) রামমোহনের সমসাময়িক ছিলেন। অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০ খ্রী) তাঁদের সকলের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। অ্যাডাম স্মিথের Wealth of Nations প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। ম্যালথাসের Essay on Population প্রকাশিত হয় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। রিকার্ডোর Principles of Political Economy and Taxation প্রকাশিত হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। মজুরী, খাজনা, অবাধ বাণিজ্য নীতি, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহন যে সব মতামত ব্যক্ত করেন তাতে এই তিনজনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য মণ্টেস্কু, ব্লাকস্টোন ও বেন্থামের প্রভাবও তাঁর উপর ছিল।[১৪] অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ফলে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে, কৃষি মজুর ভালো মজুরী পাবে ও গরীব কৃষকদের উপর অত্যাচার কম হবে—এই সব চিন্তা রামমোহন করেন। অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে মূলধনের মালিক এমন ইউরোপীয়েরা এদেশে

এলে ও পুঁজি লগ্নী করলে দেশের কল্যাণ হবে। কৃষি পণ্যের উন্নতি হবে। জমি-জমার মূল্য বৃদ্ধি পাবে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই কৃষিপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। রামমোহন লক্ষ্য করেন ইউরোপীয়ান নীলকর কর্তৃক নীলচাষ প্রবর্তনে কৃষি ব্যাপারে জেলাগুলিতে উন্নতি সাধিত হয়েছে। অনেকে নীলের কারখানায় কাজ পেয়েছে। নীলকুঠি সংলগ্ন অঞ্চলে রাস্তাঘাটের উন্নতি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। নীলকরেরা আশেপাশের লোকদের উন্নতি সাধন করেছে এবং জাতীয় ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে। রামমোহন নীলকরদের দুর্ব্যবহার সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল ছিলেন। তবে বেন্টিক ও দ্বারকানাথের মত তাঁরও মনে হয়েছে নীলকরেরা যে উপকার করছে তার তুলনায় "তাদের কদাচিৎ দুর্ব্যবহার ধর্তব্যের মধ্যেই নয়"। তাঁরা মনে করেন, যেখানে যেখানে নীলের কারখানা বসেছে সেখানকার চাষীরা যেখানে নীলের চাষ নেই সেই সব এলাকার চাষীদের চেয়ে অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নত। নীল চাষের ফলে অনেক অনাবাদী জমিতে চাষ হয়েছে। নীলের চাষ ও ব্যবসায়ের ফলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়েই লাভবান হচ্ছে। কিন্তু নীলচাষ যে প্রথম থেকেই নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে তা রামমোহন বুঝতে পারেননি।[১৫]

লবণের ব্যবসা নিয়েও রামমোহন যে মতামত ব্যক্ত করেন তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তখন ভারতবর্ষের তুলনায় ইংলণ্ডে লবণের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম ছিল। রামমোহন বলেন যে, ভারতবর্ষে ইংলণ্ড থেকে লবণ আমদানীর ব্যবস্থা করলে ভারতীয়রা খুশীই হবে। কারণ তারা অল্প মূল্যে লবণ কিনতে পারবে। অবশ্য রাম-মোহন উপলব্ধি করেন, এর ফলে মলাঙ্গীরা বেকার হবে। তাই তিনি তাদের জন্য কর্মসংস্থানের পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, যদি লবণের ব্যবসায় সরকারের একচেটিয়া অধিকার থাকে তাহলে খালারিতে তাদের কিছু কর্মসংস্থান হতে পারে। তাছাড়া কৃষিতে এবং অন্যান্য কাজে তাদের নিয়োগ করা যেতে পারে, যথা—বাগানের

মালী, বাড়ির চাকর ও দিনমজুর হিসেবে। রামমোহন মলাঙ্গীদের দুরবস্থার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আইন পাশ হলেও তাদের দুর্দশার কোন লাঘব হয়নি।[১৬]

ইংরেজ শাসন সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয়দের মনোভাব কি এই বিষয়ে রামমোহনের অভিমত হল এই : (ক) কৃষক ও গ্রামের লোকেরা পূর্বের ও বর্তমান সরকার সম্পর্কে অজ্ঞ এবং উদাসীন। তাদের ধারণা, তারা যে বিপদ হতে রক্ষা পাচ্ছে অথবা অত্যাচারিত হচ্ছে তা তাদের অঞ্চলের সরকারী কর্মচারীদের আচরণের ফলেই হচ্ছে। (খ) কিন্তু যাদের উচ্চাশা আছে এবং যে সমস্ত প্রাচীন পরিবারের লোকেরা বর্তমান শাসনব্যবস্থার ফলে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, তারা ইংরেজ সরকারের অধীনে সামান্য চাকুরী গ্রহণ করা অপমানজনক মনে করে এবং তারা এই শাসনব্যবস্থার প্রতি সুনিশ্চিতভাবে অসন্তুষ্ট। (গ) আর যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে সম্পদশালী হয়েছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী অর্জন করেছে এবং যারা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভবিষ্যত উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে, তারা শুধু এই ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়নি, তারা ব্রিটিশ শাসনকে দেশের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ মনে করে। ভারতীয়দের এই তিনটি অংশে ভাগ করে রামমোহন মন্তব্য করেন যে, ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা মনে করেন যে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরির ব্যবস্থা থাকার উপরেই সরকারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক নির্ভর করে। রামমোহন লেখেন : "But I have no hesitation in stating, with reference to the general feeling of the more intelligent part of the native community, that the only course of policy which can ensure their attachment to any form of government would be, that of making them eligible to gradual promotion, according to their respective abilities and merits, to situations of trust

and respectability in the state".[১৭] উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষ থেকে রামমোহন যে মনোভাব ব্যক্ত করেন তা কি নিছক ইংরেজ তোষণের পর্যায়ে পড়ে ?

কোম্পানীর শাসনের চেয়ে পার্লামেণ্টারী শাসনপদ্ধতিই রামমোহনের নিকট ভাল মনে হয়েছে। তাঁর কাছে ব্রিটিশ গণতন্ত্রই ছিল সবচেয়ে উন্নত। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্ক তখনই স্থায়ী হতে পারে যদি ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী শাসন করা হয়। রিফর্ম বিলের সময় ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে নবপর্যায়ের সূচনা দেখে তিনি উল্লসিত হন। তাঁর নিকট এই বিলের পক্ষ ও প্রতি-পক্ষের লড়াই প্রকৃতপক্ষে ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের লড়াই ছিল। তখন যারা ইংলণ্ডে কায়েমী স্বার্থের সমর্থক ছিল তাদের সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। এই অংশই রিফর্ম বিলের বিরোধিতা করে। রামমোহন লেখেন যে, যারা জনসাধারণকে নিঃশেষ করে দিয়ে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করছে সমগ্র জাতি তাদের শিকারে পরিণত হতে পারে না। তাদের দেখে রামমোহনের আশঙ্কা হয়েছিল হয়তো রিফর্ম বিল গৃহীত নাও হতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে তিনি ইংলণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবেন এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। এই মনোভাব থেকেই বোঝা যায় এই রিফর্ম বিল সম্পর্কে রামমোহনের কত গভীর প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু তাঁর আশাভঙ্গ হতেও দেরী হয়নি। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি লেখেন যে, পার্লামেণ্ট ইংলণ্ডের জনসাধারণকে হতাশ করেছে। এই সময়ে রামমোহন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। ১৮৩২ অথবা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা রবার্ট আওয়েনের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি রামমোহনকে সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করেন। আওয়েনের সমাজতান্ত্রিক প্রোগ্রামের প্রতি রামমোহন আকৃষ্ট হলেও আওয়েনের মত তিনি ধর্মকে সম্পূর্ণ-

ভাবে বর্জন করতে সম্মত হননি। তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্যের প্রধান বিষয় ছিল ধর্ম। রামমোহন মনে করতেন মানবজাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক উন্নতির ক্ষেত্রে ধর্মের এক সাহায্যকারী ভূমিকা আছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আওয়েনের পুত্রকে লেখা রামমোহনের চিঠিতে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেসব সামান্য তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজ-তন্ত্রকে গ্রহণ করা রামমোহনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ধর্মনির্ভর যুক্তিবাদই ছিল রাম-মোহন চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আধ্যাত্মিকতা ও যুক্তিবাদের অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ তাঁর মধ্যে ঘটে।[১৮]

কোন কোন লেখক 'জমিদার রামমোহনকে' ইংরেজ স্বষ্ট মূল কৃষি কাঠামো টিকিয়ে রাখার জন্য সমালোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ একথাও বলেন, "তথাকথিত স্বাধীনতার পূজারী রামমোহন" গ্রামাঞ্চলে প্রচণ্ড কৃষক বিদ্রোহ চলাকালীন ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় করতেই ব্যস্ত ছিলেন। রামমোহন জমিদারী প্রথাকেই আদর্শ ভূমি ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেন। এই সব উক্তি গভীর তাৎপর্য বহন করে। তাই কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে রামমোহনের প্রকৃত মনোভাব কি ছিল তা ভালোভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী এইসব উক্তি বিশ্লেষণে মোটেই সহায়ক হবে না। একথা ঠিক রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান দাবী করেন নি। তবে তিনি সুস্পষ্টভাবে কৃষকদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে তার প্রতিকার দাবি করেন। চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারী উভয় ব্যবস্থায় কৃষকদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পায় সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে জমির মূল্য দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কুড়ি গুণও বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বত্র পতিত জমিতে চাষ সুরু হওয়ায় এবং কৃষকদের দেয় খাজনার পরিমাণ

বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। রামমোহন এই দুটো কারণই গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে জমিজমার মূল্যবৃদ্ধির কোন সম্পর্ক আছে কিনা এই প্রশ্ন সহজেই মনে আসবে। রামমোহন unearned increment of land value সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, যে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে কতিপয় সুবিধাভোগী ব্যক্তিরাই লাভবান হয়েছে, দেশের সাধারণ মানুষ নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পতিত জমিতে চাষ বৃদ্ধি ও ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যের দুয়ার উন্মুক্ত হওয়ার ফলে কৃষিপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তাতে জমিদার, পণ্য কারবারী ও সরকারই লাভবান হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষ ও কৃষকের কোনই লাভ হয়নি। তাই রামমোহন বলেন যে, শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকা বাদে দেশের সর্বত্র যে ব্যাপক দারিদ্র্য বিদ্যমান তা থেকে বলা চলে, সাধারণত সম্পদ বৃদ্ধির ফলেই জমিজমার মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। যাদের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে তারা জানে যে, দেশের কোন একটি স্থানের চারিদিকে একশত মাইলের বৃত্তের মধ্যে জমিজমার মালিকেরা ছাড়া খুব অল্প সংখ্যক লোকেরই সম্পদ আছে অথবা তারা জীবনের সাধারণ সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারে। রামমোহন একথাও বলেন যে, খুদ-কস্ত রায়তদের বঞ্চিত করে জমিদারেরা খাজনা বৃদ্ধি করে। তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বলেন, জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদারেরাই লাভবান হয়েছে, রায়তেরা নয়। তিনি অনুভব করেন, রায়তদের সঙ্গেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত। তাদের দুরবস্থা লাঘবে তিনি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করেন: রায়তের খাজনা কমাতে হবে। এই সঙ্গে জমিদারদেরও ভূমি রাজস্ব কমাতে হবে। সূর্যাস্ত আইনের ফলে জমিদারদের যে অসুবিধা হয়েছে সেকথাও তিনি বলেন। জমিদারেরা যাতে রায়তদের অত্যাচার না করতে পারে সেজন্য আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে

হবে। ভারতের কৃষকদের অবস্থা পর্যালোচনা করে রামমোহন বলেন যে, তারা হল "agricultural labourer", ঠিক "peasant-proprietor" নয়।[১৯]

রামমোহন মনে করেন, সততা ও দক্ষতার ফলে ও চাষের জমির প্রসারতায় যদি জমির মালিকের আয় বৃদ্ধি পায় তাহলে কারও কিছু বলার নেই। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, এমন এক নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে যার ফলে জমির মালিকেরা বাড়তি কর থেকে নিজেরা রেহাই পেলেও তারা অনায়াসে খুদ-কস্ত রায়তদের খাজনা বৃদ্ধি করতে পারছে, তাহলে এই ব্যবস্থার যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। তিনি একথাও বলেন যে, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ও তার পরবর্তীকালের রেগুলেশন অনুযায়ী কতিপয় জমির মালিকেরাই লাভবান হয়েছে, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ কৃষকের দুরবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে অথবা তাদের সর্বনাশ হয়েছে। এই সব আইনে তো সরকারের কোন সুবিধা হয় নি। রামমোহনের কথাই উদ্ধৃত করছি : "The power of imposing new leases and rents, given to the proprietors by Reg. I and VIII of 1793, and subsequent Regulations, has considerably enriched, comparatively, a few individuals, the proprietors of land, to the extreme disadvantage or rather ruin of millions of their tenants ; and it is productive of noadvantage to government".[২০]

রামমোহন বলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকার ও জমিদারদেরই সুবিধা হয়েছে। যারা বলে যে, সরকারের কোন লাভ হয়নি, তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, চল্লিশ বৎসরের ফলাফল থেকেই প্রমাণ করা যায় এই মন্তব্য সঠিক নয়। রামমোহন বলেন : "In my paper on the Revenue System I expressed an opinion that the permanent settlement has been

beneficial to both the contracting parties i.e. the government and the landholders. This position, which, as regards the former, was long much controverted, does not now rest upon theory; but can be proved by the results of about forty years' practice."[২১] রামমোহন বলেন যে, জমিদারী ব্যবস্থায় বাংলাদেশের রাজস্ব মাদ্রাজের রায়তওয়ারী ব্যবস্থা থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। জমিদারী ব্যবস্থায় যে সমৃদ্ধি হয়েছে তা রাজস্বের অন্যান্য শাখাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু রায়তওয়ারী ব্যবস্থা রাজস্বের অন্যান্য উৎসগুলিকে চাঙ্গা করে তুলতে পারেনি। যে সব তথ্য রামমোহন সংগ্রহ করেছিলেন তা থেকেই তিনি বলেন: "By a comparative view of the Revenues of Bengal, Behar and Orissa, from the period of the Perpetual Settlement, it appears that, in the thirty five years, from 1792-3 to 1827-28, there was a total increase on the whole amount of the Revenue of above 100 per cent. (101.71), and that this increase has been steady and progressive upto the present time... By a comparative view of the revenue of the old British territory in Madras, it appears that during the same period of thirtyfive years (i.e., from 1793 to 1828), there was an increase of only about 40 per cent, (40.15) on the total amount of the whole revenue."[২২]

এইসব তথ্য থেকে বলা চলে 'জমিদার রামমোহন' গভীর দরদ দিয়েই কৃষকদের দুরবস্থার কথা ভেবেছেন, আর নিজে জমিদার হয়েও জমিদারী ব্যবস্থার ত্রুটি উল্লেখ করতে এতটুকু সঙ্কোচবোধ করেননি। তাছাড়া যদি আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে তাঁর মতামত পরবর্তীকালের রমেশ চন্দ্র দত্তের মতামতের সঙ্গে তুলনা করি

তাহলে দেখতে পাবো উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে রামমোহনের চিন্তাধারা অনেক বেশী স্বচ্ছ ছিল।[২৩] ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনার বিকাশে রমেশদত্তের অর্থনৈতিক চিন্তার অবদান অনস্বীকার্য। তবে জমিদারী প্রথার পক্ষে তাঁর মতামত নিয়ে আরও আলোচনা করার অবকাশ আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রথমে যে মত ব্যক্ত করেন পরে তা পরিবর্তন করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে The Peasantry of Bengal নামক যে গ্রন্থ রমেশ দত্ত লেখেন তাতে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করেন এবং কৃষকের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে Famines in India গ্রন্থে রমেশ দত্ত লেখেন, যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য হয় একটি অনুগত জমিদার শ্রেণী ও একটি সমৃদ্ধশালী কৃষক শ্রেণী সৃষ্টি করা, তাহলে বলতে হয় এই উদ্দেশ্য আশাতীতভাবে সফল হয়েছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে Economic History of India Under Early British Rule গ্রন্থেও রমেশ দত্ত লেখেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই বাংলা দেশে এমন কোন দুর্ভিক্ষ হয় নি যার ফলে অনেক লোক মারা গেছে। তাঁর মতে, এই ব্যবস্থায় সমগ্র কৃষক সমাজ লাভবান হয়েছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রমেশ দত্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাইসরয়কে যে সব চিঠি লেখেন তা নিয়ে সরকারী মহলে দীর্ঘ আলোচনা চলে। অবশেষে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার ভূমি রাজস্ব নীতি নির্ধারণ করে। রামমোহন ও রমেশ চন্দ্র দত্ত উভয়েই অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন। তাই তুলনামূলক আলোচনা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না।[২৪]

রামমোহনের উপদেশ মত যদি জমিদার কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি রাজস্ব কমানো হয় তাহলে সরকারের আয়ের ক্ষতি হবে। এই বিষয়ে রামমোহনের অভিমত ছিল : (ক) বিলাস দ্রব্যের ও অন্যান্য দ্রব্যের উপর কর বসিয়ে আয় বৃদ্ধি করা উচিত ("taxes on luxuries

and such articles of use and consumption as are not necessaries)." (খ) সরকারের ব্যয় কমানোর জন্য শাসনতান্ত্রিক ও বিচারবিভাগীয় পদে ইউরোপীয়দের পরিবর্তে ভারতীয়দের নিয়োগ করা উচিত।[২৫]

ভারতবর্ষ কেন দরিদ্রতম দেশে পরিণত হল, এই নিয়ে দাদাভাই নাওরোজী, রমেশ দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত ভারতীয় চিন্তাবিদেরা অনেক আলোচনা করেছেন। এই দেশ থেকে প্রভূত পরিমাণে অর্থ ও সম্পদ বাইরে চলে যাওয়ার ফলে ভারতবর্ষ ক্রমান্বয়ে দরিদ্র দেশে পরিণত হয়। এই তত্ত্বকে 'ড্রেন থিওরি' (Drain Theory) বলে। পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবের পরাজয়ের পর থেকেই তার সূত্রপাত হয়। এই বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ও বাগ্মী বার্ক Ninth Report (১৭৮৩ খ্রী) নামক গ্রন্থে। পরে ব্রুকস অ্যাডামস এই মত প্রচার করেন। ভারতীয়দের মধ্যে রামমোহন সর্বপ্রথম এই বিষয়ে সচেতন হন। সমসাময়িক ইংরেজ লেখকদের রচনার মাধ্যমে রামমোহন 'ড্রেন তত্ত্ব' সম্পর্কে যে সচেতন ছিলেন তা তাঁর রচনা থেকে জানা যায়। তাঁর মতে, প্রতি বৎসর দুই মিলিয়ন পাউণ্ড (£ 2 million) দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাঁর মনে হয় যে, যদি ইউরোপীয়রা তাদের পুঁজি ও পরিবারবর্গ সহ এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে তাহলে ভারতবর্ষের সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন ঃ "As a sum of money is now annually drawn from India by Europeans retiring from it with the fortunes realised there, a system which would encourage Europeans of capital to become permanent settlers with their families, would necessarily greatly improve the resources of the country." এই বিষয়ে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত রামমোহনের পুস্তিকায় অনেক তথ্য পাওয়া যায়।[২৬] তাছাড়া রামমোহন 'আইরিশ ইকনমিক ড্রেন' (Irish Economic Drain)

সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। Mirat-ul-Akhbar নামক ফারসী সাপ্তাহিক কাগজে রামমোহন "Ireland, the Causes of its Distress and Discontent" প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, absentee landlordism-এর ফলে আইরিশ ইকনমিক ড্রেন হয়। আইরিশ ইকনমিক ড্রেন ও ইণ্ডিয়ান ড্রেন নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই ফুরিয়ে যায় নি। ভাবতে অবাক লাগে, পরবর্তীকালে দাদাভাই নাওরোজীর মত ব্যক্তিও আইরিশ ড্রেন সম্পর্কে রামমোহনের মত সচেতন ছিলেন না।[২৭]

রামমোহন কারিগর ও শ্রমিকদের এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কেও আলোচনা করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রচনা থেকে জানা যায়, কলকাতাতে একজন কুশলী কারিগর প্রতিমাসে ১০ থেকে ১২ টাকা রোজগার করত, অকুশলী শ্রমিক ৫ থেকে ৬ টাকা, রাজমিস্ত্রী ৫ থেকে ৭ টাকা, সাধারণ শ্রমিক ৩॥ থেকে ৪ টাকা। ছোট শহরে তাদের আয় আরও কম ছিল। গ্রামাঞ্চলে আরও কম ছিল। বাংলা দেশে এই শ্রেণীর লোকের আহার্য ছিল : ভাত, কিছু শব্জী, লবণ ও মাছ। আর দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা লবণ-ভাত খেত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই রামমোহন এই সব কথা লেখেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের শারীরিক গড়ন সম্পর্কেও রামমোহন বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি লেখেন যে, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের লোকেদের দৈহিক বল উত্তর ও পশ্চিম ভারতের লোকেদের চেয়ে কম ছিল। তিনি বলেন, আমাদের দেশে জমি উর্বর, তাই অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রম করতে হয়। আর গরম আবহাওয়া ও ধর্মীয় কুসংস্কার থাকাতে সাধারণ খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করায় ভারতবর্ষের কৃষকেরা সুগঠিত দেহের অধিকারী নয়। তাই রামমোহন তাদের দৈহিক বল বৃদ্ধির ও দৈহিক গড়নের উন্নতির জন্য তাদের আহার্য তালিকায় কিয়ৎ পরিমাণে মাংস অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন যে, আফ্রিকার অধিবাসীরা ও আরব
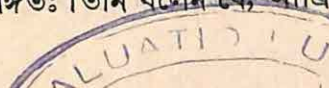
দেশের কোন কোন অংশের অধিবাসীরা প্রচণ্ড উষ্ণ আবহাওয়াতে বসবাস করলেও জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এবং মাংস খেতে হয়। তাই তারা উত্তর অঞ্চলের জাতির মতই দৈহিক শক্তির অধিকারী। সুতরাং রামমোহন ভারতীয়দের ধর্মীয় কুসংস্কার পরিহার করে মাংস খেতে বলেন। অর্থাৎ তিনি যে ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করেন সেখানে শুধু উন্নত মনের অধিকারী হলেই চলবে না উন্নত দেহেরও অধিকারী হতে হবে।[২৮] অনেক দিন পরে বিবেকানন্দের কণ্ঠে যেন এই সব কথাই অনেক বলিষ্ঠতার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

তাছাড়া গ্রামের সাধারণ মানুষের ও শহরের শিক্ষিত বাবুদের নৈতিক মান নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন রামমোহন। (ক) তিনি বলেন যে, কৃষক ও গ্রামের লোকেরা, যারা কোর্ট-কাছারি ও বড় শহর থেকে দূরে বাস করে, তারা সরল স্বভাবের ও নীতিবোধ পরায়ণ। আরও উত্তরে ও পশ্চিমে গেলে তাদের আরও সৎ, সরল ও স্বাধীন চরিত্রের অধিকারী মনে হবে। রামমোহনের কথাই এখানে উদ্ধৃত করছি: "The peasants or villagers, who reside at a distance from large towns and head stations and courts of law are as innocent, temperate and moral in their conduct as the people of any country whatsoever ; and the farther I proceed toward the North and West, the greater the honesty, simplicity and independence of character I met with." রামমোহন মনে করেন, এই সব গুণ হল 'আদিম সরলতার' (primitive simplicity) বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। তাদের ধারণা ইহলোকে ও পরলোকে ভালো মন্দ কর্ম অনুযায়ীই তারা পুরস্কৃত হবে অথবা শাস্তি পাবে। (খ) অন্যদিকে নতুন শহুরে শ্রেণীর (new urban class) আচরণ সম্পর্কে রামমোহন বলেন যে, এরা

কোর্ট-কাছারি, জমিদারী অফিস ও ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে বিদেশীদের আচরণ অনুকরণ করছে। রামমোহনের মতে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই চারিত্রিক দিক থেকে কৃষকদের থেকে হীনতর। যদি ব্যবসায় ও সরকারী চাকুরিতে এই নতুন শহুরে শ্রেণীর জন্য সুযোগ-সুবিধা খুলে দেওয়া যায় তাহলে তাদের চরিত্রের উন্নতি হতে পারে। রামমোহনের ভাষায় : "...The inhabitants of the cities, towns or stations, who have much intercourse with persons employed about the courts of law, by zemindars, &c., and with foreigners and others in a different state of civilization, generally imbibe their habits and opinions; hence their religious opinions are shaken without any other principles being implanted to supply their place; consequently a great proportion of these are far inferior in point of character to the former class, and are very often even made tools of in the nefarious work of perjury and forgery." (গ) যারা জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করত, অথবা যারা তাদের জীবিকার জন্য আইন-আদালতের উপর নির্ভরশীল ছিল, যথা এটর্ণির কেরানী প্রভৃতি, তাদের যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যে ঢুকবার মত সামর্থ্য ছিল না, সেজন্য তাদের চাতুর্যের উপর নির্ভর করে চলতে হত। উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অর্থাৎ নতুন শহুরে শ্রেণী থেকে এরা খারাপ ছিল। অবশ্য রামমোহন একথাও স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যেও কিছু ভালো লোক ছিল। তারা যদি দেখত যে তাদের যোগ্যতা সমাদৃত হচ্ছে এবং সৎভাবে চলার জন্য তারা পুরস্কৃত হচ্ছে, তাহলে হয়তো তারা জনসাধারণের আস্থাভাজন হবার জন্য সচেষ্ট হত।[২২]

ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে রামমোহন যে মনে মনে গর্ব

অনুভব করতেন তা তাঁর রচনা থেকে জানা যায়। তিনি বলেন: "They have the same capability of improvement as any other civilized people." তাছাড়া হিন্দু ও মুসলমান শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে রামমোহন বলেন: "The Mahomedans are more active and capable of exertion than the Hindus, but the latter are also generally patient of labour and diligent in their employments, and those of the Upper Provinces are not inferior to the Mahomedans themselves in industry".[৩০] রামমোহন Upper Provinces-এর দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন যে, এর জন্য Mitaksara Law of inheritance অনেকটা দায়ী ছিল। এই আইনের disincentive effects-এর কথা তিনি উল্লেখ করেন।[৩১] অর্থনৈতিক ইতিহাসের গবেষকেরা এই বিষয় নিয়ে ভাবতে পারেন।

রামমোহনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা নিয়ে আরও অনেক আলোচনার অবকাশ আছে। এখানে তাঁর চিন্তাধারার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ করা হল। এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায়, রামমোহন ইংরেজের সহযোগিতায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন। এই আশা পোষণ করার কারণ ছিল এই যে, রামমোহনের কালে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেনি। তখনও এ সত্য ধরা পড়েনি যে, উপনিবেশ আসলে হল ধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণেরই পরিণতি ও কৌশল। ধনতন্ত্রবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ প্রভৃতি যে পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত তখনও তা ততটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। স্বভাবতই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্দীপিত রামমোহনের পক্ষে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির তাৎপর্য বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ শাসনের ভাবাত্মক দিকগুলি আলোচনা করলে

রামমোহনের ভূমিকা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কার্লমার্কস এই ভাবাত্মক দিকগুলি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। ব্রিটিশ শাসনেই ভারতবর্ষে প্রথম সার্থক রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য সম্পাদিত হয় এবং তার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যের বোধ জাগতে সুরু করে। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সেই ঐক্যবোধকে শক্তিশালী ও স্থায়ীরূপ দেবার পক্ষে সহায়ক হয়। নিজের স্বার্থেই ব্রিটিশ শাসকেরা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, আর সাময়িক পত্র প্রকাশের পথ সহজ করে দেয়। ফ্রি প্রেসকে ব্রিটিশ শাসনের এক অভিনব দান বলা যায়। ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনা বিকাশে এর মূল্য অপরিসীম। নতুন বাষ্পীয়যান আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বাজারের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ নিবিড় হয় এবং ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার চাপে ভারতবাসীর জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। তাহলেও এই যোগাযোগের ফলে পণ্য আসা-যাওয়া করতে থাকে এবং বৃহৎ বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতও ভারতবাসীর নিকট খুলে যায়। রেলপথ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের উদ্ভব হয়। যে শ্রমবিভাগ বর্ণভেদ ও জাতিভেদ ভিত্তি করে প্রাচীন কাল থেকে গড়ে উঠেছিল তার অপরিহার্যতা লোপ পায় এবং এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। যেসব প্রতিবন্ধকতার ফলে ভারতীয় সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয় তা দূর করবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর এক স্বচ্ছল ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী একদিকে যেমন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত ছিল তেমনি নতুন চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করে। একদিকে যেমন প্রাচীন মূল্যবোধের সঙ্গে তাদের সংঘাত বাধে, তেমনি অন্যদিকে আনুগত্যের মধ্যেও মাত্রাভেদে বিরোধের উপকরণ দেখা দেয়। মোট কথা, ব্রিটিশ শাসন এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। কার্লমার্কস এই আলোড়ন প্রত্যক্ষ করেই বলেন "Only Social Revolution

ever heard of in Asia".[৩২] সমগ্র রামমোহনকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো তিনিও এই Social Revolution বা সামাজিক কালান্তরকে বড় করে দেখেন এবং ইংরেজের সহযোগিতায় এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন দেখেন।

(খ) রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭ খ্রী)—উনবিংশ শতাব্দীর আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। এই যুগের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন এমন কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাঁরা রাধাকান্তকে 'প্রাচীন পন্থী' 'রক্ষণশীল' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে বাংলার নবজাগরণে তাঁর ভূমিকা অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেন। তাঁদের নিকট বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হল এই যে, রামমোহন ও পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর পরিচালিত সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে যে রক্ষণশীল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় তার নেতা ছিলেন রাধাকান্ত। তিনি সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে ধর্মসভা গঠন করেন এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিরোধিতা করেন। তাছাড়া হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওকে এবং হেয়ার স্কুল থেকে রসিক কৃষ্ণ মল্লিক ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিতাড়নের মূলেও ছিলেন তিনি। তরুণদের বিদ্রোহে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতারা ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অভিভাবকেরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁদের উৎকণ্ঠা দূর করবার প্রয়োজনে হিন্দু সমাজের নেতা রাধাকান্তকে উদ্যোগী হতে হয়। আর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মৌলিক সর্ত লঙ্ঘন করে ঐ কলেজে মুসলমান ছাত্র ভর্ত্তি করার বিরোধিতাও তিনি করেন। এইসব কারণে রাধাকান্ত তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট হতেও তিরস্কৃত হচ্ছেন। আর তাই 'রক্ষণশীল' রাধাকান্তকেই আমরা বেশী জানি। তাঁর কর্মজীবনের অন্যান্য দিক্ আমাদের মনকে ততটা নাড়া দেয় না। রাধাকান্তের সমালোচকেরা একবারও তাকিয়ে দেখেন না যে বিশেষ ঐতিহাসিক কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর যুগনায়কদের

মধ্যে একই সঙ্গে উদারনৈতিক-যুক্তিবাদী-রক্ষণশীল ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী উপকরণের এক অদ্ভুত জটিল সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। একথাও তাঁরা বিচার করেন না যে, এই সময়ে নানা ধারায় উপধারায় আমাদের জাতীয় চেতনা বিকশিত হয়। ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাজ হল সমসাময়িক ঘটনাবলীর পটভূমিকায় এই সমস্ত উপকরণ-গুলির ও ধারা উপধারাগুলির ব্যাখ্যা করা। এই যুগের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের ভূমিকা বিশ্লেষণে তাঁদের গায়ে 'প্রগতিশীল', 'রক্ষণশীল' ইত্যাদি লেবেল এঁটে দিলে অন্ততঃ আর যাই হোক ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করা হয় না। সতীদাহ প্রথা আলোচনা করতে গিয়ে কি করে আমরা ভুলে যাই রাধাকান্তের নিজ পরিবারে অর্থাৎ শোভাবাজার রাজ পরিবারে কখনও কেউ সতী হননি। আর তাঁর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কেউ সতী হলে তিনি গভীর বেদনা অনুভব করতেন। এই থেকে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় না রাধাকান্ত সতীপ্রথার একজন উগ্র সমর্থক ছিলেন। অবশ্য তিনি সামাজিক নিয়মের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। তাই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বেন্টিঙ্ক এই প্রথা রহিত করবার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করলে রাধাকান্ত প্রতিবাদ করেন। ধর্মসভা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করে। এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক নিয়মের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করা।[৩৩] নিঃসন্দেহে এই আন্দোলন রক্ষণশীলতার পরিচায়ক ছিল। তবুও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ সম্পর্কে এই মনোভাব হাল্কাভাবে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এই ধরণের মানসিকতা আমরা অনেক ব্যক্তির মধ্যে দেখতে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে Age of Consent Bill সম্পর্কে তিলকের ভূমিকা উল্লেখ করা যায়। তিলক এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কণ্ঠস্বর তাঁর মধ্যে আমরা শুনতে পেলাম। তেমনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ভূপেন্দ্র নাথ বসু যখন হিন্দু

ও অ-হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ আইনসিদ্ধ করবার জন্য বিল উত্থাপন করেন তখন রক্ষণশীল হিন্দুরা তার বিরোধিতা করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভি. জি. প্যাটেল যখন ভারতীয় আইন সভায় অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করেন (Hindu Marriages Validity Bill) তখনও রক্ষণশীল মতের সমর্থকেরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের মতামত চাওয়া হয়। তখন শ্রীঅরবিন্দ কোন সুনির্দিষ্ট মতামত না দিলেও একথাও বলেন ঃ "I should have preferred a change from within the Society rather than one brought by legislation". এইসব তথ্য থেকে জানা যায় যে, হিন্দু সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশ আইন করে সামাজিক নিয়ম পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না।[৩৪] অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাধাকান্ত দেবের যে মনোভাব আমরা দেখতে পাই তার প্রভাব বিংশ শতাব্দীতেও বিদ্যমান রয়েছে। রক্ষণশীলতার এই ধারাটি নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা হলে রক্ষণশীলতার সঙ্গে উদারনীতির দ্বন্দ্বের প্রকৃতরূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। কি কারণে বিংশ শতাব্দীতেও অনেক জাতীয়তাবাদী নেতার মধ্যে এই দুটো পরস্পর বিরোধী উপকরণের সংমিশ্রণ দেখা যায় তা বিশ্লেষণ করা সহজ হবে।

উপরন্তু একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ ও বেদনাপূর্ণ প্রতিবাদ করলেও সোজাসুজি আইন প্রণয়ন করে সতীদাহ রহিত করার পরামর্শ সরকারকে দেননি। তাঁর ধারণা ছিল পুলিশের উপযুক্ত সতর্কতার ফলেই কাজ হবে। তাছাড়া রামমোহন এই আশঙ্কাও করেন যে, সোজাসুজি আইনের দ্বারা সতীদাহ রহিত করলে হিন্দুরা ধর্ম বিষয়ে ইংরেজের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠবে। তাই আইন প্রণয়ন করে এই প্রথা রহিত করতে বেন্টিঙ্ক অগ্রসর হলে রামমোহন তা সমর্থন করতে পারেন নি। রামমোহনের এই মনোভাব দেখে

বেন্টিঙ্ক খুবই বিস্মিত হন। অবশ্য আইন পাশ হবার পরে রামমোহন বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দিত করেন। আর সনাতনীরা প্রিভি কাউন্সিলে এই আইনের বিরুদ্ধে আবেদন করলে রামমোহন এই আইন বহাল রাখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।[৩৫] সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রথমে রামমোহনও এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের পক্ষপাতী ছিলেন না। রাধাকান্ত ও রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য ছিল ঠিকই তবুও রামমোহনের এই মনোভাবও মনে রাখা দরকার। তাছাড়া রামমোহন হিন্দু সমাজের কোন কোন কুপ্রথার বিরোধী হলেও হিন্দুদের প্রচলিত সামাজিক আচরণগুলি পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। এমনকি তিনি নিজে খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে হিন্দু সমাজের নিয়ম কানুন মেনে চলেন। জাতিভেদ প্রথাকে জাতীয় অগ্রগতির অন্তরায় মনে করলেও রামমোহন এই প্রথার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন পরিচালনা করেননি। বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হলেও রামমোহন বিধবার বিবাহকে সদাচার বলেননি। তিনি তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী শৈব বিবাহ সমর্থন করেন। সম্প্রতি রামমোহনের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার দেখান যে, বিবাহ, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহন ব্রাহ্মনীয় ও তন্ত্রশাস্ত্র সমূহকে প্রামাণ্য মনে করেন এবং তাঁর মতে, তা অনুসরণ না করলে দোষনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই সব উল্লেখ করে ডঃ মজুমদার প্রশ্ন করেন: রামমোহনের এই মনোভাব 'আধুনিক বঙ্গসমাজ' প্রতিষ্ঠায় কতটা সহায়ক ছিল? আর এই মনোভাবের সঙ্গে বলিষ্ঠ যুক্তিবাদী চিন্তার কতটা সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়? ডঃ মজুমদারের মতে, কেবলমাত্র সতীদাহ প্রথা নিবারণে রামমোহন প্রচলিত সামাজিক রীতি অনুসরণ করেননি।[৩৬] রাম-মোহন চরিত্রের এই সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখলে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার শিকড় কত গভীরে ছিল তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু রাধাকান্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে

আমরা এইসব কথা মনে রাখি না বা ভেবে দেখা প্রয়োজন মনে করি না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রাধাকান্তের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। রামমোহন থেকে রাধাকান্ত অনেক বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাধাকান্ত হিন্দু কলেজ, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭ খ্রী), ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮ খ্রী), বঙ্গ-ভাষানুবাদক সমাজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত থেকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে ও নতুন চিন্তা উন্মেষে এই সব প্রতিষ্ঠানের যে বিশেষ ভূমিকা ছিল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ উৎসাহদাতা ও সমর্থক ছিলেন রাধাকান্ত। এই বিষয়ে একটানা দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর তিনি যেসব কাজ করেন তা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে একবাক্যে স্বীকার করতে হবে তাঁর প্রচেষ্টাও আধুনিক বঙ্গ সমাজ গঠনে সহায়ক হয়। শিক্ষার প্রকৃত মাধ্যম কি হওয়া উচিত এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রাধাকান্ত সরকারকে বলেন যে, শুধু মাতৃভাষা শিক্ষার উপর জোর দিলেই চলবে না; যাতে যুবকেরা মাতৃভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করে কৃষি ও শিল্প বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে তারজন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমেই জনসাধারণকে সুশিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি তিনি সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ স্বল্প ইংরেজি জ্ঞান যুবকদের কৃষি ও শিল্প থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাবে এবং তাদের সরকারী ও সওদাগরী অফিসে কেরাণী হতে প্রলুব্ধ করবে। তাতে বেশীরভাগ যুবকেরা হতাশায় ভুগবে এবং ইংরেজি ভাষায় স্বল্প জ্ঞান তাঁদের অহঙ্কারী করে তুলবে। তাঁরা আর নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যে ফিরে আসতে পারবে না এবং ভবঘুরে পরিণত হবে।[৩৭] তখনকার দিনে রাধাকান্ত মাতৃভাষা বনাম

ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো কারও চেয়ে তাঁর দূরদৃষ্টি কম ছিল না। শিল্পে ও কৃষিক্ষেত্রে দেশকে কিভাবে গঠন করা যায় সে চিন্তা তিনিও করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যুবকদের চরিত্র গঠনে যত্নবান হন। তাদের মধ্যে সুরাপান নিবারণের জন্য তিনি আন্দোলন সুরু করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে রাধাকান্তের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে সে যুগের একজন লেখক মন্তব্য করেন : "In those days Kali Krishna Bahadur and Radhakanta Dev stood foremost in the rank of enlightened Hindus and patronized popular education through the medium both of English and Bengali. It sounds strange, at the present day, that it was with the approbation of Radhakanta Dev, that Gour Mohan in 1818 wrote the Stri Shikhya Bidhayak or 'Female Education Advocated', a clever and telling pamphlet, which still deserves to be circulated."[৩৮]

আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় অতীত দিনের গৌরব শিক্ষিত হিন্দুদের নতুন চিন্তায় অনুপ্রাণিত করে। এই চেতনা দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটায়। এই বিষয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চা সহায়ক ছিল। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও রাধাকান্তের অবদান আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। তিনি একদিকে যেমন ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন, তেমনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তাই একই সঙ্গে বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারে মনোযোগী হন। এইখানেই রাধাকান্ত ও রামমোহনের মধ্যে আমরা পার্থক্য দেখতে পাই। লর্ড আমহার্স্টকে রমেমোহন লেখেন যে, সংস্কৃতের চর্চা দেশবাসীকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখবে। অন্যদিকে রাধাকান্ত সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করেন। তারফলে সংস্কৃত

চর্চা অনেক সহজসাধ্য ও সহজলভ্য হয়। যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে রাধাকান্ত আধুনিক সংস্কৃত অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম' রচনা করেন তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির বাণীবাহকের কাজে এই গ্রন্থের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানবিক বিদ্যা চর্চার উন্নয়নের প্রয়োজনেই সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপারে সরকারী ঔদাসীন্য দূর করতে তিনি অগ্রসর হন। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার, 'রক্ষণশীল' ও সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী রাধাকান্ত শিক্ষা প্রণালী ও পাঠ্য পুস্তক সমূহকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম-বিষয় মুক্ত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। রাধাকান্ত শিক্ষানীতিতে যে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় দেন তার প্রতি অনেকেই গুরুত্ব আরোপ করেননি।[৩৯]

শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও রাধাকান্তের যথেষ্ট অবদান ছিল। আমাদের দেশে কৃষি কর্মের উন্নতির জন্যই এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টি কালচারাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাধাকান্ত ছিলেন এর সহকারী সভাপতি। চব্বিশ পরগণা জেলার কৃষির উন্নতির জন্য তিনি যে প্রস্তাব দেন তা অর্থনৈতিক ইতিহাসের ছাত্রদের কাজে লাগবে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হয়। তখন শিক্ষিত ভারতীয়দের দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। এই সময়েই ভারতবর্ষে চায়ের উৎপাদন ও ব্যবসার প্রয়োজনে বেন্টিঙ্ক একটি 'টি কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির প্রচেষ্টাতেই আসামের চা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাধাকান্ত দেব এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন।[৪০] বাণিজ্যিক পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেন্টিঙ্কের সঙ্গে রামমোহন, দ্বারকানাথ ও রাধাকান্তের সহযোগিতা লক্ষণীয়। আমরা দেখতে পাই, ভারতবর্ষে শিল্পোন্নয়নের ও কৃষির উন্নতির ক্ষেত্রে 'প্রগতিশীল' রামমোহন ও 'রক্ষণশীল' রাধাকান্ত একই পথে এগুচ্ছেন।

রাধাকান্ত জমিদার সভা ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। মুখ্যতঃ জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার্থে জমিদার

সভা প্রতিষ্ঠিত হলেও জনহিতকর কার্যও এই সভা কর্তৃক সম্পাদিত হয়। রাধাকান্ত বলেন, সরকারের নীতির ফলে জমিদার ও প্রজাদের ক্ষতি হচ্ছে। সরকার লাখেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তির উপর কর বসাতে উদ্যোগী হলে তার প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধন করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এর সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব। তিনি বলেন যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট ভারতবাসীর অভাব ও অভিযোগ পেশ করার জন্য অনেকদিন ধরেই একটি সংগঠিত প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাধাকান্ত এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। সকল প্রকার প্রজার বিচারকার্যে একই রকম নিয়ম চালু করার দাবিতে যে আন্দোলন হয় তার একজন সক্রিয় সমর্থক ছিলেন রাধাকান্ত দেব। ভারতীয়রা বিচারকার্যে দক্ষ, এই ধারণা তাঁরও ছিল। জুরি দ্বারা বিচার ব্যবস্থার তিনিও একজন সমর্থক ছিলেন। আর ভারতীয় জুরিদের যোগ্যতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।[৪১] তাছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিল সার্ভিসে কর্মচারী নিয়োগের জন্য যে ধরণের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল তা পবিবর্তন করার পক্ষপাতীও তিনি ছিলেন। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান প্রজারা যাতে বিনা প্রতিযোগিতায় সিভিল সার্ভিসে ঢুকতে পারে তার জন্য কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে ব্যবস্থা করবার জন্য ইণ্ডিয়া বোর্ডের নিকট ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যে আবেদন পত্র পেশ করা হয় তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রাধাকান্ত দেব। লক্ষনীয় এই যে, হিন্দু কলেজের শর্ত লঙ্ঘন করে মুসলমান ছাত্রদের সেই কলেজে ভর্তি করতে যিনি সম্মত ছিলেন না, সেই রাধাকান্ত দেব সিভিল সার্ভিসে হিন্দু-মুসলমানদের

নিয়োগের ব্যাপারে ও তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আমরা হিন্দু কলেজের মুসলমান ছাত্রদের ভর্তির বিষয়টাই মনে রেখেছি, কর্মে নিয়োগের বিষয়টি ভুলে গেছি। এই কারণে ইণ্ডিয়া বোর্ডের সেক্রেটারী যে চিঠি রাধাকান্ত দেবকে দিয়েছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করছি: "I am directed by the Commissioners for the affairs of India to acknowledge the receipt of the memorial, which without date, you and the other members of the Committee of the British Indian Association assembled at Calcutta, have addressed to the Board, suggesting certain alterations in the rules under which the competitive examination of the Civil Service of the East India Company is at present conducted.

"Your proposition is, in effect, that every year, at the presidency towns of Calcutta, Madras and Bombay, a certain number of Hindoo and Mohamedan subjects of her mejesty shall be admitted into the Civil Service without competition with other classes of the Queen's subjects and under a lower standard of qualification than that required from others.

"The Board do not see any evidence that such an arrangement was within the view of the Legislature, or of the gentlemen who framed rules for the examination; and the list of candidates for the medical service of the Company, shews that the competition for the branch is not limited to persons of European descent,

although in that case also the examination is confined to the capital of the British Empire."[৪২]

জাতীয় চেতনা উন্মেষে রাধাকান্তের ভূমিকা যে নগণ্য ছিল না তা আরও একটি ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। নীলদর্পন নাটকের ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে যে মামলা-মোকদ্দমা হয় তাতে রাধাকান্ত সক্রিয়ভাবে লঙের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। এই মামলার বিচারক স্যার মর্ডাণ্ট ওয়েলস প্রকৃতপক্ষে নীলকরদের সমর্থক ছিলেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরূপে ভারতীয় চরিত্রের উপর দোষারোপ করে অনেক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ভারতীয়রা 'জালিয়াত' ও 'মিথ্যাবাদী' ("a nation of forgers and perjurers")। তিনি সামান্য অপরাধের জন্য ভারতীয়দের কঠিন শাস্তি দিতেন।[৪৩] 'নীলদর্পন মামলা' পরিচালনার সময় ভারতীয়দের প্রতি তাঁর ঘৃণা ও বিদ্বেষ আরও প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট বিকেল চারটায় শোভাবাজারে রাধাকান্ত দেবের বাড়ির নাটমন্দিরে রাধাকান্তের সভাপতিত্বে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওয়েলসের দুঃস্বভাবের বিষয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর স্টেট সেক্রেটারীর গোচর করা হয়। প্রায় কুড়ি হাজার লোক এই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন। এই আবেদন পত্র গোপনে মুদ্রিত হয় এবং একমাস ধরে গোপনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। বাঙালীর মধ্যে এতই সুদৃঢ় একতা ছিল যে, অনেক অর্থের লোভ দেখিয়েও ইংলিশম্যান হরকরা সম্পাদক এই আবেদন পত্রের কপি সংগ্রহ করতে পারেনি। এই ঘটনাকে ভারতীয়দের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। স্যার চারলস উড আবেদন পত্রের উত্তর দেন ও ওয়েলসকে সাবধান করে দেন। এই ব্যাপারে ও নীলকরদের সংযত করতে উদ্যোগী হওয়ায় চারলস উড ভারতীয়দের শ্রদ্ধা অর্জন

করেন। তাঁকে একখানি অভিনন্দন পত্র দেবার উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়ে যে সভা করেন তারও সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত। এই সভায় তিনি উডের মঙ্গলকর কার্যাবলীর প্রশংসা করে ভাষণ দেন।[৪৪]

এখানে সংক্ষেপে রাধাকান্ত দেবের কার্যাবলীর যে বিবরণ উপস্থিত করা হল তাতে কি নিজ ধর্ম ও সমাজের আচরণ বিধির প্রতি একান্ত অনুগত রাধাকান্ত দেবকে পুরোপুরি প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল মনে হয়? উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে তাঁর সমসাময়িক যে সব উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব রয়েছেন তাঁদের পাশে কি তাঁকে বড়ই ম্লান মনে হয়?

আধুনিক বঙ্গসমাজ গঠনে রাধাকান্তের অবদান অনস্বীকার্য। যাঁরা তাঁকে 'পুরাতনপন্থী' ও 'রক্ষণশীল' বলে তাঁর ভূমিকা অগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করেন তাঁদের উদ্দেশ্য করেই সেকালের একজন ইয়ং বেঙ্গলের নেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "To the remarks made on the Rajah's retrograde movements and his obstructions to progress, I can only say that it is unfair to compare him with persons who were his juniors by more than half a century, as unfair, indeed as it would be to disparage the statesmanship of a by-gone politician, such as Mr. Pitt, by saying that he was no reformer, or that he did not propose household suffrage. A man in this respect can only be compared with his own contemporaries. Judged by such a standard, the Rajah would certainly appear not behind, but in advance of his equals in age."[৪৫]

(গ) ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫–১৮৪২ খ্রী)—রামমোহনের যুগের আর একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি হলেন ডেভিড হেয়ার। রাধাকান্ত

দেবকে আমরা যেমন রক্ষণশীল বলে অগ্রাহ্য করেছি, তেমনি ডেভিড হেয়ারকেও আমরা বিশেষ মনে রাখিনি। অথচ এই মানুষটি বিদেশী হয়েও দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বৎসর এই দেশের উন্নতির জন্য আত্মত্যাগ করেন। আচার-আচরণে তিনি আমাদেরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন, আর আমাদের দেশের মাটিতেই তাঁর মরদেহ মিশে গেছে। রামমোহনেরও অনেক আগে কলকাতায় এই মানুষটি প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটানা দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর (১৮০০-১৮১৪) সম্ভ্রান্ত বাঙালী ভদ্রলোকদের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় রত থেকে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক কু-প্রথাগুলি তাঁদের সামনে তুলে ধরেন, আর আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করেন। তখন ঘড়ির ব্যবসা ও ঘড়ি প্রস্তুত কারকের কাজে নিযুক্ত থাকায় হেয়ারের পক্ষে সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবারের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছিল। কু-প্রথাগুলি দূর করে দিয়ে হিন্দু সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে তিনি তৎপর হন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তিনি শিক্ষার প্রসারে পরিশ্রম করতে আরম্ভ করেন। সর্বক্ষণের কর্মী না হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো সম্ভব নয়। তাই ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঘড়ির ব্যবসা ছেড়ে দেন। দোকান-পাট বিক্রি করে দিয়ে যা টাকা পান (একলক্ষ টাকা), তা দিয়ে নিজের ভরণপোষণের জন্য কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে জমি-জমা কেনেন এবং শিক্ষার স্বার্থে সারাক্ষণের কর্মীরূপে আত্মনিয়োগ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ডেভিড হেয়ার ছাড়া আর কি কেউ সারাক্ষণের কর্মীরূপে শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ? সম্ভবতঃ নয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেই ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। ঠিক কলেজ প্রতিষ্ঠায় হেয়ার প্রত্যক্ষভাবে কতটা যুক্ত ছিলেন এই নিয়ে হয়তো বিতর্কের অবকাশ আছে। তবুও বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, প্রথম দিকে হিন্দু কলেজের গঠন পদ্ধতি রচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে হেয়ারও ছিলেন।

গোঁড়া হিন্দু ভদ্রলোকদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ এই হিন্দু কলেজের পাঠ্যতালিকা নির্ধারণে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা হয়। অন্যদিকে খ্রীষ্টান ও মুসলমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কেন হিন্দু কলেজে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়? অনেকেই সন্দেহ করেন, এই পাঠ্য-তালিকা নির্ধারণে ডেভিড হেয়ারের হাত ছিল। মনে রাখা দরকার, হেয়ার ছিলেন ধর্ম-বিরোধী, ঈশ্বর বিরোধী ও খ্রীষ্টান বিরোধী। আর পুরোপুরি যুক্তিবাদী। যে সব গোঁড়া হিন্দুরা রামমোহনের মত নরমপন্থী উদারনৈতিক ব্যক্তির ধর্মীয় মনোভাব সহ্য করতে পারেননি, তাঁরা কিন্তু ডেভিড হেয়ারের মত ঈশ্বর বিরোধী যুক্তিবাদী ব্যক্তির প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু, কেন? তার কারণ হল এই, শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু সমাজের উন্নতির জন্য তিনি যেভাবে আত্মনিয়োগ করেন, নিজের অর্থ ও সম্পদ নিয়োজিত করেন, ছাত্রদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রকাশ করেন, ব্যক্তিগত জীবনে সহজ সরল জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন ও আচার-আচরণে বাঙালী জীবনের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেন, তাতে স্বাভাবিকভাবেই গোঁড়া হিন্দুরা পর্যন্ত তাঁর উপর আস্থা-স্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তাই হেয়ারের ব্যক্তিগত চিন্তাধারা অর্থাৎ ঈশ্বর বিরোধী যুক্তিবাদী মন তাঁদের মোটেই উদ্বিগ্ন করে তোলেনি। পরের হিতার্থে তিনি নিজেকে এমনভাবে উৎসর্গ করেন যে, কলকাতার হিন্দু সমাজ হেয়ারকে তাঁদেরই একজন পরমাত্মীয় মনে করেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে হেয়ারের নাম কেন সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়নি তা বুঝতে হলে হেয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ প্রয়োজন। হেয়ার প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রচারের বিরোধী ছিলেন। তাই তাঁর নাম আড়ালে থেকে গেলো। কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জানতেই পারেননি যে, তিনি হিন্দু কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাছাড়া তিনি মনে করেন, হিন্দুরা উদ্যোগী হলে কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ সহজ হবে। তাই তাঁদের

সংগঠিত করে, তাঁদের সামনে রেখে, তিনি পেছনে থাকেন। সম্ভবতঃ হেয়ারের পেশার (ঘড়ি নির্মাতা ও ব্যবসায়ীরূপে) ও তাঁর ঈশ্বর বিরোধী মতবাদের জন্য তিনি কলকাতার ইংরেজ সমাজের নিকট ততটা প্রিয় ছিলেন না। তাই তাঁর উপস্থিতি তাঁর জীবনের মহান ব্রতকে যাতে ব্যর্থ না করে দেয় সে বিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। এই কারণেই হয়তো হাইড ঈষ্টের বাড়িতে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে ধীরে ধীরে আমরা তাঁর উপস্থিতি ও প্রভাব দেখতে পাই। শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে যে কয়টি সংস্থা গঠিত হয় (ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি ইত্যাদি) তার প্রত্যেকটির সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন। কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা সর্বজনবিদিত (১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি)। স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে সময় তখনও উপযোগী হয়নি বলে তাঁর ধারণা ছিল। তাই এই বিষয়েই শুধু প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না। তাহলেও স্ত্রী শিক্ষার প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল এবং এর প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে যে 'লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন' প্রতিষ্ঠিত হয় তার তিনি চাঁদাদাতা ছিলেন। তাছাড়া রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে যখন হিন্দু মেয়েদের পাঠ শেষে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হত তাতে তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের ঘনিষ্ঠতার কথা স্মরণে রাখলে 'রক্ষণশীল রাধাকান্তকে' ততটা অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হবে না।[৩৬]

বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে এজেন্সি হাউসেজগুলির ভূমিকা নিয়ে এখনও বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি। এরা দেশীয় স্কুলগুলিকে অর্থ সাহায্য করত। ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির ট্রেজারার ছিল মেসার্স ম্যাকিনটশ এণ্ড কোম্পানী। ১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এজেন্সি হাউসেজগুলির পতন হলে অর্থাভাবে দেশীয় স্কুলগুলি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত

হয়। এই সময়ে ডেভিড হেয়ার স্কুলগুলি রক্ষা করার জন্য অপরিসীম পরিশ্রম করেন এবং নিজে অনেক অর্থ সাহায্য করেন। শিক্ষার মাধ্যম কি হবে—ইংরেজি না মাতৃভাষা—এই নিয়ে তখন যে আলোচনা হয় তাতে হেয়ার উভয় ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা উল্লেখ করেন। এই কারণেই ইংরেজি ও মাতৃভাষায় গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন এবং এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য পণ্ডিতদের নিয়োগ করেন। ভাবতে অবাক লাগে কত আগে হেয়ার শিক্ষার বাহনের কথা চিন্তা করেন এবং একটি সমন্বয়ী পন্থা অনুসরণ করতে বলেন। হেয়ার প্রতিষ্ঠিত বাংলা স্কুলে অধ্যয়নরত একজন ছাত্র বলেন: "Mr. Hare's educational efforts were directed in the first place toward the encouragement of the vernacular".[৪৭] কিন্তু বাংলার জনশিক্ষার ধারাটি কেন ব্যাহত হল? এই বিষয়ে এ্যাংলিসিষ্ট ও ওরিয়েন্টালিষ্ট মতের সমর্থকদের দায়িত্বই বা কতটুকু ছিল? এইসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলে ডেভিড হেয়ার ও তাঁর সমসাময়িকদের ভূমিকা আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।

শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়াও আরও অন্যান্য বিষয়ে ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা ছিল, যথা: (ক) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার্থে এবং জনসভার উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে গবর্ণর জেনারেলের নিকট আবেদন পত্র দাখিল করার জন্য ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারী কলকাতার নাগরিকেরা টাউন হলে একটি সভার আয়োজন করেন। এর একজন উদ্যোক্তা ছিলেন হেয়ার এবং এই সভায় তিনি একজন বক্তাও ছিলেন। (খ) এই সময়ে মরিশাস ও বুরবোঁ দীপপুঞ্জে ভারতীয় কুলি চালানের ব্যবসা শুরু হয়। জোর করে ও প্রতারণা করেও কুলি পাঠানো হত। হেয়ার নিজে উদ্যোগী হয়ে এই ধরনের অনেক কুলিকে মুক্তিদান করেন এবং জোর করে কুলিপাঠানোর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। এই অন্যায় প্রথার

প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুলাই কলকাতার টাউন হলে একটি সভা হয়। সরকারের নিকট একটি আবেদন পত্র পেশ করা হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সরকারের পক্ষ থেকে একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করা হয়। হেয়ার ও আরও অনেকে এই কমিটির নিকট সাক্ষ্য দেন। তার ভিত্তিতে এই কমিটি যে রিপোর্ট দেয় তাতে কুলিদের দুর্দশার কিছুটা লাঘব হয়। এই বিষয়ে হেয়ারের ভূমিকা পড়তে পড়তে আর একজন ভারত সুহৃদ বিদেশীর কথা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি হলেন মহামতি দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ। সম্প্রতি ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও হেয়ারের এই ভূমিকার কথা উল্লেখ নেই। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় হেয়ারকে অগ্রাহ্য করা কি যুক্তিসঙ্গত কাজ হবে? (গ) ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮জুলাই কলকাতার টাউন হলে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সমগ্র দেশে জুরি প্রথার প্রবর্তন করা। হেয়ার ছিলেন এর উদ্যোক্তা। (ঘ) হেয়ার বিচারালয়গুলিতে ফারসি ভাষার ব্যবহার রহিত করবার জন্যও উদ্যোগী হন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রস্তাব হেয়ার সমর্থন করেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হেয়ার এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। তাছাড়া হেয়ার আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যথা— একাডেমিক এসোসিয়েশন, সোসাইটি ফর দি একুইজিসান ফর জেনারেল নলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ইত্যাদি।

হেয়ারের ভূমিকার প্রকৃত মূল্যায়ণের প্রয়োজনে হেয়ার-ডিরোজিও ও হেয়ার-রামমোহন সম্পর্ক আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। হেয়ার ডিরোজিওর প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। স্বাধীন

চিন্তার অধিকারী ডিরোজিও হেয়ারের মত ঈশ্বর বিরোধী ছিলেন। দুজনের চিন্তাধারায় অনেক মিল ছিল। তাই তাঁরা পরস্পরের এত নিকটে ছিলেন। আর এই কারণেই হিন্দু কলেজের হেড মাস্টার হেয়ারকে 'a vile sycophant' (of Derozio) বলে গালাগালি দেন। কোন কোন বিষয়ে এই দুইজনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও হেয়ারকে বাদ দিয়ে ডিরোজিওর ভূমিকা আলোচনা খুবই অসম্পূর্ণ হবে। অথচ এই ধরণের একটি ঝোঁক অনেক দিন ধরেই ইয়ং বেঙ্গল নিয়ে আলোচনায় রত লেখকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁরা দু এক লাইনে ডেভিড হেয়ারের নাম উল্লেখ করেই তাঁদের কর্তব্য সমাধা করেন। তেমনি যুক্তিবাদী রামমোহনের সঙ্গে যুক্তিবাদী হেয়ারের কোন কোন বিষয়ে মিল ছিল। দুজনেই শিক্ষার প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনে অনেক আলাপ-আলোচনা করেন ও উদ্যোগী হন। তা সত্ত্বেও ধর্মবিশ্বাসী রামমোহনের সঙ্গে নাস্তিক হেয়ারের পার্থক্যও ছিল অনেক। অবশ্য মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা কখনই নষ্ট হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহান নায়ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের কিছু কিছু উপকরণ হেয়ার চরিত্রে পাওয়া যায়। তাই এই দুই চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না। উভয়েই শিক্ষার প্রসারের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। উভয়ের আচার-আচরণে সরলতা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর দরদ দুজনেরই ছিল। পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর অস্বাভাবিক ক্ষমতাও দুজনের ছিল। আর দুজনেই যুক্তিবাদী মননের অধিকারী ছিলেন।[৪৮] হেয়ার যখন মারা যান তখন বিদ্যাসাগর বাইশ বৎসরের যুবক। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। কাজেই এই সময় থেকেই বিদ্যাসাগর কলকাতার বাসিন্দা হন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগরের

ছাত্র জীবন পরিসমাপ্ত হয়। তখন সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ একই গৃহে অবস্থিত ছিল। স্বভাবতই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের অনেকের অন্তরঙ্গতা হয়। আর বিদ্যাসাগর ডিরোজিওর চিন্তা-ধারার সঙ্গেও পরিচিত হন। তাছাড়া খুব কাছে থেকে ডেভিড হেয়ারকে দেখার সৌভাগ্যও তাঁর হয়। তাই হেয়ারের প্রভাব বিদ্যাসাগরের উপর পড়বে তাতো স্বাভাবিক। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন হেয়ারের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর গভীর বেদনা অনুভব করেন। হেয়ারের স্মরণে যেসব সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে বন্ধুবান্ধবসহ বিদ্যাসাগর উপস্থিত থাকতেন। তা থেকেই হেয়ারের প্রতি বিদ্যাসাগরের গভীর শ্রদ্ধার মনোভাব বোঝা যায়। বিদ্যাসাগর রামমোহনকে কতটা স্বচক্ষে দেখেছেন জানিনা। কিন্তু তিনি তো প্রতিদিন কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে হেয়ারকে দেখেছেন।[৪৯] তাই পরবর্তীকালে যেন বিদ্যা-সাগরের মধ্যে আবার আমরা হেয়ারকে দেখতে পেলাম অনেক বেশী বলিষ্ঠতা ও ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। একথা বল্লে কি খুবই অত্যুক্তি হবে?

বর্তমানে যে অর্থে আমরা স্বাদেশিকতার অর্থ বুঝে থাকি তার খাঁটি নিদর্শন আমরা পাই ডিরোজিও রচিত The Fukeer of Jungheera নামক কবিতার মধ্যে এবং তাঁর শিষ্য কাশীপ্রসাদ ঘোষ রচিত কবিতায় (১৮৩০ খ্রী)। সম্প্রতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল : ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণে হেয়ারের কথা ভুলে যাওয়া কি উচিত হবে? যে পটভূমিকায় স্বাদেশিকতার উন্মেষ হল সেখানে তো এঁরা সবাই—হেয়ার-ডিরোজিও-ইয়ংবেঙ্গল—পরস্পরের কাছে ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা মনে রাখলে পরবর্তী কালের বিখ্যাত নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে বুঝতে সুবিধা হবে। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাঃ দুর্গাচরণ ব্যানার্জি সেযুগে কলকাতার একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। প্রথম জীবনে দুর্গাচরণ হেয়ারের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। হেয়ারের পরামর্শেই দুর্গাচরণ মেডিক্যাল

কলেজে ভর্তি হন এবং পরে চিকিৎসকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। হেয়ার ও ডিরোজিওর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই দুর্গাচরণের পরিবারে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথের লিখিত প্রবন্ধেই তা জানা যায়। এইভাবেই সুরেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে প্রথম দীক্ষিত হন।[৫০]

এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে হেয়ারের প্রভাব খুবই সুদূরপ্রসারী ছিল। শিক্ষিত বাঙালীর জাতীয় চেতনা বিকাশে তাঁর অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন। আমরা কি করে ভুলতে পারি যে, প্রচণ্ড বর্ষণ সত্ত্বেও পাঁচ হাজার শোকার্ত মানুষ তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে সমবেত হন। সে যুগে আর তো কোন বিদেশীকে বাঙালী সমাজ এতটা আপন করে গ্রহণ করেনি। কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে হেয়ারের কবরের দিকে তাকালে আর একটা কথাও মনে আসে। কেন খ্রীষ্টানদের জন্য নির্দিষ্ট কবরখানায় শায়িত না থেকে হেয়ার এইখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন? হেয়ার হয়তো ধারণা করে-ছিলেন তাঁর ঈশ্বর বিরোধী মনোভাবের জন্য খ্রীষ্টান সমাজ, বিশেষ করে পাদ্রীরা তাঁদের কবরখানায় তাঁকে স্থান দিতে আপত্তি করতে পারেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি নিজের কেনা জমিতে, নিজের কীর্তিকলাপের সান্নিধ্যে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকার সিদ্ধান্ত নেন।[৫১] সমগ্র হেয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে একটা প্রশ্ন সহজেই মনে আসবে: তাঁর মত চিন্তায় ও কর্মে এতটা সমন্বয় সাধন সে যুগে কি আর কারও মধ্যে পাওয়া যায়? বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে আমরা হেয়ারকে প্রায় ভুলতে বসলেও উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর কীর্তি যে কতটা অম্লান ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় হেয়ার স্মরণে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জনসমাবেশে। প্রসঙ্গতঃ হেয়ার মেমোরিয়াল মিটিং ও হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড কমিটির ভূমিকা উল্লেখ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে এই দুটো সংস্থা স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হয়।[৫২] অবশ্য হেয়ার জীবিত থাকাকালীন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা তাঁর

ছাপ্পান্নতম জন্মদিনে একটি সভার আয়োজন করে যে মানপত্র দেন তাও উল্লেখযোগ্য। তাতে বলা হয় : "We have, therefore, resolved upon soliciting the favour of your sitting for your portrait…it will be gratification to our feeling if we are permitted to keep among us a representation of the man who has breathed a new life into Hindu Society, who has made a foreign land the land of his adoption, who has voluntarily become the friend of a friendless people, and set an example to his own countrymen and ours, to admire which is fame and to imitate, immortality."[৫৩] ডেভিড হেয়ারের নাম স্মরণার্থ যে তৃতীয় বাৎসরিক সভার আয়োজন করা হয় তার প্রধান বক্তা ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তাঁর ভাষণ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। আট পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা একটি মূল্যবান ডকুমেণ্ট। এই পুস্তিকায় অক্ষয় কুমার দত্ত আধুনিক বঙ্গসমাজ গঠনে ডেভিড হেয়ারের ভূমিকার বিশদ আলোচনা করেন। অক্ষয় কুমার বলেন : "এইক্ষণে আমরা যে কিছু জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছি, সে কেবল তাঁহারই প্রসাদাৎ। তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা সৃষ্টির নিয়ম সকল জ্ঞাত হইতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ সূর্য্য নক্ষত্রাদির স্বভাব জানিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ গ্রহচন্দ্র ধূমকেতুর দূর, পরিমাণ এবং গতিবিধি সকল শিক্ষা করিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ পৃথিবীস্থ স্বদেশ বিদেশাদি সমূহ স্থানের বৃত্তান্ত আলোচনা করিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা আপনাদিগের শরীরের নিয়ম, মনের স্বভাব, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যালাভ করিতেছি, অধিক কি কহিব, তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা এক নূতন প্রকার জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিয়াছি। ভারতবর্ষের মহৎ বিদ্যালয় যে হিন্দু কলেজ, তাহা স্থাপনের মূলাধার করেন কোন্ ব্যক্তি?—সকলেই অবশ্য ব্যক্ত করিবেন যে শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার

সাহেব। বঙ্গভাষাকে উন্নত করিবার জন্য প্রথম যত্নবান্ কোন্ মনুষ্য ?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। উপদেশ দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যা বিস্তার জন্য মহোৎসাহী কোন্ পুরুষ ?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। অশেষ মঙ্গলের কারণ যে মুদ্রাযন্ত্র তাহার স্বাধীনতা স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী কোন্ মহাত্মা ?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। এইরূপে এদেশের জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ সন্ধান জন্য যে প্রশ্ন করা যায়, সেই প্রশ্নের উত্তরেই ভারতরাজ্যের বিদ্যারূপ বৃক্ষমূলে হেয়ার সাহেবকে বীজরূপে দৃষ্টি করা যায়। তিনি আমারদিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ—কোটি গুণ মূল্যবান বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা দ্বারা আমরা জ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা দয়া ও সত্য ব্যবহার যে কি মহোপকারী, তাহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।”[৫৪]

অক্ষয় কুমার দত্তের এই অনবদ্য ভাষণ ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা বিশ্লেষণে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনায় অপরিহার্য উপাদান বলা চলে। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব আন্ত-র্জাতিকতাবাদীদের পরিচয় আমরা পাই তাঁদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার অন্যতম ছিলেন। অক্ষয় কুমার দত্তের ভাষায়ঃ “তিনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষকে ভিন্ন জানিতেন না। এই সত্যের প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে পৃথিবী তাঁহার জন্মভূমি এবং সমুদয় মনুষ্য তাঁহার পরিবার।”[৫৫] এই ডেভিড হেয়ারকে কি আমরা ঔপনিবেশিক শাসনের অংশ হিসেবে ভাবতে পারি ? নিশ্চয়ই নয়। যিনি ভারত-বাসীর স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছিলেন তিনি তো আমাদেরই একজন। আমাদের জাতীয় চেতনার বিকাশে হেয়ারকে অস্বীকার করার অর্থ হল উত্তরাধিকারকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে না পারা। সম্প্রতি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় ডেভিড হেয়ারের কতটুকু অংশ ছিল তা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। যাঁরা

ডেভিড হেয়ারের ভূমিকাকে প্রায় অগ্রাহ্য করতে চান তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য উপরে উল্লিখিত অক্ষয় কুমার দত্তের উক্তি ও আরও কয়েকটি তথ্য এখানে উল্লেখ করছি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার স্মরণে যে সভা হয় তাতে বারাসতের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র Practical Education নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৬] ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে Recollections of My School Days নামে যে ধারাবাহিক রচনা 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' কাগজে প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন ডেভিড হেয়ার, রামমোহন নন। রেভাঃ লাল বিহারী দে ছিলেন এই প্রবন্ধের লেখক। ডেভিড হেয়ারের ও রামমোহনের ভূমিকা আলোচনায় এই রচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।[৫৭]

হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু লেখেন : "হেয়ার সাহেব প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট ভাল প্রণালীতে একটা বৃহৎ ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পরে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি হাইকোর্টের পরলোকগত জজ অনুকুল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ, তিনি উহা প্রস্তাব করায় কার্য্যে পরিণত হয়"।[৫৮] রাজনারায়ণ বসু লেখেন, ডেভিড হেয়ার উদ্যোগী হয়ে ইংরেজি শিক্ষার দুরবস্থা দূর করেন এবং "তাঁহাকে এতদ্দেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষার সৃষ্টিকর্ত্তী বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"[৫৯]

সুতরাং বিভিন্ন তথ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ হিন্দু কলেজের প্রধান উদ্যোগীরূপে ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার একজন মুখ্য প্রবর্ত্তকরূপে ডেভিড হেয়ারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।[৬০] এই মনোভাব অগ্রাহ্য করা কি সম্ভব?

সূত্র নির্দেশ

১. অক্ষয় কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, কলিকাতা, শকাব্দ ১৭৯২, পৃষ্ঠা : ১০৬, ১৫১-১৮৬ ; ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০, পৃষ্ঠা : ৮৮-৮৯ ; Amitabha Mukherjee, Reform and Regeneration in Bengal, Calcutta, 1968, Chapter III. এই উপাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে কি ভাবে তথ্য সংগৃহীত হল সে বিষয়ে অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর গ্রন্থের প্রথম ভাগে (শকাব্দ ১৭৯২) উপক্রমনিকাতে এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য আমি এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি : "কাশীর রাজার মুন্সী শীতল সিংহ ও তত্রত্য কালেজের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মথুরানাথ ইহাঁরা প্রত্যেকে পারসীক ভাষায় এ বিষয়ের এক একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ঐ দুই পুস্তকে বিবিধ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন ও আচরণাদি সংক্রান্ত বহুতর বৃত্তান্ত বিনিবেশিত হয়। আর নাভাজি ও নারায়ণ দাসের বিরচিত হিন্দী ভক্তমালে, প্রিয়দাস কর্তৃক ব্রজভাষায় লিখিত তদীয় টীকায়, বাঙ্গলা ভাষায় কৃষ্ণদাসের কৃত সেই টীকার সবিস্তার বিবরণে এবং ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ভাষার বিরচিত অপরাপর বহুতর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের প্রবর্ত্তক ও অন্য অন্য ভক্তগণ সম্বন্ধীয় অনেকানেক উপাখ্যান এবং নানা সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যাদি বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত আছে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীমান হ, হ, উইলসন ঐ দুই পারসীক পুস্তক এবং হিন্দী ও সংস্কৃতাদি ভাষায় রচিত ভক্তমাল প্রভৃতি অন্য অন্য সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ দর্শন করিয়া ইংরেজী ভাষার হিন্দু ধর্মাবলম্বী উপাসক সম্প্রদায় সমুদায়ের ইতিহাস বিষয়ের দুইটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এসিয়াটিক রিসর্চ নামক পুস্তকাবলীর ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে তাহা প্রথম প্রকাশিত হয়। আমি তাঁহার সেই দুই প্রবন্ধকেই অধিক অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় পশ্চাৎ-প্রস্তাবিত সম্প্রদায় সমূহের অনেকাংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছি। স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সংযোজন করা হইয়াছে একথা বলা বাহুল্য। তদ্ভিন্ন এই প্রথম ভাগে রামসনেহী, বিথল-ভক্ত, কর্ত্তাভজা, বাউল, ন্যাড়া,

সাঁই, দরবেশ, বলরামী প্রভৃতি আর ২২ বাইশটি সম্প্রদায়ের বিবরণ অন্যরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটির বৃত্তান্ত পুস্তকান্তর হইতে নীত, অবশিষ্ট ২০ কুড়িটির বিষয় নূতন সঙ্কলিত। ন্যূনধিক ২২ বাইশ বৎসর অতীত হইল, এই পুস্তকের অনেকাংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকটিত হয়।"...(পৃষ্ঠা : ১০৫-১০৬)।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জনগণনা থেকে জানা যায় ঐ সময়ে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তার সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৫,৫০৪। (vide E. A. Gait, Census of India, 1911, vol. I-Part I, Report, Calcutta, 1913, p. 123)

২. ক্ষিতিমোহন, ভারতীয় মধ্যযুগে, পৃষ্ঠা : ২৬

৩. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা : ২২২-২২৩

৪. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (সংগৃহীত ও সম্পাদিত) হারামণি লোকসঙ্গীত সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, আশীর্ব্বাদ, পৃষ্ঠা ॥৵—॥৶ ; লোক-সাহিত্য সংকলন (সাত খণ্ড), ঢাকা বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত ; মোহাম্মদ আবুতালিব, লালন শাহ ও লালন গীতিকা (১ম খণ্ড), ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৬৮ ; ২য় খণ্ড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ১৯৬৮ ; দৈনিক বাংলা, ঢাকা, বুধবার, ১ কার্তিক, ১৩৭৯, পৃষ্ঠা : ৫ ; রোববার ৫ কার্তিক, ১৩৭৯, পৃষ্ঠা : ১২ ; মঙ্গলবার, ৭ কার্তিক, ১৩৭৯, পৃষ্ঠা : ৬

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সঙ্কলিত ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হারামণি' গ্রন্থে 'আশীর্ব্বাদ' শিরোনামায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। দীর্ঘ-কাল ধরে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন অসংখ্য লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেন। তিনি বাউল মতবাদের তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেন। তাছাড়া মোহাম্মদ আবুতালিব রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থে লালন শাহর জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এক তথ্যবহুল আলোচনা পাওয়া যায়।

ঢাকা থেকে 'দৈনিক বাংলা' কাগজে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ত্রিশ বৎসর একটানা পরিশ্রম করে ছেউরিয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী হরিশংকরপুর গ্রামের অধিবাসী মকসুদ আলি সাঁই লালন ফকির সহ বিভিন্ন বাউল

সাধক ও মরমী কবি রচিত চার হাজার বাউল তথা মরমী গান সংগ্রহ করেছেন।

৫. ক্ষিতিমোহন, ভারতীয় মধ্যযুগে, পৃষ্ঠা : ১১৮-১১৯

৬. ঐ, পৃষ্ঠা : ৯৫-৯৭

৭. ঐ, পৃষ্ঠাঃ ১১৯-১২০ ; On Understanding the Universalism of Raja Rammohun Roy by Dr. J. N. Sarkar, in Indo-Iranica, Calcutta, June, 1972.

৮. ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতীয় মধ্যযুগে, ভূমিকা দ্রষ্টব্য। আগ্রা থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যারা বহু পুরুষ ধরে অর্ধ-হিন্দু অর্ধ-মুসলমান ভাবে জীবনযাপন করত তাদের বিষয়ে অনেক তথ্য ভারতবর্ষের সেন্সাস রিপোর্টে পাওয়া যায়। তখন তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার। (Vide Census of India, 1911, pp. 117-118.) সিন্ধু দেশের ভক্ত কবি শাহ আবদুল লতিফের (১৬৮৯-১৭৫২খ্রী)ভূমিকা আলোচনা করলেও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৪, পৃষ্ঠা : ৪৬৮-৪৭৩)।

৯. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা : ১৯১-১৯৪, ২০৪-২০৭ ; Ramesh Chandra Majumdar, On Rammohan Roy, Calcutta, 1972, pp. 47-49.

১০. Susobhan Chandra Sarkar (ed), Rammohun Roy On Indian Economy, Calcutta, 1965, pp. VII-XIV, Preliminary Remarks.

১১. Hem Chandra Sarkar (ed), Life and Letters of Raja Rammohun Roy, By Sophia Dobson Collet, Calcutta, 1913 ; D. K. Biswas and P. C. Ganguli (ed), The Life and Letters of Raja Rammohun Roy, Calcutta, 1962. সব তথ্যই এই দুটো গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১২. S. C. Sarkar (ed), On Indian Economy, pp. 84-89.

১৩. B. N. Ganguli, Rammohun Roy On India's Contemporary Economic Problems, in Economic and Social Development Essays in Honour of Dr. C. D. Deshmukh, Bombay, 1972, pp. 302-304.

১৪. Robert Lekachman, A History of Economic Ideas, New York, 1959, Chapters 4-7.

১৫. H. C. Sarkar (ed), Life and Letters, p. 149 ; S. C. Sarkar (ed) On Indian Economy, p. 22 ; সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন, চতুরঙ্গ, বৈশাখ, কার্তিক, ১৩৬৬

১৬. S. C. Sarkar (ed), On Indian Economy, pp. 80-83.

১৭. Ibid, pp. 67-68.

১৮. H. C. Sarkar (ed), Life and Letters ; D. K. Biswas and P. C. Ganguli (ed) Life and Letters ; B. B. Majumdar, History of Indian Social and Political Ideas, Calcutta, 1967, Chapter II.

সব তথ্যই এই সব গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১৯. S. C. Sarkar (ed.) On Indian Economy, pp. 13-14, 21-24.

২০. Ibid, p. 23

২১. Ibid, p. 70

২২. Ibid, pp. 70-71

২৩. Bhabatosh Datta, The Evolution of Economic Thinking in India, Calcutta, 1962, p. 4. এই পুস্তিকায় ভবতোষ দত্ত লেখেন : "It is striking that Ram Mohun Roy had a better understanding of the effects of the Permanent Settlement in 1831 than Romesh Dutt had nearly seventy years later" (vide Ibid.)

২৪. এখানে উল্লিখিত রমেশ চন্দ্র দত্ত রচিত গ্রন্থসমূহ ; Land Revenue Policy of the Indian Government, Calcutta, 1920, pp. 1-265. এই গ্রন্থে রমেশ চন্দ্র দত্ত লিখিত পত্র (১২মে, ১৯০০ খ্রী) ও ১৬ জানুয়ারী, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব সন্নিবিষ্ট রয়েছে।

২৫. Bhabatosh Datta, Evolution of Economic Thinking, p.5.

২৬. S. C. Sarkar (ed), On Indian Economy, pp. 74-79.

২৭. B. N. Ganguli, Rammohun Roy On India's Contemporary Economic Problems, p. 301

২৮. S. C. Sarkar (ed.), On Indian Economy, pp. 62-65

২৯. Ibid, pp. 63-64

৩০. Ibid, p. 66.

৩১. B. N. Ganguli, Rammohun Roy, p. 299.

৩২. Karl Marx, The British Rule in India, The Future Results of the British Rule in India, (Articles), vide Marx-Engels, On Britain, Moscow, 1953, pp. 377-392.

৩৩. যোগেশ চন্দ্র বাগল, রাধাকান্ত দেব, কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃষ্ঠা : ১২-১৩,৩৯

৩৪. R. Palme Dutt, India To Day, Bombay, 1947, p. 269 ; অমলেন্দু দে, মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা : ৪২-৫৫, পরিশিষ্ট—'খ'

৩৫. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, কলিকাতা, ১৩৬৩, পৃষ্ঠা : ৩১-৩২

৩৬. R. C. Majumdar, On Rammohan Roy, pp. 40-42.

৩৭. যোগেশ চন্দ্র বাগল, রাধাকান্ত দেব, পৃষ্ঠা : ৭-৪৭ ; Rev. J. Long, Adam's Reports on Vernacular education in Bengal and Bihar, submitted to Government in 1835, 1836 and 1838 ; with a brief view of its past and present condition, Calcutta, 1868, p. 22.

৩৮. The History of Native Female Education in Calcutta, Calcutta, 1856 (?), pp. 1, 6-7 ; 'Bengali Literature' by J. W., an article published in The Calcutta Christian Observer, 1855, vol. xvi, New Series, pp. 303-309,

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে The History of Native Female Education in Calcutta নামক দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকায় স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে রাধাকান্ত দেবের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয় : "It is worthy of remark that about this time, a learned Hindu Rajah had a pamphlet*(*The book in favour of female education was

written by a Pundit the employ of the Rev. W.H. Pearce, but under the patronage of Rajah Radha Kanta Deb, who, we believe paid the whole expense of the first edition.) published on the subject, the design of which was to prove that it was customary among the ancient Hindus to educate their Females. Thc production of such an essay under such auspicious in such times afforded the friends of Missions a fresh encouragement to preserve in their work of love. Many hailed this as one of the first faint streaks of light in the eastern sky, which after a long and dreary night indicated the dawn of approaching day". (pp.6-7).

প্রসঙ্গত : উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাধাকান্ত স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করায় কলকাতার হিন্দু সমাজের একটি অংশ যে মোটেই খুশি হয়নি তার পরিচয় তৎকালীন সাময়িক পত্রেও পাওয়া যায়। এই বিষয়ে সম্বাদ ভাস্করে যেভাবে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা এখানে উল্লেখ করা হল :

কলিকাতা নগরে বালিকাদিগের শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বিত্থালয়

"আমরা শ্রবন করিলাম শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর তাঁহার বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা করিয়াছেন, সংস্কৃত কালেজের একজন ছাত্র ভদ্র বালিকাগণকে ইংরেজি বাঙ্গালা উভয় ভাষায় তথায় শিক্ষাদান করিতেছেন।" (সম্বাদ ভাস্কর, ২৯শে মে, ১৮৪৯; ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৬)।

শ্রীযুক্তরাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের বাটীতে বালিকা শিক্ষার পাঠশালা

"আমরা গত ১৭ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবাসরীয় ভাস্করে আনন্দিত হইয়া এই পাঠশালার সমাচার লিখিয়াছিলাম, তদ্দৃষ্টে অন্যান্য সমাচার পত্রে বিশেষতঃ প্রভাকরে এই বিষয় প্রকাশ হয় ইহাতেই চন্দ্রিকা সম্পাদক লেখেন, নগর মধ্যে জনশ্রুতি এবং সম্বাদ পত্রাদিতেও প্রকাশ হইয়াছিল যে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর আপনারদিগের বাটীর ও অন্যান্য ভদ্র বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে শোভাবাজারের রাজ বাটীতে এক বিদ্যালয়

স্থাপন করিয়া সংস্কৃত কালেজের জনৈক ছাত্রদ্বারা ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতেছেন কিন্তু আমরা স্বয়ং রাজ বাটীতে গমন করিয়া দেখিয়াছি এবং রাজা বাহাদুরের স্বমুখে শুনিয়াছি যে রাজবাটীতে দ্বিতীয় স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, আমরা পূর্ব্বেই চন্দ্রিকাতে এবিষয় দেখিয়াছিলাম তথাচ অভিপ্রায় ছিল না প্রাচীন চন্দ্রিকার প্রতি কটাক্ষ করি, এবং চন্দ্রিকা লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের সাক্ষাতেও ইহাই ব্যক্ত করিয়াছি কিন্তু তৎপরে দৃষ্ট হইল জ্যৈষ্ঠ মাসের পঞ্চবিংশতি দিবসীয় প্রভাকর পত্রে ইহার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার প্রকৃত উত্তর করিতে হইলে চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়কে অবশ্য আমারদিগের মত আশ্রয় করিতে হইবেক, তথাপি চন্দ্রিকা সম্পাদকের অভিসন্ধি ছিল আমারদিগের মিথ্যা কথন সপ্রমাণ করেন অতএব আমরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম এক দিবস প্রাতঃকালে অনুগ্রহপূর্ব্বক এইদিগে আসিবেন আমরা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের বাটীতে যাইয়া পাঠশালায়, এক, দুই, তিন ইত্যাদি ক্রমে বালিকাদিগের সংখ্যা গণনা করিয়া দেখাইয়া দিব এবং এই পাঠশালা যে দিবস হইয়াছে তাহার নিশ্চিত প্রমাণ সেই স্থানেই পাইবেন, আমরা গবাক্ষে বসিয়া রাজবাটীর কথোপকথন শুনিতে পাই, চন্দ্রিকা সম্পাদক রাজবাটী হইতে দেড়ক্রোশ ব্যবধানে থাকেন ইহাতেই আমারদিগের কথা মিথ্যা করিতে চাহেন এ তাঁহার ভারি সাহসের কর্ম্ম, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর কি পূর্ব্বে তাঁহার বাটীতে পাঠশালা করিয়া বালিকাগণকে শিক্ষা প্রদান করে নাই, এবং তৎপরে কয়েক বৎসর হইল কোন বিশেষ কারণে কি তাঁহার বাটীর বালিকা পাঠশালা বন্ধ ছিল না, এই ক্ষণে রাজা বাহাদুর পুনর্ব্বার স্ত্রীশিক্ষার পাঠশালা করিয়াছেন, প্রতিবাসিগণের বালিকারাও রাজবাটীতে আসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে, এ সমাচার প্রচার করনে দোষ কি, বরং আহ্লাদের বিষয় তজ্জন্যই আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম, চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের লিখিত সত্যবিষয় কেন মিথ্যা মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন করিতে চাহেন, সত্য বিষয় কেহ গোপন রাখিতে পারেন না ।" (সম্বাদ ভাস্কর, ৯ই জুন, ১৮৪৯ ; ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৬) ।

সম্বাদ ভাস্করের তথ্য থেকে জানা যায় রাধাকান্ত এক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে অগ্রসর হন। এই বিষয়টি গবেষকদের দৃষ্টি ততটা আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয় না।

৩৯. যোগেশ চন্দ্র বাগল, রাধাকান্ত দেব, পৃষ্ঠা : ৭-৪৭
ইতিহাস পত্রিকায় (১৩৭৯, ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা) ডঃ ভবতোষ দত্ত 'রাজা রাধাকান্ত দেব' নামক প্রবন্ধে শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে রাধাকান্তের ভূমিকা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

৪০. যোগেশ চন্দ্র বাগল, রাধাকান্ত দেব, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮-৪০

৪১. ঐ, পৃষ্ঠা : ৪১-৪৬।

৪২. Letter from Sir George Clerke, Secretary to the India Board, to Rajah Radakant Bahadoor, President British Indian Association, Published in the Bengal Hurkaru, 9 June, 1857.

৪৩. Sri Sudhi Pradhan and Sri Sailesh Sen Gupta (Edited), Nil Durpan or The Indigo Planting Mirror, Written by Dinabandhu Mitra and Translated by Michael Madhusudan Dutt, Calcutta, 1959, pp. 198-200.

৪৪. ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮, ৩৫শ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, পৃষ্ঠা : ৮০৭-৮১১ ; Sudhi Pradhan, op. cit., p. 200 ; The Hindoo Patriot, 29 August, 1861 ; যোগেশ চন্দ্র বাগল, রাধাকান্ত দেব, পৃষ্ঠা : ৪১-৪৬। হেমেন্দ্রকুমার রায় 'ভারতী' নামক মাসিক পত্রে 'বঙ্কিম-যুগের কথা' নামক প্রবন্ধে লেখেন, বিচারপতি স্যার মর্ডাণ্ট ওয়েলস 'নীলদর্পন' নাটক ইংরেজিতে অনুদিত হয়ে প্রকাশের পরে জেমস লং-এর সঙ্গে মামলা চলাকালীন "লং সাহেব ও রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির প্রতি অনেক প্রলাপ প্রয়োগ" করেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় একথাও লেখেন, "লং সাহেবের উপস্থিত বিপদে, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকটে সহমর্মিতাস্নিগ্ধ পত্র প্রেরণ করিলেন।" ('ভারতী', অগ্রহায়ণ, ১৩১৮, পৃষ্ঠা : ৮০৯)।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে অনুষ্ঠিত জনসভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন ও ভাষণ দেন : রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ, রাজা কালিকৃষ্ণ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর। (তখনও তিনি মহারাজা হননি) ও রমানাথ ঠাকুর। (ঐ, পৃষ্ঠা : ৮০৯-৮১০)।
এই সভার দুদিন পরে লং সাহেব কারাগার হতে মুক্ত হন। (ঐ, পৃষ্ঠা : ৮১০)।

৩৫. যোগেশ চন্দ্র বাগল, রাধাকান্ত দেব, পৃষ্ঠা : ৫১ ; Amit Sen, Notes on the Bengal Renaissance, Calcutta, 1957, pp, 16-18 ; Nemai Sadhan Bose, The Indian Awakening and Bengal, Calcutta, 1969, Chapter IV ; David Kopf, British Orientalism and the Bengal Renaissance, Calcutta, 1969, pp. 195-196 ; Arabinda Poddar, Renaissance in Bengal Quests and Confrontations, Simla, 1970, pp. 75-83.

৩৬. যোগেশ চন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা ১৮০০-১৮৫৬, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কার্তিক, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা : ১-১৬ ; Amit Sen, Notes on the Bengal Renaissance, pp. 14-15 ;
হিন্দু কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন, এই বিষয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার নতুন তথ্য পরিবেশন করেন (দ্র On Rammohan Roy) ; Radharaman Mitra, David Hare, His Life and Work, Calcutta, 1968, pp. 1-15 ; Rammohun Roy and English Education in India : A Revaluation by Dr. N. S. Bose, in Indo-Iranica, Calcutta, June 1972.
শিক্ষাক্ষেত্রে রাধাকান্ত ও ডেভিড হেয়ারের ভূমিকার এক সংক্ষিপ্ত তথ্যবহুল আলোচনা যোগেশ চন্দ্র বাগল লিখিত পুস্তিকায় পাওয়া যায়।

৩৭. William Adam, Reports on the State of Education in Bengal (1835 & 1838), Edited by Anathnath Basu, University of Calcutta, 1941, p. 476 ; R. Mitra, David Hare.

৪৮. মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর, কলিকাতা, ১৯৬৩ ; প্যারীচাঁদ মিত্র, ডেভিড হেয়ার, কলিকাতা, ১৯৬৪ (সাধারণ সম্পাদক : কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত) ; R. Mitra, David Hare. হেয়ার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য এইসব গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

৪৯. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯০৯, পৃষ্ঠা : ৩৮, ৬৭-৭০

৫০. যোগেশ চন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, পৃষ্ঠা : ৩২ ; মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার নব জাগরণের, পৃ : ৫-৭ ; R. Mitra, David Hare, p. 14.

৫১. R. Mitra, David Hare, p. 29.

৫২. Jogesh Chandra Bagal, Beginnings of Modern Education in Bengal : Women's Education, Calcutta, 1943, pp. 57-58. উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁদের বিষয়ে ও স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে অনেক তথ্য এই গ্রন্থে রয়েছে।

৫৩. R. Mitra, David Hare, p. 25.

৫৪. অক্ষয় কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা, পৃষ্ঠা : ১-৮ (Discourse Read at the Third Hare Anniversary Meeting by Baboo Ukhoy Coomar Duttu, Calcutta, 1845).

এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকায় অক্ষয় কুমার দত্ত ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

৫৫. ঐ

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর' নামক গ্রন্থে লেখেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে "হেয়ার, রঙ্গভূমির পশ্চাতে থাকিয়া বিবিধ উপায়ে সহায়তা করিতেছিলেন। এমন কি তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ও উদ্যম না থাকিলে, বর্ত্তমান শিক্ষার স্রোতঃ বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত।' (ঐ, পৃষ্ঠা : ৬৭)।

৫৬. 'Practical Education' by Babu Iswar Chandra Mitra, in The Bengal Magazine, August, 1872, pp. 27-29.

৫৭. 'Recollections of My School Days, by an Old Bengali Boy, in The Bengal Magazine, May, 1873, pp. 438-440.

৫৮. রাজনারায়ণ বসু, হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত, দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, পৌষ, ১৩৬৩, পৃষ্ঠা : ৪

৫৯. ঐ

রেভাঃ লঙ হাইড ঈষ্টকে হিন্দু কলেজের একজন প্রতিষ্টাতারূপে উল্লেখ করেন (দ্র Adam, Reports, p. 478)। অর্থাৎ হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কোন এক বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন না, একাধিক ব্যক্তিকে এর প্রতিষ্ঠাতারূপে গণ্য করা যায়।

৬০. The Bengal Obituary, OR A Record To Perpetuate the Memory of Departed Worth, Being A Compilation of Tablets and Monumental Inscriptions From Various Parts of the Bengal and Agra Presidencies. To which is added Biographical Sketches and Memoirs of such as have pre-eminently distinguished themselves in the History of British India, Since the formation of the European Settlement to the present time, By Holmes And Co. 39, Cossitollah, Calcutta. Calcutta: Printed by J. Thomas, Baptist Mission Press; and sold by Messrs. Thacker And Co.; Messrs. R. C. Lepage And Co., And By the Compilers, 1848, p. 261.

ডেভিড হেয়ার স্মরণে বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজ তাঁর স্মৃতিস্তম্ভের বা মর্মর-মূর্তির গায়ে যে ভাষায় শ্রদ্ধাঞ্জলি লিপিবদ্ধ করেন তা এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হল :—

(1) The following Inscription is taken from the Monument over his remains :—

This Tomb (erected by his native friends and pupils) encloses the mortal remains of David Hare. He was a Native of Scotland, and came to this city in the year

1800, and died 1st. June 1842, aged 67 years. After acquiring a competence by probity and industry in his calling as a watchmaker, he adopted for his own the country of his sojourn, and cheerfully devoted the remainder of his life with unwearing zeal and benevolence —to one pervading and darling object, one for which he spared not personal trouble, money or influence, viz. the education and moral improvement of the Natives of Bengal, thousands of whom regarded him in life with filial love and reverence, and lament him in death as their best and most disinterested friend, who was to them even as a Father.

(2) The following is the Inscription on the Statue of the late David Hare, in the quadrangle of the Hindoo College, and over which an elegant dome has lately been erected :—

In honour of David Hare, who by steady industry, having acquired an ample competence, cheerfully relinquished the prospect of returning to enjoy it in his native land in order to promote the welfare of that of his adoption. To the close of his irreproachable and useful life, he made the improvement, intellectual and moral, as well as the condition, in sickness no less than in health, of thc Native Youth of Bengal, the object of his constant care and unwearying solicitude, and they, in token of gratitude and veneration for the memory of their constant, generous and most disinterested benefactor, have erected this statue.

(3) In one of the Branch Schools of the Hindoo

College is the following to the memory of the late Mr. David Hare :—

This tablet, erected by the teachers and students of this school, is sacred to the Memory of David Hare, who subduing the natural desire to return to the land of his birth, devoted his fortune, his energies and his life to the best interests of India, his adopted country, where he will ever be affectionately remembered as the father of native education.

Born in England 1775, died in Calcutta, June 1st, 1842.

Ah warm philantropist ! Ah faithful friend !
Thy life devoted to one generous end,
To bless the Hindoo mind with British lore,
And truth's and nature's faded lights restore.
If for a day that lofty aim was crost,
You grieved like Titus that a day was lost,
Alas ! it is not now a few—brief hours,
That fate withholds, a heavier grief o'erpowers,
A nation whom you loved as if your own,
A life that gave the life of life is gone !

Anno Domini, 1847.

(Quoted from the Bengal Obituary, op. cit., p. 261)

(২) বাঙালী মুসলিম সমাজে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনঃ

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা প্রায় সবাই হিন্দুসমাজের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য বিষয় সীমাবদ্ধ রাখেন। তারমধ্যে আবার কলকাতার হিন্দু বা ব্রাহ্ম নেতাদের ওপরই তাঁদের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকে। প্রসঙ্গতঃ তাঁরা খ্রীষ্টান মিশনারীদের ভূমিকাও উল্লেখ করেন। এখনও এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর জনসমষ্টির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি ততটা প্রসারিত হয়নি। কিন্তু বাংলা দেশে তো কেবলমাত্র শিক্ষিত হিন্দুরাই বাসিন্দা নন। এখানে জনসমষ্টির এক বড় অংশ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনায় তাঁদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত দুএকখানি গবেষণামূলক গ্রন্থে মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক তথ্যের সাহায্য ছাড়াই এমন সব মন্তব্য করা হয়, তা যে কোন সচেতন পাঠককেই আহত করবে। দুএকজন গবেষক এমন কথাও বলেন, বাংলাদেশে ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে ওয়াহাবি আন্দোলনের বিশেষ কোন অবদান নেই। দীর্ঘকালব্যাপী যে ফরাজী ও ওয়াহাবি আন্দোলন বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চলে, যার প্রভাব মুসলিম সমাজে ধর্মের ক্ষেত্রে ও ক্রমান্বয়ে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পড়ে, তাকে অগ্রাহ্য করা কতটা সঙ্গত, তা তাঁরা ভেবে দেখেন না। হিন্দু সমাজের ধর্ম-সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলিম সমাজেও যে ধর্ম-সমাজ সংস্কারের আন্দোলন ছিল, সে কথা তাঁরা ভুলে যান। তাঁদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয় না: মুসলিম সমাজের ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কি? গ্রাম বাংলায় এর প্রভাব কতটুকু পড়ে? একেশ্বরবাদ ও ইসলামের বিশুদ্ধতা প্রচারের বিষয়টি হিন্দু ও ব্রাহ্ম

ধর্ম-সমাজ সংস্কারকদের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে? তাঁরা একথাও ভেবে দেখেন না, হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহ অনাদৃত ছিল, আর ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে এই মনোভাব অনেকটা দূরীভূত হয়। তাই বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আলোচনায় গ্রামবাংলায় মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিষয় উল্লেখ করলে বাঙালী মানসের ছবি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই বিষয়ের প্রতি কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

তেমনি বিংশ শতাব্দীর সুরুতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বৃহৎসংখ্যক বাঙালী মুসলমানেরা কেন দূরত্ব বজায় রাখেন এবং এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেননি, তার যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে গ্রাম বাংলায় মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কিন্তু এই দিক থেকে বিষয়টি এখনও বিশেষ আলোচিত হয়নি।

ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলনের সময়কাল মনে রাখলে মুসলিম মননের গতি-প্রকৃতি বোঝা অনেকটা সহজ হবে। এইসব আন্দোলনের যেসব স্তরের কথা সামনে রেখে এখানে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে তা প্রথমেই উল্লেখ করা হল:

(ক) ফরাজী আন্দোলনের সময়কাল: (১) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ। (২) ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ— এই সময়ে ধর্মীয় গ্রুপরূপে ফরাজীদের অস্তিত্ব ফরিদপুর জেলায় ছিল।

(খ) তারিকা-ই-মহম্মদীয়া বা ভারতবর্ষের ওয়াহাবি আন্দোলনের সময়কাল:—(১) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ—এই সময়ে ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবর্তক সৈয়দ আহমদের ভূমিকা এবং ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে তিতুমীরের ভূমিকা লক্ষণীয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ কর্তৃক শিখরাজ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। (২) ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ—ইংরেজ কর্তৃক পাঞ্জাবে প্রাধান্য স্থাপন পর্যন্ত ওয়াহাবিদের শিখ বিরোধী ভূমিকা ছিল। (৩) ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ—এই সময়ে ওয়াহাবি আন্দোলন পুরোপুরি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াহাবি আন্দোলন দমিত হয়।

(গ) বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ :—(১) ফরাজী আন্দোলন, (২) পাটনা স্কুল, (৩) তাঐউনি আন্দোলন, (৪) আহল-ই-হাদিস। ধর্মীয় আচরণ-বিধি নিয়ে এই চারটি গ্রুপের মধ্যে মতান্তর ও বিতর্ক দীর্ঘকাল চলে।

(ক) **ফরাজী আন্দোলন :**—উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তাতে ফরাজী আন্দোলনকে প্রথম যুগের একটি বিখ্যাত ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন বলা চলে। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন পূর্ববঙ্গের মাদারীপুর মহকুমার সামাইল গ্রামনিবাসী হাজী শরীয়ত উল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০ খ্রী)। এক অখ্যাত ও অসচ্ছল তালুকদার বংশে তাঁর জন্ম হয়। শরীয়ত উল্লাহর বয়স যখন অল্প তখন তাঁর পিতা ও মাতা মারা যান এবং তিনি তাঁর চাচার বাড়িতে পালিত হন। কিন্তু সেখানে তিনি শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি। বারো বৎসর বয়সে শরীয়ত উল্লাহ কলকাতা পালিয়ে আসেন এবং কলকাতার বিখ্যাত কোরাণ শিক্ষক মওলানা বাসারত আলির কোরান ক্লাশে যোগদান করেন। কোরাণ পাঠ সমাপ্ত করার পরে তাঁর শিক্ষকের উপদেশ অনুযায়ী শরীয়ত উল্লাহ আরবি ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য হুগলি জেলার ফুরফুরাতে যান। সেখানে তিনি দু বছর অধ্যয়ন করে এই দুটো ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তারপরে মওলানা বাসারত আলির সঙ্গে দেখা করেন। মওলানা বাসারত আলি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি খুবই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন এবং পবিত্র নগরী মক্কাতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শরীয়ত উল্লাহও তাঁর

সঙ্গী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা দুজনে মক্কা চলে যান। মক্কাতে মওলানা মুরাদ নামে একজন বাঙালী বাস করতেন। প্রথম দুবছর শরীয়ত উল্লাহ তাঁর বাড়ীতেই থাকেন এবং তাঁর নিকট আরবি সাহিত্য ও ঐশ্লামিক আইন পাঠ করেন। তার ফলে শরীয়ত উল্লাহ মক্কার ধর্মীয় সেমিনারীতে নিয়মিত অধ্যয়নের সুযোগ পান। শরীয়ত উল্লাহ চৌদ্দ বৎসর বিখ্যাত হানাফি আইনজ্ঞ তাহির সোম্বাল-এর নিকট সুফীবাদ সহ ধর্মের প্রতিটি শাখা অধ্যয়ন করেন। শরীয়ত উল্লাহ সুফীবাদের কাদারিয়া গ্রুপের সমর্থক হন। মক্কাতে পড়াশুনা পরিসমাপ্ত করে শরীয়ত উল্লাহ কায়রোতে আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি সেখানে দুবছর থাকেন। প্রায় কুড়ি বৎসর বিদেশে থেকে ঐশ্লামিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে বিদ্যাচর্চা করে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শরীয়ত উল্লাহ বাংলাদেশে ফিরে আসেন।[১]

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দেই ফরাজী নামক ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলন মাদারীপুর মহকুমায় সংগঠিতভাবে প্রকাশিত হয়। আরবি শব্দ 'ফরাইজ' থেকেই 'ফরাইজী' শব্দের উদ্ভব, আবার 'ফরাইজী' থেকেই 'ফরাজী' শব্দের প্রচলন হয়। 'ফরাইজী' শব্দের অর্থ হল ইসলাম নির্দিষ্ট 'বাধ্যতামূলক কর্তব্য'।[২] ধর্মীয় কর্তব্য পালনে আল্লাহ ও পয়গম্বর যে আদেশ দেন, তা পালন করা ফরাজীদের একান্ত কর্তব্য। ইসলামের প্রধান পাঁচটি স্তম্ভ, যথা—কলমা, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ—পালন করার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনেক অ-ইসলামীয় বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় বাংলাদেশের মুসলমানেরা ইসলামের পাঁচটি অবশ্য করণীয় মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হন। শরীয়ত উল্লাহ তাঁদের নিকটে এই মূলনীতিসমূহ পালনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। সুতরাং বাঙালী মুসলিম সমাজের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনেই ফরাজী আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। ফরাজী মতবাদ অনুযায়ী 'তঐহীদ' বা একেশ্বরবাদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত

থাকার জন্যও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফরাজীদের মতে, কেবল-মাত্র একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করলেই চলবে না, এই বিশ্বাসকে কার্যে রূপায়িত করতে হবে। অনেকেশ্বরবাদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য আছে এমন কোন চিন্তা বা কর্ম থেকে বিরত থাকতে মুসলমানদের আহ্বান জানানো হয়। তাছাড়া যেসব আচার-অনুষ্ঠান কোরাণের ও পয়-গম্বরের নির্দেশ বহির্ভূত তাও পরিহার করা কর্তব্য। জাঁকজমক পরিহার করে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে কোরাণ নির্দিষ্ট একেশ্বর-বাদ প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ফরাজী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।[৩] তাহির সোম্বাল ছিলেন শরীয়ত উল্লাহর শিক্ষক ও আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শক। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই শরীয়ত উল্লাহ বাংলাদেশে রিভাইভ্যালিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।[৪]

শরীয়ত উল্লাহর মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে কৃষক, তাঁতী, কলু প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তিনি হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার থেকে মুসলিম কৃষকদের রক্ষা করতে তৎপর হন। কালীপূজা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনে হিন্দু জমিদারেরা মুসলিম কৃষকদের নিকট হতে কর আদায় করতেন। যেহেতু এইসব কর পৌত্তলিকতার সহায়ক ছিল সেজন্য শরীয়ত উল্লাহ মুসলিম কৃষকদের এই কর দিতে নিষেধ করেন। তাছাড়া তিনি হিন্দু জমিদারদের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গরু কোরবানি করতেও উৎসাহিত করেন। তার ফলে একদিকে যেমন হিন্দু জমিদারদের আর্থিক ক্ষতি হয়, তেমনি অন্যদিকে তাঁদের ধর্মীয় মনোভাবও আহত হয়। স্বভাবতই ফরাজীদের সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের সংঘর্ষ হয়। এইভাবে শরীয়ত উল্লাহ পরিচালিত ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়। অবশ্য তখনও ফরাজী আন্দোলন মূলতঃ ধর্মসংস্কার আন্দো-লনই ছিল। প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত উল্লাহ ছিলেন ধর্মসংস্কারক। কয়েকটি ক্ষেত্রে জমিদারদের সঙ্গে ফরাজীদের বিরোধ হলেও শরীয়ত

উল্লাহ যথেষ্ট সতর্কতার ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এই আন্দোলন পরিচালনা করেন যাতে ধর্মসংস্কারকরূপে তাঁর ভূমিকা ক্ষুণ্ণ না হয়।[৫]

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে সামাইল গ্রামে শরীয়ত উল্লাহর মৃত্যুর পরে তাঁর একমাত্র পুত্র মহসীন আলদীন আহমদ বা দুদু মিঞা (১৮১৯-১৮৬২ খ্রী) ফরাজী আন্দোলনের নেতা হন। দুদু মিঞা মাদারীপুর মহকুমার মুলফতগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে পিতার তত্ত্বাবধানে লালিত হন। শরীয়ত উল্লাহ বাড়িতে পুত্রের জন্য আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। দুদু মিঞার বয়স যখন মাত্র বারো বৎসর তখন তিনি পুত্রকে মক্কাতে শিক্ষালাভের জন্য পাঠান। মক্কা যাবার পথে দুদু মিঞা কয়েকদিন কলকাতায় ছিলেন। তখন দুদু মিঞা তিতুমীরের গ্রামে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তিতুমীর তাঁকে একগাছা দড়িতে গাঁথা মালা উপহার দেন। দীর্ঘকাল দুদু মিঞার স্থায়ী বাসস্থান বাহাদুরপুর গ্রামে এই উপহার সযত্নে রক্ষিত ছিল। পাঁচ বৎসর মক্কাতে থেকে দুদু মিঞা দেশে ফিরে আসেন। তখন শরীয়ত উল্লাহ নিজে পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা দেন।[৬]

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই দুদু মিঞা সক্রিয়ভাবে ফরাজী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে নেতৃত্বপদে আসীন হবার পরে প্রধানতঃ দুটো উদ্দেশ্য সামনে রেখে দুদু মিঞা ফরাজীদের সংগঠিত করেন: (ক) জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষা করা। (খ) ফরাজীদের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ বিলোপ করে সামাজিক জীবনে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। দুদু মিঞা বিশ্বের সকল মানুষের সমান অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, সকল মানুষই পরস্পরের ভ্রাতা। এক ভ্রাতা যখন বিপন্ন হন তখন প্রতিবেশীর কর্তব্য হল তাকে সাহায্য করা। কোরাণের বিখ্যাত সুরা উদ্ধৃত করে দুদু মিঞা বলেন: "স্বর্গে ও মর্তে যা কিছু রয়েছে তার মালিক হলেন ঈশ্বর। যেহেতু ঈশ্বর জমি দান

করেছেন এবং মানুষ হল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি, সেজন্য এই স্বর্গীয় দান ব্যবহার করবার অধিকার সকলের রয়েছে। সুতরাং যারা চাষ করে, জমি তাদেরই। তাই জমিদার কর্তৃক কৃষক শোষণ ভয়ানক অপরাধ। আর যেহেতু ঈশ্বর জমির ওপর সকলের সমান অধিকার দান করেছেন, সেজন্য জমি থেকে খাজনা আদায় করা তাঁর আইনের পরিপন্থী। ভবিষ্যতে এমন এক সুখের দিন আসবে যখন জমি থেকে খাজনা আদায় চিরতরে রহিত হবে।" জমি-জমা ও খাজনা সম্পর্কে এই মতবাদের ফলেই ফরাজীরা বড় বড় নদীর চরে সরকারী জমি অথবা খাসমহলের জমি দখল করে।[৭] ফরাজী মতবাদে বলা হয়, প্রতিটি ফরাজীকে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আড়ম্বর পরিহার করতে হবে এবং কোরাণের নির্দেশ অনুসরণ করে সমস্ত রকমের পৌত্তলিকতা ও ব্যক্তিপূজা পরিহার করতে হবে। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু ও অন্যান্য উপলক্ষে মুসলিম সমাজে যে সব অনুষ্ঠান করা হত এবং অর্থব্যয় করা হত, তা পাপকার্য মনে করে ফরাজীরা বন্ধ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। অবশ্য সত্যনিষ্ঠ হওয়া একান্ত প্রয়োজন হলেও ফরাজীদের স্বার্থে তা শিথিল করার ব্যবস্থাও ছিল। ফরাজীদের ধর্মীয় গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিচারকের নিকট শপথ নেওয়া আইনসিদ্ধ ছিল না। আর যদি কখনও এই ধরণের বিচারকের সম্মুখীন হতে হত তাহলে কোন ফরাজী ভ্রাতাকে সাহায্য করার জন্য মিথ্যা কথা বলা অন্যায় ছিল না। যদিও নিজস্ব ধর্মীয় গ্রুপের বিচারকের নিকটে তাদের সত্যকথা বলা বাধ্যতামূলক ছিল। কারণ, তার ফলে সেই বিচারকের পক্ষে ঈশ্বরের দৃষ্টির সামনে ন্যায় বিচার করা সম্ভব হত। মোট কথা, ফরাজীদের স্বার্থে মিথ্যা কথা বলা অপরাধ নয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে ঢাকা থেকে লোয়ার প্রোভিন্সেস-এর সুপারিনটেনডেণ্ট অব পুলিশ ডব্লিউ. ডেমপিয়ার একটি রিপোর্টে ফরাজী মতবাদ সম্পর্কে লেখেন : "The Ostensible doctrines of the Ferazees are good, they inculcate a rigid ad-

herence to the truth, an abstinence from all ceremonies approaching to idolatory or man worship etca and a strict conformity with the Koran. Their esoteric doctrines are, however, that an Oath before a Judge, not of their sect or religion, is not legal, and that before such a tribunal it is right to deviate from the truth to favor or aid a Brother. Before a Judge of their own sect they must speak the truth to enable him to do justice in the sight of God ; they also hold though not openly, that as God made the earth common to all men, the payment of rent is contrary to his Law and they frequently resist all demands on this account especially from Hindoo Zemindars, and it is this doctrine which will I think cause a collision. I believe that they draw a distinction between the tribute to God and the rent for land as they seek the occupancy of the Government Churs in the large Rivers. They consider it justifiable to compel other Mahomedans to become of their sect by violence or constant acts of annoyance."[৮]

দুদু মিঞার আমলে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক কর্মসূচী সংযুক্ত হওয়ায় ফরাজী আন্দোলন ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের এক মিশ্রিত রূপ ধারন করে। দুদু মিঞা ফরাজী সমাজের জন্য একটি সুশৃঙ্খল শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গঠন করেন। এই কাঠামো 'ফরাজী খিলাফত ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। উপরে উল্লিখিত প্রথম উদ্দেশ্য সফল করার জন্য দুদু মিঞা সেনাবাহিনী (লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালা প্রভৃতি) গঠন করেন। দ্বিতীয়

উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ফরাজী নেতৃত্বাধীন পঞ্চায়েত গঠন করেন। প্রথমটিকে রাজনৈতিক শাখা ও দ্বিতীয়টিকে ধর্মীয় শাখা বলা হয়। এই তুটো শাখাকেই খিলাফত ব্যবস্থার মধ্যে এক সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হয়। আর এই শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে তুহু মিঞার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। 'ফরাজী খিলাফত ব্যবস্থার' সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে বলা হয় 'ওস্তাদ'। তুহু মিঞা ছিলেন 'ওস্তাদ'। ওস্তাদ ফরিদপুর জেলার বাহাতুরপুর গ্রামে বাস করেন। ওস্তাদকে পরামর্শ দেবার জন্য কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনীত করা হয়। তাঁদের বলা হয় 'উপরস্থ খলিফা'। তাঁদের নীচে ছিলেন 'সুপারিনটেনডেণ্ট খলিফা'। সকলের নিম্নে ছিলেন 'গাঁও খলিফা' অথবা 'ওয়ার্ড খলিফা' (শহরের ওয়ার্ডে ফরাজী এজেণ্ট)। পূর্ববঙ্গের ফরাজী অঞ্চলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'গ্রাম ইউনিটে' বিভক্ত করা হয়। প্রতি 'গ্রাম ইউনিটে' ৩০০ থেকে ৫০০ ফরাজী পরিবার ছিল। প্রতি ইউনিটের প্রভাবশালী সদস্য সেই ইউনিটের 'খলিফা' (গাঁও খলিফা) মনোনীত হন। এই গাঁও খলিফাই ছিলেন সেই ইউনিটের পরিচালক। দশ বা ততোধিক গ্রাম ইউনিট নিয়ে একটি সার্কেল গঠন করা হত। আর এই সার্কেলের পরিচালক ছিলেন 'সুপারিনটেনডেণ্ট খলিফা'। ইউনিট খলিফারা তাঁর অধীনে ছিলেন। সুপারিনটেনডেণ্ট খলিফার একজন পেয়াদা ও একজন পিয়ন ছিল। তাদের মারফত নিম্ন ইউনিট ও ওস্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হত। এইভাবে বিভিন্ন নির্দেশ পাঠানো হত।[৯]

ইউনিট খলিফাকে ফরাজী সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য নানা ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হত, যথা—ঐশ্লামিক আচরণবিধি শেখানো, সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক নীতিবোধ গড়ে তোলা, প্রবীণদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পারিবারিক বা অন্যান্য ঝগড়া-বিবাদ, জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করা ও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মক্তব পরিচালনা করা। ইউনিটের অধীনে

ফরাজীদের জমি থেকে যে ফসল হত তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তাঁকে এই সব কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হত। মূলতঃ ইউনিট খলিফার কাজ ছিল ধর্মীয়। অবশ্য তাঁকে সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনা সংগ্রহ করে সুপারিনটেনডেণ্ট খলিফাকে পাঠাতে হত।[১০]

সার্কেলের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা সুপারিনটেনডেণ্ট খলিফার দায়-দায়িত্ব অনেক ছিলঃ ইউনিট খলিফাদের পরিচালনা করা, ইউনিট খলিফার সিদ্ধান্তের ও কাজের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট নালিশ করলে আপীল আদালতরূপে সুবিচার করা, ফরাজীদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতির ব্যবস্থা করা, রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা, বছরে অন্তত একবার সার্কেলের প্রতিটি অঞ্চল ঘুরে ফরাজীরা যাতে নিয়মিত ধর্ম-বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী গঠন করা ও তাদের ট্রেনিং দেওয়া।[১১]

অবশ্য সব বিষয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী ছিলেন ওস্তাদ। কোন বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে ওস্তাদ উপরস্থ খলিফাদের পরামর্শ নিতেন। ওস্তাদের বা সুপারিনটেনডেণ্ট খলিফার অনুমতি না নিয়ে ইংরেজের আদালতে কোন মামলা-মোকদ্দমা করার অধিকার ফরাজীদের ছিল না। কোন ফরাজীর সাথে মুসলিম বা অ-মুসলিম অ-ফরাজীর বিরোধ হলে তা মীমাংসার জন্য 'ফরাজী কোর্টে' আসার জন্য উৎসাহিত করা হত। যদি কেউ এই ধরণের বিরোধ বিচারের জন্য ইংরেজের আদালতে নিয়ে যেত তাহলে সেই আদালতের রায় যাতে কার্যকরী না হয় তার জন্য ফরাজী খলিফারা ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। আর এই রায় যদি ফরাজীর স্বার্থ-বিরোধী হত তাহলে তা কার্যকরী করা কখনই সম্ভব হত না। দুদু মিঞা নিজেও অনেক বিরোধ মীমাংসা করেন। যদি কোন হিন্দু, মুসলিম বা খ্রীষ্টান ঋণ উদ্ধারের জন্য তাঁর নিকট আবেদন না

করে মুন্সেফ কোর্টে নালিশ করতেন তাহলে দুদু মিঞা তাঁদের শাস্তি দিতেন। ফরাজী পঞ্চায়েতের এতটা প্রভাব ছিল যে ফরাজী গ্রাম থেকে খুব অল্প সংখ্যক মামলা ইংরেজের আদালতে যেত।[১২]

যেখানে ফরাজীরা ছিল সেখানে দুদু মিঞার এজেণ্টরাও ছিল, যথা—খলিফা, মুনসি ও সর্দার। ফরাজী মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ও সংগঠনের স্বার্থে তাদের সাহায্যে একটি 'সাধারণ কর' আদায় করা হত। আয়ারল্যাণ্ডের 'ওকোনেল রেণ্ট' নামে পরিচিত ব্যবস্থার সঙ্গে ফরাজীদের কর আদায়ের ব্যবস্থার অনেকটা মিল ছিল। এই বিষয়ে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ মার্চ ঢাকা ডিভিসনের রেভিনিউ কমিশনার আই. ডানবার লেখেন : In every place where the Ferazees are to be found, Doodoo Meeah has an agent, known under the designation of Khalifa, Moonshee, or Sirdar, whose duty it is to keep the flock together, and make more proselytes, and through whom is collected a general tax for the furtherance of the purposes of the association, very much resembling that levied in Ireland, and known as O'Connell's rent."[১৩]

যেভাবে ফরাজী মতবাদ রূপায়িত করার চেষ্টা হয় তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ফরাজীরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে। হিন্দুদের ও সাবেকী মুসলমানদের ধারণা হয় যে, ফরাজীরা ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করে মুসলিম শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল তাই। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেমপিয়ার লেখেন : "All the Magistrates agree in the mischievous tendency of this sect and their aversion to our Government. Their combination, obedience to their leaders and their fanaticism render them dangerous and they must be carefully and quietly

watched."[১৪] ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ডানবার লেখেন : "There is a very general impression, however, among the Hindoo population, as well as with the Mahomedans of the old creed, that their ultimate object is the expulsion of the present rulers of the land, and the restoration of the Mahomedan power. That the possibility of such a consummation at some remote period, has presented itself to the better informed amongst them, and that it has even been held out to the multitude of their followers, as an idea to be cherished in their hearts, is not unlikely ; but I am not disposed to think, that there has ever yet been any real intention of trying conclusions with the powers that be."[১৫]

ফরাজী মতবাদ নিম্নশ্রেণীর মুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রসারিত হবার ফলে জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা হয়। জমিদার ও নীলকরদের পক্ষে অবাধে কৃষকদের নিপীড়ন করা কষ্টকর হয়, তেমনি ফরাজী প্রভাবিত অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসকদের কর্তৃত্ব অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে। স্বভাবতই তাদের সঙ্গে ফরাজীদের বিরোধ অনিবার্য হয়।[১৬] জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত হলেও কার্যতঃ এই আন্দোলন হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়। প্রথমে দুএকজন মুসলিম জমিদার ফরাজীদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়লেও পরে তাঁরা ফরাজীদের দাবি মেনে নেওয়ায় তাঁদের সঙ্গে ফরাজীদের আর বিশেষ কোন বিরোধ হয়নি। কিন্তু হিন্দু জমিদারের সঙ্গে বিরোধ দীর্ঘকাল চলে।[১৭]

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পরে দুদু মিঞা ফরাজী কৃষকদের ওপর জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করতে

উদ্যোগী হন। ফরিদপুর জেলার সিকদার ও ঘোষ পরিবার নামে দুটো জমিদার পরিবার ফরাজীদের প্রভাব দমনে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা গো-বধ বন্ধ করার (ফরাজীরা প্রকাশ্যে গো-বধ করতেন) এবং কালীপূজা-দুর্গাপূজায় কর আদায়ের চেষ্টা করেন। এমনকি ফরাজীদের দাড়ির ওপরও কর বসানো হয়। তাঁদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের ফরাজী আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধ করা হয়। কেউ জমিদারের হুকুম অমান্য করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।[১৮] দুদু মিঞা ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কানাইপুরের জমিদার সিকদারদের ও ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুরের জমিদার ঘোষেদের বিরুদ্ধে দুটো অভিযান সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেন। কানাইপুরের জমিদার খুবই ভীত হয়ে পড়েন। তিনি দুদু মিঞার দাবি মেনে নেন। ফরাজী কৃষকদের ওপর অত্যাচার ও তাদের নিকট হতে অন্যায়ভাবে ধর্মকর আদায় বন্ধ হয়। প্রায় ৮০০ ফরাজী জয়নারায়ণ ঘোষের বাড়ি আক্রমণ করে এবং তাঁর ভাই মদন নারায়ণ ঘোষকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সম্ভবতঃ পরে তাঁকে হত্যা করে পদ্মার জলে ফেলে দেওয়া হয়।[১৯] এই ঘটনায় দুদু মিঞা ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ১১৭ জন ফরাজীকে বন্দী করা হয় এবং বিচারে ২২ জনের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সাক্ষীর অভাবে দুদু মিঞাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জমিদারদের বিরুদ্ধে এই দুটো অভিযান সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করায় দুদু মিঞার সম্মান ও প্রতিপত্তি গ্রামের অত্যাচারিত কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, পাবনা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি স্থানে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। যে সব মুসলমান কৃষক জমিদারদের অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল তারাও অনুপ্রাণিত হয় এবং ফরাজী আন্দোলনে যোগদান করে। পুলিশীসূত্রে জানা যায়, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে দুদু মিঞার সমর্থকদের সংখ্যা ছিল

৮০,০০০।[২০] ফরাজী আন্দোলন দ্রুত প্রসারিত হয় সেইসব অঞ্চলেই যেখানে অগণিত মুসলমান কৃষকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ছিল হিন্দু জমিদারেরা। লক্ষণীয় এই যে, কোন অর্থবান মুসলমান ফরাজী মতবাদ গ্রহন করেননি। তাছাড়া অনেক গোঁড়া মুসলমানও ফরাজীদের দ্বারা প্রচারিত আচরণ-পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেননি। আর যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে ফরাজী আন্দোলন পরিচালিত হয় তার সঙ্গে অর্থবান ও শহরবাসী মুসলমানদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকায় তাঁরা ফরাজীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীতে আকৃষ্ট হননি। সুতরাং ফরাজী মতবাদ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদেরই উদ্বুদ্ধ করে এবং পূর্ববঙ্গের গ্রামীন মুসলিম সমাজে প্রসারিত হয়।[২১]

এই সময়ে ফরিদপুর জেলায় ডানলপ নামে এক প্রতাপশালী নীলকর ছিলেন। তাঁর কয়েকটি নীলকুঠি ছিল। দুদু মিঞার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় নীলচাষীদের ওপর অত্যাচার করা কষ্টকর ছিল। সেজন্য ডানলপ দুদু মিঞাকে মস্ত বড় শত্রু মনে করেন এবং তাঁর প্রভাব হ্রাস করতে সচেষ্ট হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৮৪১-১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলীর পরে ফরাজীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হবার মত সাহস হিন্দু জমিদারদের ছিল না। তবে তাঁরা ফরাজীদের বিরুদ্ধে গোপনে বিভিন্ন মহলে প্রচার চালান এবং সরকারী কর্মচারীদের ও ইউরোপীয় নীলকরদের ফরাজীদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন। সরকার যাতে ফরাজীদের দমন করতে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে সেজন্য তাঁরা বিভিন্ন সংবাদপত্র মারফত জনমত গঠনে প্রয়াসী হন। হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন হিসেবে রূপ দেবার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। হিন্দু জমিদারদের প্রচার যে সম্পূর্ণ বিফল হয়নি তা ডানলপের সঙ্গে ফরাজীদের বিরোধের সময় বোঝা যায়। ডানলপ নিজে কাসিমপুর নীলকুঠিতে থাকতেন। মাদারীপুর মহকুমার মুলফত-

গঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত পাঁচচরে ডানলপের যে নীলকুঠিটি ছিল তার পরিচালক ছিলেন কালীপ্রসাদ কাঞ্জিলাল নামে একজন ব্রাহ্মণ গোমস্তা। ডানলপ যখন নিজের নীলকুঠি এলাকায় কৃষকদের মধ্যে ফরাজী মতবাদ প্রতিরোধে অগ্রসর হন তখন কালীপ্রসাদ এই কাজে তাঁকে সহায়তা করেন। কালীপ্রসাদ নীলচাষীদের অত্যাচার করেন। তার ফলে নীলকুঠির মালিক ও গোমস্তাদের ওপর ফরাজীরা ক্ষুব্ধ হয়। এইভাবে উভয়ের মধ্যে বিরোধ বাধে। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পাঁচচরের ডানলপের গোমস্তা ও প্রভাবশালী হিন্দুরা প্রায় সাত-আটশত সশস্ত্র লোক নিয়ে দুদু মিঞার বাহাদুরপুর গ্রামের বাড়ি আক্রমণ করে। দুদু মিঞা অভিযোগ করেন, এই আক্রমণের ফলে তার বাড়ির চারজন প্রহরী নিহত ও কয়েকজন আহত হয় এবং প্রচুর অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠিত হয় (মোট পরিমাণ হবে দেড় লক্ষ টাকা)।[২২] দুদু মিঞা ফরিদপুর শহরে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নালিশ করেও কোন সুবিচার পাননি। যে হিন্দু দারোগা এই ঘটনার তদন্ত করেন তাঁর সহানুভূতি হিন্দু বাবুদের প্রতিই ছিল।[২৩] স্বভাবতই দুদু মিঞা প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর দুদু মিঞার নির্দেশে কয়েকশত ফরাজী পাঁচচরে ডানলপের নীলকুঠি আক্রমণ করে, জিনিষপত্র লুট করে এবং নীলকুঠিটি পুড়িয়ে দেয়। নীলকুঠি সংলগ্ন ডানলপের বন্ধুবান্ধবেরা ও প্রতিবেশী পাঁচচরের হিন্দু জমিদারেরাও ফরাজীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁরা কোন ক্রমে পালিয়ে যেতে পারলেও তাঁদের যে পরিমাণ সম্পত্তি নষ্ট হয় তার মূল্য হবে ছাব্বিশ হাজার টাকা। তাঁদের তুলনায় ডানলপের ক্ষতির পরিমাণ অল্পই ছিল। তবে ফরাজীরা ডানলপের গোমস্তা কালীপ্রসাদকে অপহরণ করে বাখরগঞ্জ জেলায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। এই অভিযানে যে সব ফরাজী অংশ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূর থেকে আসে।[২৪]

দুদু মিঞা ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে ডানলপ ম্যাজিস্ট্রেটের

নিকট অভিযোগপত্র দাখিল করেন। ডানলপের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। এই বিষয়ে দুজনে পরামর্শ করেন এবং একসঙ্গে আহারও করেন। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাজিস্ট্রেটের সহানুভূতি ডানলপের প্রতি ছিল।[২৫] দুদু মিঞা প্রত্যক্ষভাবে অভিযানে অংশগ্রহণ না করলেও ডানলপ তাঁর বিরুদ্ধেও আদালতে নালিশ করেন। অবশ্য এই ঘটনার পূর্বেও কয়েকবার ডানলপ দুদু-মিঞাকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিবারই সাক্ষীপ্রমাণের অভাবে দুদু মিঞা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান।[২৬] এই সময়ে আবার ডানলপের অভিযোগক্রমে দুদু মিঞাকে বন্দী করা হয়। ফরিদপুরের সেসন জজের আদালতে অভিযুক্ত দুদু মিঞা ও তাঁর ৬৩ জন অনুগামীর বিচার চলে। এই মামলার ফলাফলের প্রতি জনসাধারণ উদ্বিগ্নচিত্তে লক্ষ্য রাখে। ফরাজীদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়, দুদু মিঞা শীঘ্র মুক্ত হবেন এবং যারা তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য দায়ী অথবা তাঁর মতবাদের বিরোধী তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।[২৭]

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ডানবার লেখেন, গত কয়েক বছর ধরে জনসাধারণের অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। অনেক পতিত জমি চাষযোগ্য করা হয়েছে। কৃষকেরা খাজনা নিয়মিত দিচ্ছে। হাট-বাজারে খাজনা আদায় স্বাভাবিক হচ্ছে। গ্রামের কৃষকের ও অন্যান্য জীবিকার মানুষের স্বচ্ছলতা চোখে পড়ে। এমন কি ফরিদপুর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার অধিবাসীরাও তাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট ও সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু ফরাজীদের কার্যাবলীর ফলে মানুষ উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত।[২৮] ডানবার তাঁর নোটে আরও লেখেন, বর্তমানে অনুমান করা হচ্ছে যে দুদু মিঞার সমর্থকদের মধ্যে দুদু মিঞার প্রভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। কারণ তিনি প্রায়ই তাঁর সমর্থকদের অর্থ দান করতে বলায় সমর্থকদের মধ্যে এই ধারণা হয় যে হয়তো এই অর্থের কিছু অংশ দুদু মিঞা এবং তাঁর সর্দারেরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। ডানবার এই তথ্য

উল্লেখ করেও লেখেন, এখনও দুদু মিঞার অপ্রতিহত প্রভাব আছে। যদি দুদু মিঞা আইন অমান্য করার সিদ্ধান্ত করেন তাহলে তাঁর অনুগামীরা তাঁর আদেশ বিনা দ্বিধায় পালন করবে এবং তাদের দমন করতে হলে সরকারকে খুবই বেগ পেতে হবে। ডানবার লেখেন : "It is supposed that Doodoo Meeah has rather lost ground of late, in the affections of his followers, in consequence of the frequent calls he has been making for pecuniary contributions, and the belief that a considerable portion of the money, is applied to their own immediate uses by him and his Sirdars···Still there can be no doubt, that the power which Doodoo Meeah possesses for good or for evil is great, and that if he chose to exert it in opposition to law, much trouble would be required to allay the storm he might raise."[২৯]

ডানবার লেখেন, ফরাজীরা যেভাবে শক্তি প্রয়োগ করে তাতে হিন্দু, গোঁড়া মুসলিম ও ইউরোপীয়রা ফরাজীদের ওপর অসন্তুষ্ট। তাঁরা ফরাজীদের কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন ও অসন্তুষ্ট। ফরিদপুর, ঢাকা ও বাখরগঞ্জ জেলায় ফৌজদারী আদালতের মামলা-মোকদ্দমা আলোচনা করলেই তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ বোঝা যায়। যদি কেউ ফরাজীদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী দিত তাহলে তার নিস্তার ছিল না। তারা এতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তারা অনেক সময়ে নিজেদের হাতে আইন-শৃঙ্খলা তুলে নেয়। তারা জমিদারের ও তালুকদারের সমস্ত রকমের অন্যায় কর আদায়ে সাফল্যের সঙ্গে বাধা দেয়। এমন কি ফরাজী কৃষকদের নিকট খাজনা আদায় করাও কষ্টকর হয়। স্বভাবতই ফরাজী অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে তাদের সঙ্গে সরকারের বিরোধ ঘটে। ডানবার লেখেন : "The

Ferazees are much disliked by the Hindoos, by the orthodox Mahamedans, and by Europeans, for all alike dread a power which they have seen so frequently exerted to a fearful eztent, for the purposes of oppression and revenge. A reference to the records of the Criminal Courts in Furreedpore, Dacca, and Backergunge, will at once shew, that this dread rests upon no slight foundation. Outrages of the most atrocious nature have been committed, with a daring which might well excite surprise, were it not known, that while every one not belonging to the sect who dares to give evidence against a Ferazee incurs their most deadly hatred, and unless powerfully protected, is sure before long to rue it, evidence to any extent, for the purpose of bringing off their own followers, when in the grasp of the Law, can be produced with facility, onthe mere word of Doodoo Meeah or his Sirdars. The comparative impunity with which they have on many occasions been guilty of such outrages, has induced a confidence, which renders them ever but too ready to take the law into their own hands – they not only resist successfully the levy of all extra or illegal cesses by the Zemindars and Talookdars, but with equal ability to pay their land rent, they give much more trouble than others in collecting it—they would withhold it altogether if they dared for it is a favorite maxim with them that

the Earth is Gods who gives it to his people—the land tax is accordingly held in abomination, and they are taught to look forward to the happy time, when it will be abolished."[৩০]

ডানবার আরও লেখেন, রাজনৈতিক দলরূপে ফরাজীদের নিকট হতে কোন ভয়ঙ্কর বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। তবুও তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। তা না হলে পূর্বে যেমন তারা আইনকে অগ্রাহ্য করেছে, ভবিষ্যতেও তা করবে। ভেবে দেখতে হবে, আর কতদিন দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ফরাজীদের দ্বারা বিপর্যস্ত হবে। তাই ডানবার কঠোর হস্তে ফরাজীদের দমন করার কথা বলেন। তিনি লেখেন, প্রথম কাজ হল দুদু মিঞাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা এবং এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাতে এই দলকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে দেওয়া যায়। তাদের দমনের জন্য পূর্বে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়। পরে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুত রাখাও হয়। ডানবার লেখেন : "Looking to these things, and bearing in mind, that the employment of a Military force was necessary, some years back to put these people down, and that not long after, troops were again warned to be in readiness to act against them; it will be admitted, that effectual measures should now be taken for breaking up the association, and giving them a blow from which they can not readily recover. It may be said, that as a political party, there is no reason to entertain serious apprehensions from their designs, and that nothing further is required than the vigorous adminstration of the Law; but the law has

failed to reach them on former occasions and it may do so again – if so, it is surely a subject of grave consideration, how far as rules of the country, we should be justified, in leaving the lives and property of a vast number of peaceable subjects, exposed to the machinations of men, so devoid of moral restraint, as Doodoo Meeah and his adherents have shown them selves to be, and with such fearful power for evil, as they have at their command."[৩১]

ডানবার আরও বলেন, দুদু মিঞাকে নির্বাসিত করার পরে তাঁর খলিফা, মুনসি ও সর্দার প্রভৃতিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন। সমস্ত সরকারী অফিসের দরজা ফরাজীদের সামনে বন্ধ করে দিতে হবে। ফরাজীরা যাতে খাস মহলের জমিতে বসতি স্থাপন করতে না পারে তার জন্য ভূমি রাজস্ব বিভাগকে নির্দেশ দিতে হবে। কৃষকেরা যাতে ফরাজীদের দ্বারা প্রবর্তিত কর ('Ferazee Tax') না দেয় তার জন্য নির্দেশ দিতে হবে এবং 'ফরাজী ট্যাক্স' না দেবার ফলে কেউ যদি আক্রান্ত হয় তাহলে তাদের রক্ষা করতে হবে। এই ভাবে ফরাজীদের সংগঠন ভেঙ্গে দিতে হবে।[৩২]

ডানবার লিখিত এই নোট পেয়ে ডেপুটি গবর্ণরের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের সেক্রেটারী হ্যালিডে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ এপ্রিল যে মতামত ব্যক্ত করেন তাও লক্ষণীয়। হ্যালিডে লেখেন, বর্তমানে দুদু মিঞা কারাগারে বন্দী এবং হত্যা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে তাঁর ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। ফরিদপুর জেলায় ফরাজী উপদ্রব বন্ধ করে কিভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করা যাবে, তা এই বিচারের রায়ের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। সুতরাং রায় বের না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে জেলার ঘটনার প্রতি সুপারিনটেনডেণ্ট অব পুলিশের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে এবং

পুলিশকে সতর্ক থাকবার নির্দেশ দিতে হবে। তুদু মিঞার প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে, এই খবরে ডেপুটি গবর্ণর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, ফরাজীরা জনসাধারণের মধ্যে যে উত্তেজনার সঞ্চার করেছে তা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। তাই এই মুহূর্তে ডেপুটি গবর্ণর কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সম্মত নন। তাঁর ধারণা, যেহেতু ফরাজী আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি মিশ্রিত আছে সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এই ধরণের আন্দোলন হ্রাস না পেয়ে আরও প্রসারিত হবে। ডানবারের নিকট প্রেরিত এই নোটে হ্যালিডে লেখেন: "The Deputy Governor is glad to perceive from para. 5 of your report that the influence of Doodoo Meeah is beginning to decline. It seems to His Honor most probable that an end will thus be gradually put to the excitement which has hitherto prevailed among the people. Were it otherwise however Deputy Governor could not consent to adopt the extreme and rigorous measures which you have suggested, and which as all experience shews, have usually a greater tendency to increase, than to diminish the strength and spread of religious fanaticism."[৩৩]

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিচারে তুদু মিঞা ও তাঁর অনুগামীদের শাস্তি দেওয়া হয়। ফরিদপুর আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতার উচ্চ আদালতে আপীল করা হয় এবং অভিযুক্ত সবাই মুক্তিলাভ করে।[৩৪] তারপরে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একটানা দীর্ঘকাল ফরাজীদের সঙ্গে জমিদারের বা নীলকরের কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়নি। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহ হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার তুদু মিঞাকে বন্দী করে কলকাতায় এনে কারাগারে আটক রাখে। তাঁর বিরুদ্ধে সরকার কোন সুনির্দিষ্ট

অভিযোগ করেনি। সম্ভবতঃ গ্রাম বাংলায় দুদু মিঞার প্রচণ্ড প্রভাবের কথা ভেবেই নিরাপত্তার প্রয়োজনে সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে।[৩৫] রাজনৈতিক কারণেই যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহ দমিত হবার পরে দুদু মিঞাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কলকাতা থেকে নিজ গ্রামে ফিরে আসার পরেই আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফরিদপুর জেলে প্রেরণ করা হয়। তখনও তাঁর বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল না। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দুদু মিঞা ঢাকাতে চলে যান এবং সেখানে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকাতে তাঁর মৃত্যু হয়।[৩৬]

দুদু মিঞার মৃত্যুর পরে ফরাজী আন্দোলন এক সঙ্কটের মুখে পড়ে। শরীয়ত উল্লাহ ও দুদু মিঞার মত সুযোগ্য নেতা আর কেউ ছিলেন না। দুদু মিঞার বড় পুত্র গিয়াথালদীন হায়দার অল্প সময়ের জন্য নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরে দুদু মিঞার দ্বিতীয় পুত্র আবদুল গফুর বা নোয়া মিঞা (১৮৫২-১৮৮৩ খ্রী) ফরাজী আন্দোলনের নেতা হন।[৩৭] ফরাজী আন্দোলনের দুর্বলতার সুযোগে ফরিদপুরের জমিদারেরা পুনরায় কৃষকের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। নোয়া মিঞা যোগ্যতার সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা করায় পুনরায় ফরাজীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। নোয়া মিঞার আমলে ফরাজী আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখিত আত্মজীবনী 'আমার জীবন' (তৃতীয় ভাগ) নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। নবীন সেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মাদারীপুর মহকুমার শাসক হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৩৮] তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে ফরাজী আন্দোলন আলোচনা করেন। দুদু মিঞা ফরাজী অঞ্চলে যে ধরণের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তা নোয়া মিঞার

আমলেও বজায় ছিল। তাঁর সময়েও ফরিদপুর জেলার অধিকাংশ প্রজাই 'ফরাজী মুসলমান' ছিল। নবীন সেন নোয়া মিঞার প্রভাব সম্পর্কে লেখেন: "নোয়া মিয়ার মুখের কথা তাহাদের পক্ষে বেদ। এমন ধর্ম্মগুরুর দাসত্ব অন্য কোনও জাতিতে নাই। এ অঞ্চলে নোয়া মিয়া ইংরাজ রাজ্যের উপর এক প্রকার আপনার রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামে তাহার এক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও পেয়াদা নিয়োজিত ছিল, এবং ইহাদের দ্বারা সে ফরাজিদিগকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত রাখিত। গ্রামের কোনও বিবাদ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি ভিন্ন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইতে পারিত না। অগ্রে তাহার কাছে বিচার হইত এবং সে অনুমতি দিলে ইংরাজ পুলিসে কি বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত হইত। ইহার অন্যথা কেহ করিলে তাহাকে ধর্ম্মচ্যুত 'কাফের' হইতে হইত। ইহার ফলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে পক্ষ অবলম্বন করিত সে পক্ষ মিথ্যা হইলেও প্রমাণিত হইত। তাহার আদেশমত লোকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিত, এবং সে যাহার বিপক্ষে যাইত তাহার অভিযোগ সত্য হইলেও শত পুলিসে কি বিচারকে চেষ্টা করিয়াও বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাইত না।···এরূপে মাদারীপুরের বিচারকার্য্য একরূপ হাস্যকর ব্যাপার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের লীলা হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু তাহা নহে। বিচারালয়ে বহুব্যয়ে যদি কোন সম্পত্তি কেহ ডিক্রী পাইল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহার প্রতিকূলে গেলে, তাহার সাধ্য নাই যে সেই সম্পত্তির নিকটে যাইবে। মাদারিপুর যে এত গুরুতর হাঙ্গামা খুনের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, এই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ তাহার একটি প্রধান কারণ। অথচ ইহারা ঠিক যেন আয়নার ছবি। ধরিবার যো নাই। ধরিবে কি, তাহাদের ও তাহাদের পেয়াদাদের নাম পর্য্যন্ত গ্রামের কেহ প্রাণান্তে প্রকাশ করিবে না। যাহাদের সর্ব্বনাশ করিত, তাহারা পর্য্যন্ত নোয়া-মিয়ার ভয়ে ইহাদের নাম প্রকাশ করিত না। কারণ তাহা হইলে গ্রামান্তরে পলাইয়া গিয়াও রক্ষা নাই। সেখানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

তাহার প্রতিশোধ লইবে। এরূপ অবস্থায় কোন কোন প্রজা দেশত্যাগী হইয়া অন্যদেশে চলিয়া যাইত, তথাপি তাহার ধর্ম্মগুরুর প্রতিকূলতা করিত না।

"আমি সব্ডিভিসনের ভার লইয়া নোয়ামিয়ার শাসনের গল্প শুনিয়াছিলাম, এবং চক্রবর্ত্তীদের মোকদ্দমায় তাহার প্রমাণও পাইলাম। কিন্তু তাহাকে দণ্ডবিধি কি কার্য্যবিধির দ্বারা স্পর্শ করিবারও যো নাই। কারণ, আইন প্রমাণের অধীন। নোয়ামিয়ার কার্য্যাবলী প্রমাণের বাহির। তাহার প্রতিকূলে কে প্রমাণ দিবে? পুলিশ এই বলিয়া কবুল জবাব দিত। আমি তখন বুঝিলাম যে, তাহাকে শাসন করা দণ্ডবিধি কি কার্য্যবিধির কার্য্য নহে। ইহার জন্য অন্য বিধি অবলম্বন করিতে হইবে।"[৩৯]

এই বিবরণ থেকেই নোয়া মিঞার প্রতিপত্তি সম্পার্কে সম্যক ধারণা করা যায়। যখন নবীন সেন মাদারীপুর মহকুমার দায়িত্বে ছিলেন তখন পালঙ্গ থানার অন্তর্গত ভদ্রাসন গ্রামের চক্রবর্তী নামক এক ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের অত্যাচারে প্রজাদের দুরবস্থা খুবই বৃদ্ধি পায়। এই জমিদারীর অংশীদার ছিলেন আপন তিন ভ্রাতা ও তাঁদের এক খুড়তত ভ্রাতা। তিন ভ্রাতার মধ্যে যিনি কনিষ্ঠ তিনি ছিলেন খুবই অত্যাচারী এবং এই অঞ্চলে তাঁকে লোকে 'কংসাবতার' নামে উল্লেখ করত। কংসাবতার তাঁদের খুড়তত ভ্রাতাকে জমিদারীর অর্ধাংশ থেকে বঞ্চিত করায় তিনি হতাশ হয়ে তাঁর জমিদারীর অংশ নোয়া মিঞার নিকট পত্তনা দেবার সিদ্ধান্ত করেন। এই প্রস্তাবের কথা শুনে কংসাবতারেরও হৃৎকম্প হয়। কংসাবতার গোপনে পালঙ্গ সাব-রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তিন ভ্রাতার নামে এককালে পত্তনি লিখে রেজিষ্টারি করে নেন। খুড়তত ভ্রাতা এই দুঃসংবাদ পেয়ে উদ্বিগ্ন চিত্তে পালঙ্গ রেজিষ্টারি অফিসে যান এবং সেখান থেকে দলিলের নকল নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার জেফ্রির নিকট নালিশ করেন। জেফ্রি নিজে তদন্ত করে কংসাবতারকে সেসনে অর্পণ করেন এবং সাব-রেজিষ্ট্রারের নামে

মোকদ্দমা স্থাপন করে তার বিচারের ভার মহকুমা অফিসারের ওপর দেন। নবীন সেনকে এই মোকদ্দমার বিচার করতে হয়। তিনি মহকুমার দায়িত্ব গ্রহণ করেই সাব-রেজিষ্ট্রারকেও সেসনে অর্পণ করেন এবং উভয় মোকদ্দমা একসঙ্গে বিচার হয়। কিন্তু কংসাবতার ও সাব-রেজিষ্ট্রার মোকদ্দমাতে অব্যাহতি পাওয়ায় সাধারণ লোক স্তম্ভিত হয়ে যায়। জেফ্রির সঙ্গে জজের মনোমালিন্যের ফলেই এই বিচার বিভ্রাট ঘটে। কংসাবতার ভদ্রাসনে ফিরে এসেই ঐ অঞ্চলে অরাজকতা আরম্ভ করেন। প্রত্যহ তিন ভ্রাতার বিরুদ্ধে ঐ অঞ্চলের লোকেরা নালিশ করতে থাকে এবং মহকুমা শাসক তাঁদের শাস্তি দিলেও ফরিদপুরের জজ সাহেব তাঁদের ছেড়ে দিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং তিন ভ্রাতাই মাঝে মাঝে জেলে যায়, আবার কিছুদিনের মধ্যেই খালাস হয়। তাঁদের অত্যাচারে অবস্থা ভয়ানক হয়। মহকুমা শাসক যে তাঁদের কিছুই করতে পারেননি তা ঘোষণা করবার জন্য এবং তাঁকে জনসমক্ষে অপদস্থ করবার জন্য তিন ভ্রাতা তাঁদের খুড়তত ভ্রাতার জমিদারী কাছারিতে এক প্রকাণ্ড কালীপূজা করেন এবং ঢাকা থেকে বাই খেমটা এনে তিন দিন ধরে ঘোরতর উৎসব করেন। এই উৎসব শেষে এই জমিদারীর একজন অত্যাচারী গোমস্তা প্রজাদের গরু-বাছুর প্রকাশ্যে নিলাম করে খাজনা উশুল করতে থাকে এবং "নানাবিধ অসহনীয় অত্যাচার" করতে থাকে। প্রজারা বুঝতে পারে মহকুমা শাসক তাদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেও এই অত্যাচারকে বন্ধ করতে পারেননি। সরকার তাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় ফরাজীরা চক্রবর্তীদের দমন করার ব্যবস্থা করে এবং তারা নিজেদের হাতে শাসনভার তুলে নেয়। চতুর ও সাবধানী গোমস্তা ডাঙ্গায় কাছারিতে না থেকে নৌকাতে থাকত। একদিন পালঙ্গ থানাতে খবর এলো নৌকা সমেত গোমস্তা ও পেয়াদাদের কোনই চিহ্নমাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ তদন্তে গেলে মুসলমান প্রজাগণ বলে ('মাদারিপুর অঞ্চলে মুসলমানই প্রজা") তারা

গোমস্তাকে দেখেনি। 'আল্লার চিল' তাকে নিয়েগেছে।[৪০] সবাই বুঝতে পারে তাদের হত্যা করে নৌকাসহ মেঘনায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরে ঐ অঞ্চলে প্রজারা এই কথাও রাষ্ট্র করে যে, সরকার যখন চক্রবর্তীদের অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষা করেনি তখন তারা তিন ভ্রাতাকে হত্যা করে তিনজন ফাঁসিতে জীবন বিসর্জন দিয়ে দেশ রক্ষা করবে। এই সংবাদে চক্রবর্তীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ভদ্রাসন বাড়ি ত্যাগ করে প্রাণভয়ে ফরিদপুর শহরে চলে যান এবং সেখানে সরকারী উকিল তারানাথ বাবুর আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৪১]

নবীন সেন মাদারীপুর মহকুমার দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে পূর্ণ রায় নামক একজন ভূম্যধিকারীকে প্রজারা হত্যা করে। তাঁর "অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর পক্ষে জমিদারি কোর্টে আনা" হয় এবং জেফ্রি ও তারানাথ উভয়েই শিশুকে বড়ই স্নেহ করতেন। এই শিশুর ষ্টেট চক্রবর্তীদের নিকট ঋণী ছিল। তারানাথ চক্রবর্তীদের সাহায্য করবেন ঠিক হয়। তখন তিনি তাদের নিকট একটি সামান্য সম্পত্তি বিক্রি করে এই ষ্টেটের ঋণ পরিশোধ করে নেন। নাবালক শিশুর ষ্টেট ঋণ মুক্ত হওয়ায় জেফ্রি খুশি হন। তারপরে তারানাথ চক্রবর্তীদের জেফ্রির নিকট নিয়ে যান। চক্রবর্তীরা জেফ্রির পা ধরে কাঁদতে শুরু করেন এবং তাঁরা যাতে নিজগ্রামে গিয়ে বসবাস করতে পারেন তার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করেন। জেফ্রি নবীন সেনের নিকট পত্র লিখে চক্রবর্তীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে বলেন এবং গোমস্তা পেয়াদা খুন মামলার প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে বলেন। কয়েক দিন পরে জেফ্রি চক্রবর্তীদের নিয়ে মাদারীপুর যান। তখন নবীন সেন জেফ্রিকে বলেন: "শুনিয়াছি পূর্ণ রায়ের মোকদ্দমায় ব্যারিষ্টার মনোমোহন এ অঞ্চলের প্রজাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে যদি খুন করে তবে যেন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখে না। তাহারা এবার সে উপদেশমতে কার্য্য করিয়াছে, অতএব খুন প্রমাণ করা বিধাতা পুরুষেরও সাধ্য নাই। তবে চক্রবর্ত্তীরা যদি আর অত্যাচার করিবে

না বলিয়া তাঁহার ও আমার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করে, তবে তাহারা বাড়ী চলিয়া যাউক, কেহ তাহাদের যেন কেশ স্পর্শ না করে আমি তাহা করিব।"[৪২] তখন জেফ্রি চক্রবর্তীদের ডেকে পাঠান এবং তাঁরা পৈতা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁরা ভবিষ্যতে নবীন সেনের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কার্য করবেন না। তখন নবীন সেন তাঁদের বাড়িতে গিয়ে বসবাস করতে বলেন। তারপরে নবীন সেন উভয় পক্ষের মোক্তারদের ডেকে এবং প্রজাদের মোক্তারকে সম্বোধন করে বলেন : "চক্রবর্ত্তীরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর তাহারা প্রজার উৎপীড়ন করিবে না। আমি তাহাদিগকে বাড়ী যাইতে আদেশ দিয়াছি। তুমি জান, আমি এতদিন প্রজাদের জন্য কত কি করিয়াছি, কিন্তু এখন প্রজারা যদি তাহাদের ছায়াও স্পর্শ করে, তবে আমি তাহাদের প্রতিকূলে যাইব।"[৪৩] প্রজাদের মোক্তার বলেন, "সে প্রজাদের সংবাদ দিবে। তাহারা আমার আদেশের কখনও অন্যথাচরণ করিবে না।"[৪৪]

এই ব্যবস্থা করার পরে নবীন সেন নিজে ঐ অঞ্চলে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। প্রথমে প্রজারা নবীন সেন স্থিরীকৃত নিরিখ মানতে রাজী হয়নি। তখন তিনি এই বিদ্রোহের দলপতিদের শাস্তি দেবার ভয় দেখান। তিনি তাদের দমনের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তার বিবরণ নিজেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন : "চক্রবর্ত্তীদের পলায়ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রজাদের এত সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল যে আমার স্থিরীকৃত নিরিখেও তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিল না। তখন আমাদের যে অমোঘ অস্ত্র আছে তাহা ত্যাগ করিলাম। এই বিদ্রোহের দলপতিগণকে Special Constable (বিশেষ কনেষ্টবল) নিযুক্ত করিয়া আদেশ দিলাম যে তাহারা প্রত্যহ সেখান হইতে পালঙ্গের থানায় শান্তি রক্ষার সংবাদ দিবে, সেখান হইতে সেই সংবাদ মাদারিপুরে অতিরিক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে লইয়া যাইবে, এবং তাহার পর আমার শিবিরে সংবাদ

লইয়া আসিবে। তাহাদিগকে পোষাক দেওয়া হইল। Baton (বেটন) দেওয়া হইল। আমার তাঁবুর সম্মুখে সে 'বেটন' বুকে লাগাইয়া দাঁড়াইত। একদিন একজন মোক্তার তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে সে উহা রাত্রিতেও বুকের উপর রাখিয়া শুইয়া থাকে, কারণ উহা মাটিতে রাখিলেও নাকি জরিমানা হয়। এরূপ দিন কয়েক কনষ্টেবলি করিবার পর তাহাদের রোখ থামিল। তাহারা বুঝিল যে কেবল চক্রবর্ত্তীদের নহে, তাহাদের শাসন করিবারও অস্ত্র আছে। তখন সমস্ত প্রজা সেই নিরিখ স্বীকার করিল এবং আনন্দে বন্দোবস্ত করিল। তখন জমীদার প্রজার মধ্যে সেই সম্প্রীতি, এবং আমার প্রতি উভয়ের কৃতজ্ঞতা দেখিয়া আমার হৃদয়ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সমস্ত বন্দোবস্ত রেজেষ্টারী করাইয়া দিয়া আমি শিবির উঠাইয়া মাদারিপুরে ফিরিলাম। জেফ্রি সাহেবকে সমস্ত সংবাদ অবগত করাইলে, তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়া ও প্রীতি প্রকাশ করিয়া দীর্ঘ পত্র লিখিলেন।"[৪৫] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই সময়ে নবীন সেন চক্রবর্তীদের তিন ভ্রাতার সঙ্গে তাঁদের খুড়তত ভ্রাতার বিরোধও মীমাংসা করে দেন।[৪৬]

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নবীন সেনকে আর একটি ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সময়ে মাদারীপুর মহকুমায় জুম্মার নামাজ নিয়ে ফরাজী নেতা নোয়া মিঞার সাথে মাদারীপুর মহকুমায় প্রচাররত জৌনপুরের মৌলবী কেরামত আলির বিতর্ক রক্তাক্ত সংঘর্ষে পরিণত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। নোয়া মিঞার মতে, "যেখানে মুসলমান রাজ্য নাই, সেখানে 'জুম্মা নেমাজ' অসিদ্ধ।" কিন্তু কেরামত আলি বলেন, "মুসলমান রাজ্য হউক, আর অন্য রাজ্যই হউক, রাজা যেখানে আছে সেখানে জুম্মা নেমাজ সিদ্ধ।" যাতে এই দুই দলের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা না হয় সেজন্য নবীন সেন নিজে উদ্যোগী হয়ে মাদারীপুরে এক রবিবার একটি মহতী সভার আয়োজন করেন। ঠিক হয় উভয় দলই এই সভায় তাদের বক্তব্য পেশ করবে। একেই

নবীন সেন 'জুম্মার যুদ্ধ' নামে উল্লেখ করেন। যথাসময়ে নোয়ামিঞা ও কেরামত আলি 'কেতাব' ও অনুচর সহ সভায় উপস্থিত হন। প্রায় পাঁচ সহস্র মুসলমান সমবেত হন। এই 'জুম্মার যুদ্ধ' সম্পর্কে নবীন সেনের বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হল : "এক প্রকাণ্ড সামিয়ানা-তলে ফরিদপুর অঞ্চলের সমস্ত আকক্ষ-চুম্বিত-শ্মশ্রু মৌলবীগণ বড় বড় 'মুড়াচ্ছা' বাঁধিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন আমাদের শ্রাদ্ধ সভায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের যেরূপ পণ্ড বাক্‌বিতণ্ডায় মেদিনী কম্পিত হইয়া থাকে আমি তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলাম। আমি অগ্রেই জানিয়াছিলাম যে এই জুম্মা যুদ্ধের শেষ নাই। অতএব যুদ্ধ ১০ টার সময় আরম্ভ করাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তে সমস্তদিন দিবানিদ্রায় কাটাইলাম। ইন্‌স্‌-পেক্টরকে বলিয়া দিলাম যে তিনি যেন পাঁচটার সময় রক্তউষ্ণীশধারী অনুচরগণ সমভিব্যাহারে সশস্ত্র বীরবেশে সভায় উপস্থিত হন। নিদ্রান্তে পাঁচটার সময়ে গিয়া দেখিলাম সবডিভিসন ভাঙ্গিয়া যেন সমস্ত কাছাবিহীন বিরাটমূর্ত্তি ফরাজিগণ সমবেত হইয়াছে। মৌলবী-যুগলকে আমি সভার দুই প্রান্তে বসাইয়াছিলাম। এখন দেখিলাম, তাঁহারা পশ্চাৎদেশ ঘর্ষণ করিতে করিতে প্রায় সম্মুখীন হইয়াছেন, এবং আর কিছু বিলম্ব করিলে বিতণ্ডা ঘন বিলোড়িত জিহ্বা ও ঘন আন্দোলিত শ্মশ্রুজাল হইতে বাহু চতুষ্টয়ে সঞ্চালিত হইবে ; এবং তখন প্রায় পাঁচ সহস্র মুসলমানের সেখানে একটা 'করবল্লা' হইবে। আমি কিছুক্ষণ অতিশয় গম্ভীরভাবে সেই কণ্ঠতালু ও মূর্দ্ধা হইতে অপূর্ব্বরূপে উচ্চারিত আরব্য শব্দাবলি শ্রবণ করিয়া তাহাদের অপরিজ্ঞাত অর্থে আপ্যায়িত হইয়া বলিলাম—'আপনারা উভয়ে বিখ্যাত মৌলবী, (তাঁহারা উভয়ে প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেলাম করিলেন)—আপনাদের এই তর্ক আজ যে শেষ হইবে বোধ হইতেছে না। কারণ বিষয় বড় গুরুতর।—(তাঁহারা উঠিয়া আবার আমাকে সুপ্রসন্নভাবে সেলাম করিলেন)—বেলাও শেষ হইয়া আসিয়াছে। আপনারা ক্লান্ত হইয়াছেন। অতএব আজ সভা ভঙ্গ হউক।

সুবিধামতে আর একদিন বিচার হইবে।' সমবেত মুসলমান মৌলবী ও ভদ্র-মণ্ডলীর পিত্তও অজ্ঞাত আরব্য ভাষার ৭ ঘণ্টা বাহী প্রবাহে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারাও আমার প্রস্তাবে সায় দিলেন। তখন আমার পূর্ব্ব সঙ্কেত মত আমি নোয়ামিয়াকে ও তাঁহার শত শত সহচরকে সঙ্গে করিয়া উত্তর মুখে চলিলাম। ইন্‌স্পেক্‌টার অন্য মৌলবী ও তস্য শত শত সহচরকে সঙ্গে করিয়া দক্ষিণ মুখে গেলেন। আমি নোয়ামিয়াকে বলিলাম যে, তিনি যেন সেদিন আর দক্ষিণ মুখ না যান। কারণ এ অঞ্চলে তাঁহার অশেষ সম্মান। যদি সেই বিদেশীয় মৌলবীর সঙ্গে দেখা হয়, এবং সে তাঁহাকে কোনরূপ কটু কথা বলে, তবে তাঁহার লাক টাকার সম্মান নষ্ট হইবে। তিনি বলিলেন, আমার কথা ঠিক। সেই 'নাদান' (অজ্ঞানী) মৌলবী যে দিকে গিয়াছে, সে দিকে তিনি যাইবেন না। তবে আর একদিন সভা হইলে, তিনি নিশ্চয় তাহাকে পরাজিত করিবেন। পূর্ব্ব rehearsal (শিক্ষা) মতে ইন্‌স্পেক্‌টারও অন্য মৌলবীকে ঠিক এরূপ বলিলেন, এবং সেই মৌলবীও এরূপ সায় দিয়া—বিশেষতঃ সে বিদেশীয়—অন্য দিকে ছুটিল। পরদিন সমস্ত সব্‌ডিভিসন রাষ্ট্র হইয়া গেল যে নোয়ামিয়া হারিয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাও আমার পূর্ব্ব তালিমের ফল।

"নোয়ামিয়া তাহার পরদিন বুক কুটিতে কুটিতে আমার কাছে সহচর-শূন্যভাবে উপস্থিত। 'হাম্ এক দমছে বরবাত গেয়া। হামারা লাখো রূপেয়াকা ইজ্জত গেয়া।'—ইত্যাদি শোকসূচক বাক্যাবলি উদগীরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে জেলে দিলেও তিনি বোধ হয় এত কাতর হইতেন না। অতএব পেনেল কোডের উপরেও দণ্ড আছে। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—'এ কি কথা! এমন কথা কে রাষ্ট্র করিল?' তিনি গলদশ্রুনয়নে বলিলেন —যে উহা সেই 'দুষমন্' মৌলবির কায। অতএব এ জনরব মিথ্যা বলিয়া পুলিশের দ্বারা রাষ্ট্র না করাইলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।

ইহা অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যু ভাল। আমি বলিলাম—উত্তম কথা। তিনি যদি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন, আমিও তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিব। আমি তখন তাঁহাকে খুব বাড়াইয়া বলিলাম—'আমি আপনার এ অঞ্চলে অমোঘ প্রভুত্বের ও আপনার শাসন-প্রণালীর কথা সকলই অবগত হইয়াছি। আমি আপনার শাসনের প্রতিকূলতা করিব না। আসুন উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া কায করি। আমি আপনার সাহায্য করিব, আপনি আমার সাহায্য করিবেন। প্রথম কথা, আপনি আমাকে গোপনে আপনার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও পেয়াদাদের এক তালিকা দিবেন। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের বলিয়া দিবেন যেন তাহারা ধর্ম্মতঃ কার্য্য করে। যে সকল মোকদ্দমা আপোষে হইতে পারে তাহারা সে সকল মোকদ্দমা আপোষ করিয়া দিবার জন্য আমি নিজে তাহাদের কাছে সেরূপ মোকদ্দমা পাঠাইব। তাহাদের মধ্যে কেহ যদি অন্যায় কার্য্য করে, কাহারও প্রতি আমার সন্দেহ হয়, তাহাদের কাহারও এলাকায় শান্তিভঙ্গের কার্য্য হয়, আপনি তাহাদের পদচ্যুত করিবেন। তৃতীয়তঃ যাহারা 'জুম্মা নেমাজ' করিতে চাহে আপনি তাহাদের কোনরূপ ক্ষতি করিবেন না। আপনি কোরান স্পর্শ করিয়া আমার এই অনুরোধ ধর্ম্মতঃ রক্ষা করিবেন বলিয়া বলুন, আমি আপনার বিপক্ষতা না করিয়া যাহাতে আপনার প্রতিপত্তি আরও বর্দ্ধিত হয়, তাহা করিব; এবং এ জনরবের তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিব। তিনি তাঁহার বজরা হইতে কোরান আনাইয়া অতিশয় সন্তুষ্টির সহিত এ প্রতিজ্ঞা করিলেন। এবং আমার অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন—'এতদিনে মাদারিপুরে একজন বিচক্ষণ লোক আসিয়াছে। অতঃপর আমার কোন কার্য্যে অপ্রীত হইবার আপনি কোনও কারণ পাইবেন না। আমি ঠিক আপনার একজন তাঁবেদারের মত কার্য্য করিব।' আমি যে দুই বৎসর মাদারিপুরে ছিলাম, তিনি এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। আমার মাদারিপুর সুশাসনের ইহাই একটি নিগূঢ় তত্ত্ব। যে ডেপুটিরা বিশ্বাস করেন যে

কেবল বেত পিটিলে ও মেয়াদ দিলে শাসন হয়, তাঁহারা এ উপাখ্যান পাঠ করিয়া মত পরিবর্ত্তন করিবেন কি ? জেফ্রি সাহেব 'জুম্মা যুদ্ধের' সংবাদ পাইয়া মহা ব্যস্ত হইয়া আমার কাছে রিপোর্ট চাহিয়াছিলেন। তিনি আমাকে পরে বলিয়াছিলেন যে আমার রিপোর্ট পাইয়া তিনি যেরূপ হাসিয়াছিলেন, এরূপ আর কখনও হাসেন নাই।"[৪৭] নবীন সেন একথাও লেখেন যে, তারপরে মাদারীপুরে মামলা মোকদ্দমাও অনেক হ্রাস পায় এবং সর্বত্র শান্তি বিরাজ করে।[৪৮]

সুতরাং নোয়া মিঞার প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকলেও তিনি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করায় ফরাজীদের অস্তিত্ব প্রধানতঃ ধর্মীয় গ্রুপরূপেই বজায় থাকে। ফরাজীদের পরিচালনার জন্য যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গঠন করা হয়, তাও অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। সরকারী নীতির ও কেরামত আলির প্রচারের ফলে ফরাজীদের প্রভাব অনেকটা হ্রাস পায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ফরাজী আন্দোলনের প্রচণ্ডতা হ্রাস পেলেও ফরাজীদের সংখ্যা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও নেহাত কম ছিল না। ধর্মীয় গ্রুপরূপে তাদের অস্তিত্ব দীর্ঘকাল টিকে থাকে এবং গ্রাম বাংলায় ইসলামীয়করণের ধারাটিকে তারা অব্যাহত রাখে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের দেশভাগের সময়ে ও তার পরবর্তীকালেও পূর্ববঙ্গে ফরাজীদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এমনকি আজও ধর্মীয় গ্রুপরূপে এদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়নি।[৪৯]

(খ) তারিকা-ই-মহম্মদীয়া (বা ভারতবর্ষের ওয়াহাবি আন্দোলন):— প্রশ্ন হল: এই ফরাজী আন্দোলনের সঙ্গে আরব দেশের ওয়াহাবি আন্দোলনের ও ভারতবর্ষের রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রী) ও শাহ ইসমাইল (১৭৮২-১৮৩১ খ্রী) কর্তৃক প্রবর্তিত 'তারিকা-ই-মহম্মদীয়া' বা 'মহম্মদের পথ' নামক ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের মিল কতটুকু ছিল? একসময়ে ধারণা করা হয় ফরাজী আন্দোলন আরও ব্যাপকতর ভারতীয় ওয়াহাবি আন্দো-

লনের সঙ্গে মিশে গেছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই এই দু'টো গ্রুপের পার্থক্য গবেষকেরা মনে রাখেননি। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লিতে 'তারিকা-ই-মহম্মদীয়া' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পূর্ববঙ্গে শরীয়ত উল্লাহ যখন ফরাজী আন্দোলন সুরু করেন, তখন প্রায় একই সময়ে দিল্লিতে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়। সৈয়দ আহমদ বলেন : "আমার 'তারিকা' (পথ) হল পয়গম্বর প্রদর্শিত তারিকা।"[৫০] সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাইল উভয়েই দিল্লির শাহ ওয়ালি উল্লাহর (১৭০৩-১৭৬৩ খ্রী) মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। শাহ ইসমাইল ছিলেন শাহ ওয়ালি উল্লাহর দৌহিত্র, আর সৈয়দ আহমদ ছিলেন শাহ ওয়ালি উল্লাহর পুত্র শাহ আবদুল আজিজের ছাত্র ও শিষ্য। তাঁরা দুজনেই দিল্লিতে শাহ আবদুল আজিজের নিকট শিক্ষালাভ করেন।[৫১] আর ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাঁরা আরব দেশেও যাননি। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁদের দ্বারা পরিচালিত ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং প্রথম দিকে 'তারিকা-ই-মহম্মদীয়া' আন্দোলনের সঙ্গে নজদের মুহম্মদ বিন আবদুল ওহ্হাব (১৭০৩-১৭৯২ খ্রী) প্রবর্তিত ওয়াহাবি আন্দোলনের কোন যোগসূত্র ছিল না। ১৮২২-১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইলমাইল যখন মক্কা ও মদীনা ভ্রমন করেন তখন আরব দেশে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাব অনেকটা হ্রাস পায়। ফরাজী আন্দোলনের সঙ্গে আরব দেশীয় ওয়াহাবি ও 'তারিকা-ই-মহম্মদীয়া' আন্দোলনের কোন কোন বিষয়ে মিল থাকলেও, তাদের মধ্যে ইসলামীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করার বিষয়ে পার্থক্যও ছিল। অবশ্য প্রতিটি গ্রুপই অ-ইসলামীয় আচরণ পরিহার করে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে আগ্রহী ছিল। এই বিষয়ে তাদের মধ্যে মিল দেখতে পাওয়া যায়। শরীয়ত উল্লাহ যখন আরব দেশে ছিলেন তখন ওয়াহাবি মতবাদের প্রভাব প্রত্যক্ষ করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াহাবিরা মক্কা ও মদীনা দখল করেন। আরব দেশে ওয়াহাবিরা

দুর্নীতিপরায়ণ তুর্কী সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন এবং মক্কা দখল করার পরে সেখানকার অধিবাসীদের তাঁদের মতবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। ওয়াহাবিরা নিজেদের মুওয়াহহেদুন বা খাঁটি একেশ্বরবাদী বলে পরিচয় দেন এবং এই একেশ্বরবাদ পুনরুজ্জীবনের জন্য আন্দোলন করেন। ফরাজীদের দ্বারা প্রচারিত 'তৌহীদ' (tawhid) বা একেশ্বরবাদের সঙ্গে ওয়াহাবি মতবাদের মিল থাকায় একথা বলা যায় ফরাজীরা ওয়াহাবি মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। তবুও কয়েকটি বিষয়ে তাদের মধ্যে যে অমিল ছিল তাও লক্ষণীয়। প্রথমতঃ ফরাজীরা 'তকলীদ' (taqlid) এর সমর্থক, আর ওয়াহাবিরা 'ইজতিহাদ (ijtihad) এর সমর্থক। দ্বিতীয়তঃ ফরাজীরা মিস্টিসিজম বা সুফিজম ইসলামের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করেন এবং তাকে আধ্যাত্মিক চেতনা আয়ত্ত করবার জন্য ব্যবহার করেন। কিন্তু ওয়াহাবিরা তাকে অ-ইসলামীয় প্রথারূপে গণ্য করে বর্জন করেন। তৃতীয়তঃ ওয়াহাবিরা 'হানবালি স্কুলের' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আর ফরাজীরা 'হানাফি স্কুলের' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৫২]

অন্যদিকে ফরাজী আন্দোলনের সঙ্গে 'তারিকা-ই-মহম্মদীয়া' আন্দোলনেরও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। যেহেতু ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' (Dar-ul-harb or enemy country) বলা হয় সেজন্য ফরাজীরা বাংলাদেশে জুম্মা ও ঈদের নামাজ বন্ধ রাখেন। কিন্তু তারিকা-ই-মহম্মদীয়ার সমর্থকেরা এই নামাজ পড়া ইসলাম বিরুদ্ধ মনে করেননি। সুতরাং ফরাজী আন্দোলনের সঙ্গে আরব দেশীয় ওয়াহাবি ও তারিকা-ই মহম্মদীয়া আন্দোলনের মিল ও অমিল কি কি বিষয়ে ছিল তা মনে না রাখলে এইসব আন্দোলনের প্রভাব যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, তারিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলনকে ওয়াহাবি আন্দোলনের ভারতীয় সংস্করণরূপে উল্লেখ করা কতটা ইতিহাস সম্মত এই নিয়ে বির্তকের অবকাশে আছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের

কয়েকজন গবেষক এই আন্দোলনকে ওয়াহাবি আন্দোলনরূপে উল্লেখ করার বিরোধিতা করেন। যদিও সকলের গ্রহণযোগ্য কোন নামকরণ তাঁরা করতে পারেননি। তাঁদের মতে, সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাইল প্রবর্তিত আন্দোলনকে ইউরোপীয়, গবেষকেরাই 'ভারতের ওয়াহাবি আন্দোলন' নামে উল্লেখ করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টে 'ওয়াহাবি মামলা' চলাকালীন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের ওয়াহাবি নামে উল্লেখ করায় আপত্তি করেন। তাঁরা বলেন, মুহম্মদ বিন আবদুল ওহ্হাব তাঁদের নেতা নন। সৈয়দ আহমদ প্রবর্তিত আন্দোলন আরব দেশের ওয়াহাবি আন্দোলন থেকে উদ্ভূত নয়। তাই এই বিষয়ে হাণ্টারের বক্তব্য অনেকের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আরব দেশের ওয়াহাবি আন্দোলনের সঙ্গে সৈয়দ আহমদ প্রবর্তিত ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পার্থক্যের কথা মনে না রেখে এবং সঠিক সময়কাল উল্লেখ না করে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন গবেষক এমনভাবে বিষয়টি আলোচনা করেন যার ফলে এই আন্দোলনের সঠিক রূপ বোঝা কষ্টকর হয়।[৫৩]

কিভাবে তারিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলন গ্রাম বাংলায় প্রসারিত হয়, তা এবার আলোচনা করা যাক। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ কলকাতার পথে পাটনা অবস্থান করেন। সেখানে বহু সংখ্যক মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় তিনি পাটনা কেন্দ্রে তাঁর শিষ্যদের পরিচালনার জন্য পাটনার মওলানা বিলায়েত আলিকে ডেপুটি বা খলিফা পদে নিযুক্ত করেন। তাছাড়া পাটনায় তাঁর গ্রুপের পরিচালনার জন্য একটি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাও তিনি প্রবর্ত্তন করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে সৈয়দ আহমদ কলকাতায় আসেন। তখন কলকাতার বড় মসজিদের নাম ছিল কিতাবউদ্দীন সরকারের মসজিদ। এই মসজিদেই সৈয়দ আহমদ অবস্থান করেন।[৫৪] কলকাতার মুসলিম সমাজ তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানান ও সাগ্রহে তাঁর ভাষণ শোনেন। এখানে তিনি

খুবই সাফল্য ও জনপ্রিয়তার লাভ করেন। অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিন মাস কলকাতায় থাকার পর তিনি মক্কাশরীফ রওনা হন।[৫৫]

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সৈয়দ আহমদ ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। তিনি কয়েকদিন বোম্বেতে থাকেন এবং সেখানে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারপরে ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশ সফর করে তিনি পুনরায় কলকাতায় আসেন। এখানেই তিনি তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে জেহাদের শেষ পরামর্শ করেন। তাঁর সমর্থকদের একটি সুশৃঙ্খল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ করে তিনি পাটনা ও গোয়ালিয়র হয়ে বেরিলীতে ফিরে যান। সৈয়দ আহমদ বলেন, যেহেতু ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' (শত্রুর দেশ) সেজন্য প্রকৃত মুসলমানের কর্তব্য হল অ-মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা অথবা কোন মুসলিম শাসিত দেশে চলে যাওয়া। বিধর্মী শিখ ও ইংরেজকে পরাজিত করে ওয়াহাবিদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে পুনরায় মুসলিম রাজত্ব ('দারুল ইসলাম') প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল সৈয়দ আহমদের লক্ষ্য। যদিও কতগুলো অনিবার্য কারণে তাঁদের ইংরেজ শাসনের অধীনে থাকতে হচ্ছে, তাহলেও এই শাসনকে উচ্ছেদ করার জন্য তাঁদের যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তিনি একথাও অনুভব করেন যে, ইংরেজ ব্যবসায়ীরাই হল ভারতের স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায়। এই উদ্দেশ্য সাধনে সৈয়দ আহমদ দেশীয় রাজ্যসমূহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই মর্মে তিনি রাজা হিন্দু রায় নামক একজন মারাঠা চীফকে পত্র লেখেন।[৫৬] সৈয়দ আহমদ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক শিবির স্থাপন করেন। তিনি অনুগামীদের নিয়ে মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় সামরিক শিক্ষা দেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত করলেও তিনি প্রথমেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করে পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা

করেন। তিনি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর একটি পুস্তিকায় এই জেহাদ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, শিখরাজ্যে মুসলমানদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হচ্ছে, যথা—সেখানে মুসলমানেরা স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়তে পারেন না, গো-বধ নিষিদ্ধ, মুসলিম মেয়েদের ধর্মান্তকরণ করা হচ্ছে এবং মুসলিম-শিখ বিবাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এইসব কারণে শিখরাজ্যের মধ্য দিয়ে মক্কায় হজ করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং অত্যাচারী শিখরাজ্যের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করে মুসলমানদের মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।[৫৭]

এই ধর্মযুদ্ধকে সফল করার জন্য সৈয়দ আহমদের অনুগামীরা ভারতের সর্বত্র তৎপর হন। তাঁর কয়েকজন শিষ্য প্রচার অভিযানে বিভিন্ন স্থান সফর করেন। উত্তর প্রদেশের জৌনপুরের কেরামত আলি ও পাটনার এনায়েত আলি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রচার চালিয়ে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেন। এনায়েত আলির ভ্রাতা বেলায়েত আলি মধ্যভারত, হায়দ্রাবাদ ও বোম্বেতে প্রচার চালান। এই সময়ে পাটনাতে 'জেহাদ ফাণ্ড' গঠন করা হয়। সেই ফাণ্ডে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানেরা অর্থ দান করেন। দাক্ষিণাত্যের মুসলিম মহিলারা তাঁদের অলঙ্কার বিক্রি করে অর্থ এই ফাণ্ডে প্রেরণ করেন। প্রথমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের প্রদেশগুলো থেকে সৈয়দ আহমদের সমর্থকেরা মুজাহিদ হলেও, ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ ও বিহার থেকে মুসলমানেরাও মুজাহিদ হন। দীর্ঘকাল ব্রিটিশ শাসনে বাংলাদেশে ও বিহারে শান্তি বিরাজ করায় শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে এই অঞ্চলের মুসলমানদের অনু-প্রাণিত করতে একটু সময় লাগে। কিন্তু সৈয়দ আহমদের শিষ্যদের প্রচারের ফলে বাঙালী মুসলমানেরা আত্মসচেতন হন এবং এই আন্দোলনে তাঁদের প্রভাব অনুভূত হয়।[৫৮]

একই সময়ে বাংলাদেশে তিতুমীর কি ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তা

আলোচনা করা যাক। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে মীর নিসার আলির (তিতুমীর) জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল মীর হাসান আলি ও মাতার নাম আবেদা রোকাইয়া খাতুন। নিসার আলির বয়স যখন সাড়ে চার বৎসর তখন তাঁর পিতা-মাতা পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা চব্বিশ পরগণার হায়দারপুর গ্রামের বিখ্যাত উস্তাদ মুনশী লাল মিঞাকে নিসার আলিকে আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষা ও সেরপুর গ্রামের পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্যকে বাংলাভাষা ও ধারাপাত শিক্ষা দেবার জন্য নিযুক্ত করেন। নিসার আলির তিতুমীর নামে পরিচিত হবারও একটি কাহিনী আছে। তখন গ্রামে জ্বর-জারি হলে দেশীয় গাছ-গাছড়া থেকে রস প্রস্তুত করে রোগীকে খাওয়ানো হত। নিসার আলির বয়স যখন পাঁচ-ছয় বৎসর তখন তাঁর জ্বর হয় এবং বাড়ির লোকেরা গাছ-গাছড়া থেকে যে রস প্রস্তুত করে নিসার আলিকে দেয় তা অস্বাভাবিক তিক্ত ছিল। কিন্তু নিসার আলি বিনা আপত্তিতে তা সেবন করত বলে তার নানী তাকে আদর করে 'তিতামিয়া' বলে সম্বোধন করতেন। এই 'তিতামিয়া' থেকে তিতুমীর নামের উদ্ভব। পরবর্তীকালে নিসার আলি তিতুমীর নামেই পরিচিত হন।[৫৯] তিতুমীরের প্রাথমিক শিক্ষা যখন লাল মিঞা ও রামকমল ভট্টাচার্যের নিকট সমাপ্ত হয় তখন চাঁদপুর গ্রামে বিহার শরীফ থেকে হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ নামে একজন শিক্ষাবিদের আগমন হয়। গ্রামের অভিভাবকেরা তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষক মনে করেন এবং তাঁরা চাঁদপুর ও হায়দারপুর গ্রামের মধ্যস্থলে এক মাদ্রাসা স্থাপন করে এই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকপদে হাফিজ নিয়ামত উল্লাহকে নিযুক্ত করেন। লাল মিঞা ও রামকমল ভট্টাচার্য যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। তিতুমীর এই মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন। দুই বৎসর কাল মাদ্রাসায় ছাত্রদের শরীয়তী ও তরীকতী শিক্ষাদানের পরে নিয়ামত উল্লাহ বিহার শরীফে যান। তখন তিতুমীরও তাঁর সঙ্গে যান ও

বিহারের ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানগুলো ভ্রমণ করেন। ছয়মাস পরে তিতুমীরসহ নিয়ামত উল্লাহ চাঁদপুর গ্রামে ফিরে আসেন। তিতুমীরের বয়স যখন অষ্টাদশ বৎসর তখন তাঁর কিতাব পড়া সমাপ্ত হয়। তিতুমীর ফারসি ব্যাকরণ শাস্ত্র, আরবি ফরায়েজ শাস্ত্র, আরবি দর্শন শাস্ত্র, ফারসি তসওফ শাস্ত্র, আরবি মান্তেক শাস্ত্র, আরবি ও ফারসি কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন এবং বাংলাভাষা ও অঙ্ক শাস্ত্রেও পারদর্শিতা অর্জন করেন। আরবি, ফারসি ও বাংলা ভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মে এবং তিনি এই তিনটি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করায় তিতুমীর হাফিজরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।[৮০] এই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে যে শরীর-চর্চার আখড়া ছিল তাতে নিয়মিত চর্চা করে তিতুমীর এক কুশলী কুস্তীগির হন। তারপরে কলকাতায় এসে তিতুমীর কয়েকটি কুস্তী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন। কলকাতার শ্রেষ্ঠ পালোয়ান আরিফ আলিকে পরাজিত করায় তিতুমীরের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতায় থাকাকালীন তিতুমীরের মনে ধর্মভাব প্রবল হওয়ায় তিনি মুর্শিদের সন্ধান করতে থাকেন এবং অবশেষে এই উদ্দেশ্যেই মক্কাশরীফ গমন করেন।[৮১]

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ যখন মক্কায় ছিলেন তখন তিতুমীরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিতুমীর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নিজ জেলা চব্বিশ পরগণায় ফিরে এসে তিতুমীর ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে ধর্মসংস্কার আন্দোলন সুরু করেন। সৈয়দ আহমদ শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার পরে বাংলাদেশে তাঁর অনুগামীরা কেন জেহাদ ঘোষণা করেনি, এই প্রশ্ন নিয়ে এখনও বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি। সম্ভবতঃ তিতুমীর মনে করেন, বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাঁরা এখনও 'পাকা মুসলমান' হতে পারেননি। তাঁদের খাঁটি মুসলমানে পরিণত করবার পূর্বে জেহাদ ঘোষণা করলে বিপজ্জনক হবে।

সুতরাং ইসলামীয়করণের কাজ সম্পন্ন করার পূর্বে তিনি কোন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে চাননি। তিনি প্রকাশ্যে জেহাদ ঘোষণা না করে বাংলাদেশ থেকে গোপনে সৈয়দ আহমদকে সকল প্রকার সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সম্ভবতঃ কেরামত আলিও এই মতের সমর্থক ছিলেন।[৬২]

প্রথমে তিতুমীর নিজগ্রাম চাঁদপুরে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন, নামাজ পড়া, রোজা রাখা, আরব দেশের মুসলমানদের মত ইসলামীধরনের নাম রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছোট করা, ঈদুল আজহার কোরবানি করা ও আকীকা কোরবানি করা, আল্লাহ্‌র উপাসনার জন্য মসজিদ প্রস্তুত করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তা না হলে মহা গুনাহ্‌ হবে। যারা অমুসলমানদের প্রভাবে এইসব কার্য পরিহার করবে তাদের আল্লাহ্‌ কঠোর শাস্তি দেবেন। তিতুমীর আরও বলেন, কথা-বার্তায় ও আচার-ব্যবহারে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। এমনভাবে নাম রাখতে হবে যাতে সহজেই বোঝা যায়, এই ব্যক্তি একজন মুসলমান। তিতুমীর মসজিদ নির্মাণ করেন ও জুম্মার নামাজ পড়বার ব্যবস্থা করেন।[৬৩]

অবশ্য তিতুমীর একথাও বলেন যে, কেবলমাত্র ধর্মের ব্যবধানের জন্য অ-মুসলমানের সঙ্গে বিবাদ করা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয় এবং দুর্বল অমুসলমানকে সাহায্য করা মুসলমানের কর্তব্য। তিতুমীর বলেন : "ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম। যাহারা মুসলমান নহে, তাহাদের সহিত কেবল ধর্মে ব্যবধানের জন্য অহেতুক বিবাদ করা আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রসূল পছন্দ করেন না, বরং আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন, কোন প্রবল শক্তিসম্পন্ন অমুসলমান যদি কোন দুর্বল অমুসলমানকে তাহার ন্যায়সঙ্গত দাবী অগ্রাহ্য করিয়া তাহার প্রতি অন্যায় জুলুম ও অবিচার করে মুসলমানেরা সেই দুর্বলকে সাহায্য করিতে বাধ্য।"[৬৪] সরফরাজপুর গ্রামের অধিকাংশ মুসলমান যখন প্ররোচিত হয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধে

অবতীর্ণ হয় তখন কয়েকজন মুসলমানের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তিতুমীর ঐ গ্রামে গিয়ে জুম্মার নামাজের পরে হিন্দু-মুসলমানকে সম্বোধন করে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।[৬৫]

তিতুমীর সুবক্তা ছিলেন। চাঁদপুর-হায়দারপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় তাঁর বক্তৃতা শুনতে অনেক হিন্দু-মুসলমান যোগদান করেন। তাঁর বিভিন্ন ভাষণের আলোচ্য বিষয় ছিল : ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, হজরত মহম্মদের নির্দেশ পালন করা, হিন্দু কৃষকদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার দমন করা। প্রথমে এইসব বিষয় নিয়েই তিনি মুসলমানদের মধ্যে আলোচনা করে তাঁদের সচেতন করতে চেষ্টা করেন। গ্রামের দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলমানেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এমনকি জমিদারদের নির্যাতন থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেক হিন্দুও তাঁর দলে যোগদান করেন।[৬৬] কাজী দীন মুহম্মদ লেখেন : "তিতুমীরের চরিত্র, ধর্মনিষ্ঠা এবং দেশপ্রেম সম্বন্ধে সাধারণ মানুষেরা যে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করত. তার কিছু আভাস বিহারীলাল সরকারের সংগৃহীত 'সজন গাজীর গানে' পাওয়া যায়।"[৬৭] নিজধর্মের প্রতি তিতুমীরের যেমন প্রবল অনুরাগ ছিল, তেমনি নিজ সম্প্রদায়ের ওপরও তাঁর গভীর মমতা ছিল। বহুগুণসম্পন্ন তিতুমীর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিহারীলাল সরকার লেখেন : "তিতু আপন ধর্মমত প্রচার করিতেছিল। সে ধর্মমত প্রচারে পীড়ন তাড়ন ছিল না। লোকে তাহার বাগ্-বিন্যাসে মুগ্ধ হইয়া, তাহার প্রচারে স্তম্ভিত হইয়া, তাহার মতকে সত্য ভাবিয়া, তাহাকে পরিত্রাতা মনে করিয়া, তাহার মতাবলম্বী হইয়াছিল এবং তাহার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। তিতু প্রথমে শোনিতের বিনিময়ে প্রচার সিদ্ধি করিতে চাহে নাই। জমিদার কৃষ্ণদেব জরিমানার ব্যবস্থায় তাহার শান্ত প্রচারে হস্তক্ষেপ করিল।"[৬৮] এইভাবে প্রথমে ধর্মসংস্কার আন্দোলনরূপে সুরু হলেও ক্রমান্বয়ে এই আন্দোলন হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে

মুসলমান কৃষকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। লক্ষণীয় এই যে, হানাফি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান কৃষকদের ধর্মীয় আচরণ-বিধি সমালোচনা করায় তাঁরা তিতুমীরের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না।[১১] যেহেতু তিতুমীরের সংগ্রাম মূলতঃ হিন্দু-জমিদারদের বিরুদ্ধে ছিল সেজন্য জমিদারেরা এই আন্দোলন দমনে সচেষ্ট হন। তিতুমীরের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করবার অভিপ্রায়ে বিক্ষুব্ধ হানাফি মুসলমান কৃষকদেরও জমিদারেরা কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। তারাগুনিয়ার জমিদার রামনারায়ণ, নগরপুরের গৌর-প্রসাদ চৌধুরী এবং পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এই আন্দোলন দমনে অগ্রসর হন। তাঁদের মধ্যে পুঁড়ার জমিদার ও নীলকর কৃষ্ণদেব রায় প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। তাঁর জমিদারীর মুসলমান প্রজারা যাতে তিতুমীর প্রচারিত ধর্মমত গ্রহণ না করে সেজন্য কৃষ্ণদেব রায় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তিনি মুসলমান প্রজাদের তিতুমীরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন। তিনি তাদের বলেন, তিতুমীর ওয়াহাবি ধর্মে তাদের দীক্ষিত করে হজরত মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম থেকে তাদের বিচ্যুত করার চেষ্টা করছে। সুতরাং তিনি তাদের সতর্ক করে দেন। তাছাড়া কৃষ্ণদেব রায় হুকুম জারি করেন: "(১) যাহারা তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অহাবী হইবে, দাড়ি রাখিবে, গোঁফ ছাটিবে, তাহাদের প্রত্যেককে ফি দাড়ির উপর আড়াই টাকা ও ফি গোঁফের উপর পাঁচ সিকা খাজনা দিতে হইবে। (২) মসজিদ প্রস্তুত করিলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশত টাকা ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা জমিদার সরকারে নজর দিতে হইবে। (৩) পিতা-পিতামহ বা আত্মীয়স্বজন সন্তানের যে নাম রাখিবে, সে নাম পরিবর্তন করিয়া অহাবী মতে আরবী নাম রাখিলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হইবে। (৪) গো-হত্যা করিলে হত্যাকারীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া দেওয়া হইবে, যেন সে

ব্যক্তি আর গো-হত্যা করিতে না পারে। (৫) যে ব্যক্তি অহাবী তিতুমীরকে নিজ বাড়িতে স্থান দিবে তাহাকে তাহার ভিটা হইতে উচ্ছেদ করা হইবে।"[১০]

এই পাঁচদফা হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তিতুমীর কৃষ্ণদেব রায়কে যে পত্র দেন, তা উল্লেখযোগ্য :

"বঃ জনাব বাবু কৃষ্ণদেব রায় জমিদার মহাশয় সমীপে—
পুঁড়ার জমিদার বাড়ী।

মহাশয়! আমি আপনার প্রজা না হইলেও আপনার স্বদেশবাসী। আমি লোকপরম্পরায় জানিতে পারিলাম যে, আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমাকে অহাবী বলিয়া আপনি মুসলমানদিগের নিকট হেয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনি কেন এইরূপ করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারা মুশকিল। আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নাই। যদি কেহ আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে উত্তেজিত কবিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার উচিত ছিল সত্যের সন্ধান করিয়া হুকুম জারী করা। আমি দীন ইসলাম জারী করিতেছি। মুসলমানদিগকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিতেছি। ইহাতে আপনার অসন্তোষের কি কারণ থাকিতে পারে? যাহার ধর্ম সেই বুঝে। আপনি ইসলাম ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। অহাবী ধর্ম নামে দুনিয়ায় কোন ধর্ম নাই। আল্লাহ্‌র মনঃপূত ধর্মই ইসলাম। ইসলাম শব্দের অর্থ হইতেছে শান্তি। একমাত্র ইসলাম ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্মই জগতে শান্তি আনয়ন করিতে পারে না। ইসলামী ধরনের নাম রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছোট করা, ঈদুল আজহার কোরবানি করা ও আকীকা কোরবানি করা মুসলমানদিগের উপর আল্লাহ্‌র ও আল্লাহ্‌র রসূলের আদেশ। মসজিদ প্রস্তুত করিয়া আল্লাহ্‌র উপাসনা করাও আল্লাহ্‌র হুকুম। আপনি ইসলাম ধর্মের আদেশ, বিধি-নিষেধের

উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমি আশা করি, আপনি আপনার হুকুম প্রত্যাহার করিবেন। ফকৃত—

হাকির ও না-চিজ—
সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।"[৭১]

তিতুমীরের এই পত্র আমিনুল্লাহ নামে তাঁর এক শিষ্য কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট বহন করে নিয়ে যান। জমিদারের হুকুমে তাঁকে গারদে ঢোকানো হয় এবং সেখানেই তিনি মারা যান। এই ঘটনায় তিতুমীরের সমর্থকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং আমিনুল্লাহকে তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলনের প্রথম শহীদরূপে উল্লেখ করা হয়। কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে তিতুমীরের বিরোধ জটিলরূপ ধারণ করায় গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় ও গোবর-ডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় উদ্যোগী হয়ে তিতুমীরকে দমন করার জন্য কলকাতায় লাটুবাবুর বাসভবনে একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন লাটুবাবু (কলিকাতা), কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (গোবরডাঙ্গা), দেবনাথ রায় (গোবরা-গোবিন্দপুর), নূরনগরের জমিদারের ম্যানেজার, টাকীর জমিদারের সদর নায়েব, রানাঘাটের জমিদারের ম্যানেজার, কৃষ্ণদেব রায় (পুঁড়া), রাম রাম চক্রবর্তী (বসিরহাট থানার দারোগা), দুর্গাচরণ চন্দ্র চৌধুরী (যদুরআটি) প্রভৃতি।[৭২] এই সভায় তাঁরা কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা কৃষ্ণদেব রায়কে সাহায্য করে এবং ইউরোপীয় নীলকরদের ও খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সাহায্য নিয়ে তিতুমীরকে দমনের চেষ্টা করেন। উপরন্তু তাঁরা প্রচারের মাধ্যমে তিতুমীরের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেন। এই সভার পরে কৃষ্ণদেব রায় তাঁর পূর্বের হুকুমনামা কার্যকরী করার জন্য আরও সক্রিয় হন। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটানা সংঘর্ষ চলে। কৃষ্ণদেব রায় পুঁড়াতে তিতুমীরের অনুগামীদের

নিকট হতে কর আদায়ে সমর্থ হলেও সরফরাজপুর গ্রামে (চাঁদপুর থেকে সরফরাজপুর প্রায় ছয় ক্রোশের ব্যবধান) প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। এই অবস্থায় কৃষ্ণদেব রায় এক সেনাবাহিনী সহ সরফরাজপুর গ্রাম আক্রমণ করেন এবং তিতুমীরের দলের সঙ্গে সংঘর্ষের সময়ে একটি মসজিদ অগ্নিদগ্ধ হয়। কয়েকটি বাড়ি লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হয়, এবং কয়েকজন আহত হয়। সদর্পে কৃষ্ণদেব রায় তাঁর সেনাবাহিনী সহ পুঁড়ায় ফিরে যান। এই আক্রমণের খবর প্রচারিত হবার পরে ঐ অঞ্চলের মুসলমানেরা খুবই উত্তেজিত হন। বসিরহাটের দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী পুঁড়ার জমিদারের পক্ষ অবলম্বন করেন। ফলে, সরফরাজপুর গ্রামের দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বারাসত কোর্টে যে মামলা-মোকদ্দমা হয়, বারাসতের জয়েণ্ট ম্যাজিস্টেট রামরাম চক্রবর্তীর রিপোর্টের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তা ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর ডিস্‌মিস্‌ করেন। বারাসত আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করার জন্য তিতুমীর কলকাতা যান। কিন্তু সেখানে জজ সাহেবের প্রত্যাবর্তনের সঠিক সময় জানতে না পেরে (তিনি বাইরে ছিলেন) তিতুমীর বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। ইংরেজ আদালতে সুবিচার না পাওয়ায় তিতুমীর ক্ষুব্ধ হন।[৭৩]

অক্টোবর মাসের প্রথমেই তিতুমীর তাঁর সমর্থকদের নিয়ে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে সমবেত হন। এই গ্রামের অর্থবান ব্যক্তি ও তিতুমীরের শিষ্য ময়েজউদ্দীন তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেন। তিতুমীরের সেনাবাহিনীর নেতা শেখ গোলাম মাসুম অনেকখানি জায়গা বাঁশ দিয়ে দৃঢ়ভাবে ঘিরে ফেলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে মিস্‌কীন শাহ নামে একজন ফকীর তিতুমীরের দলে যোগ দেন। প্রকৃতপক্ষে তিতুমীর, মিসকীন শাহ ও গোলাম মাসুম আন্দোলনের মূল পরিচালক হন। নারিকেলবাড়িয়ায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তিতুমীরের দল পুঁড়া গ্রাম আক্রমণ করে গো-বধ ও

হিন্দুদের অসম্মানিত করে ওখানে সবাইকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ নভেম্বর সকালে তারা পুঁড়া গ্রামে প্রবেশ করে প্রকাশ্যে একটি গরু বধ করে তার রক্ত হিন্দু মন্দিরের দেয়ালে লাগিয়ে দেয় এবং সেখানে গরুর মাংস ঝুলিয়ে রাখে। তাদের সামনে যেসব দোকান ছিল তার জিনিষপত্র তারা নিয়ে যায় এবং একজন ব্রাহ্মণ ও নীলকুঠির সহকারীকে আহত করে। এই অভিযানের সাফল্যে আত্মহারা হয়ে তিতুমীরের দল ঘোষণা করে, ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটেছে এবং যে মুসলমানদের নিকট হতে ক্ষমতা ইংরেজ শাসকেরা ছিনিয়ে নেয় এখন তাঁরাই হলেন এই দেশের প্রকৃত শাসক। গোলাম মাসুম সামরিক কায়দায় এই দলকে পরিচালনা করেন।[৭৪] তারপরে তারা নদীয়া জেলার লাঘট্টা গ্রামে একই ধরণের আক্রমণ চালায়। এই গ্রামের হিন্দুরা প্রতিরোধের চেষ্টা করলে তাঁদের মধ্যে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হন। হিন্দু জমিদারের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ বিরোধ থাকলেও এমনভাবে তিতুমীরের দলের অভিযান পরিচালিত হয় যার ফলে এই সব স্থানের সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ই আক্রান্ত হয়। ৮ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত তিতুমীর ও তাঁর সমর্থকেরা একটানা কয়েকটি স্থানে গো-বধ করে, গ্রাম লুট করে, কৃষকদের শস্য দিতে ও তাদের মত গ্রহণ করতে বাধ্য করে। লাঘট্টা গ্রামে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করার পরে তারা শেরপুর গ্রাম আক্রমণ করে। নিতান্তই ব্যক্তিগত কলহের জন্য তারা শেরপুরে এক মুসলিম ফকিরের বাড়ি আক্রমণ করে এবং জোর করে তাঁর দুমেয়েকে বিয়ে দিতে বাধ্য করে।[৭৫]

তিতুমীরের মনোভাব জানতে পেরেই ২৩ অক্টোবর (১৮৩১ খ্রী) কৃষ্ণদেব রায় বসিরহাট থানার সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং বারাসত আদালতে আবেদন করেন। তিতুমীরের দলের আক্রমণাত্মক অভিযানের ফলে নীলকরেরাও শঙ্কিত হয়ে সরকারের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তারা সরকারী কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে এবং

একজন ইউরোপীয় নীলকরের ওপর অর্থকর ধার্য করে। যেসব মুসলমানেরা তাদের মত গ্রহণ করেননি তাদের দমন করা হয় এবং তাদের মত আচরণবিধি অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয়। এমনকি কিছু সংখ্যক হিন্দুদের জাতিচ্যুত করা হয়। অবশেষে তারা বসিরহাটের জমিদারের সমর্থক হিন্দু দারোগাকে হত্যা করে। তার ফলে সমগ্র নারিকেলবাড়িয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় অধিবাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে শহরের দিকে পলায়ন করেন।[৭৬]

প্রথমদিকে তিতুমীর প্রতাপশালী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কথা বলেননি। কিন্তু জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে তিতুমীরের সংঘর্ষের ফলে ও গ্রামাঞ্চলের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ায় তিতুমীরকে দমন করতে ইংরেজ কোম্পানী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। আদালতে সুবিচার না পাওয়ায় এবং হিন্দু জমিদার ও হিন্দু দারোগার মধ্যে হৃদ্যতা লক্ষ্য করায় তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলনে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত হতে থাকে। সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার পরে এই মনোভাব আরও প্রবল হয়। তাদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় : ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কেউ সহযোগিতা করবে না, তাদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করবে না এবং তাদের কোর্ট-কাছারিতে বিচারের জন্য যাবে না। এই ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এতটা ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, ইংরেজ সরকারকে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করে এই আন্দোলন দমন করতে হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর তিতুমীর ও তাঁর কয়েকজন অনুগামী যুদ্ধে নিহত হন। নারিকেলবাড়িয়াতে তিতুমীরের দলের সেনাপতি শেখ গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দেওয়া হয়। অনেক বন্দীকে কারাদণ্ড দেওয়া হয় ও কয়েকজনকে দ্বীপান্তরে নির্বাসিত করা হয়। হিন্দুজমিদারের পক্ষপাতী কয়েকজন মুসলমান তিতুমীরের সমর্থক বন্দীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। ঐ অঞ্চলের মুসলমানেরা

এইসব মুসলমান সাক্ষীদের ও তাদের বংশধরদের মুসলিম সমাজে অস্পৃশ্য করে রাখেন।[৭৭]

অন্যদিকে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে সৈয়দ আহমদ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্বল্পকালের জন্য পেশওয়ার দখল করতে সমর্থ হলেও তিনি এই ধর্মযুদ্ধে শিখদের বিরুদ্ধে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। শিখেরা পুনরায় পেশওয়ার দখল করে এবং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দআহমদ নিহত হন।[৭৮]

তিতুমীরের ও সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর ফলে সাময়িকভাবে ওয়াহাবি আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু কয়েকজন নেতার প্রচেষ্টায় দ্রুত ওয়াহাবি মতবাদ ও সংগঠনের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ওয়াহাবিরা সক্রিয় হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সীতানায় ওয়াহাবিদের শিবির স্থাপিত হয় এবং এখান থেকেই প্রধান নেতা আন্দোলন পরিচালনা করেন। এই সীতানা শিবিরে মুজাহিদ (বা ধর্মযোদ্ধা) ও অর্থ প্রেরণের উদ্দেশ্যে কয়েকজন ওয়াহাবি প্রচারক বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সফর করেন। অপ্রকাশিত সরকারী সূত্র থেকে জানা যায়, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে পাটনার এনায়েত আলি, জৌনপুরের কেরামত আলি ও হায়দ্রাবাদের জৈনুদ্দীন বাংলাদেশে ওয়াহাবি মতবাদ প্রচার করেন। আর এই সময়ে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃত নেতা ছিলেন বেরিলীর পীর ইমাতা জিমামি।[৭৯] বাংলাদেশে সফররত এই তিনজন নেতা ও আরও কয়েকজন মোল্লা বারাসত, যশোহর, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় শিখদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেন এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থ ও ধর্মযোদ্ধা সংগ্রহের চেষ্টা করেন।[৮০] তাঁরা একথাও প্রচার করেন যে, সৈয়দ আহমদ এখনও জীবিত আছেন এবং তিনিই শিখদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করবেন। তাঁরা অচিরেই অনেক অর্থ সংগ্রহ করেন।[৮১] যাতে তাঁরা ইংরেজের মিত্র শিখদের

বিরুদ্ধে প্রচার সভা ও ধর্মযোদ্ধা প্রেরন করতে না পারেন তার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা জনসাধারণকে সাবধান করে দেন।[৮২] এই সময়ে প্রায় ৫০০। ৬০০ মুসলমান ওয়াহাবি প্রচারকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমনের জন্য প্রস্তুত হয়। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের কার্যাবলী লক্ষ্য করেন এবং তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি এই কাজে যে সব কর্মচারীদের নিয়োগ করেন তাদের নির্দেশ দেন, ওয়াহাবিদের ওপর প্রথমেই বলপ্রয়োগ না করে তাদের যেন বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের পক্ষে দেশত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে গিয়ে ধর্মযুদ্ধে যোগদান করা নির্বুদ্ধিতা হবে। অবশ্য তিনি এই নির্দেশও দেন যে প্রয়োজনে হলে বলপ্রয়োগ করে তাদের যেন এই পথ পরিহার করতে বাধ্য করা হয়। সরকারী সূত্রে আরও বলা হয়, পূর্ববঙ্গের জেলা গুলিতে ফরাজী-ওয়াহাবিদের সংখ্যা অনেক। তারা খুবই ধর্মান্ধ ও ঐক্যবদ্ধ, আর কয়েকজন বিশেষ নেতার দ্বারা পরিচালিত। তারা ব্রিটিশ শাসনেরও বিরোধী। সুতরাং তাদের ওপর সযত্নে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এও আশঙ্কা করা হয়, যদি কখনও এই অঞ্চলে কোন অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে তার সূত্রপাত হবে এইসব ধর্মীয় গ্রুপের দ্বারা। এই বিষয়ে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ এপ্রিল ঢাকা থেকে লোয়ার প্রভিন্সেসের সুপারিনটেনডেণ্ট অব পুলিশ ডব্লিউ. ডেমপিয়ার লেখেন : "The Muhammedan population in the Eastern Districts are all what is called Ferazees, that is Wahabees, strongly united together, very fanatic, under the control of particular leaders and inimical to our Government, and they require to be most carefully watched ; for if there is any danger of an outbreak in these provinces, it is from the excited religious fanaticism of this sect."[৮৩]

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল ডেমপিয়ার একটি নোটে লেখেন, এনায়েত আলি বাংলাদেশেরবিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণের কথা বলেন এবং অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের জন্য যাদের সমবেত করেন তাদের মুর্শিদাবাদের অফিসার এস. বি. লচ ওখানে প্রেরণ করা থেকে বিরত করেন। কয়েকজন ভারতীয় কর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান লচকে এই কাজে সাহায্য করেন। শিখদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ প্রচার করা হচ্ছে, এই অভিযোগ এনায়েত আলি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, বেরিলীতে পীরের দর্শনলাভের জন্য তাঁর অনুগামীরা রওনা হচ্ছিলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। এই নোটে ডেমপিয়ার লেখেন, এনায়েত আলি পাটনার পথে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন।[৮৪] কোন মুসলমান ভাগলপুর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে যাত্রা করেছে কিনা, এই খবর জানতে চেয়ে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেমপিয়ার ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে একখানি পত্র দেন। ভাগলপুর থেকে যেসব তথ্য পান তা ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল ডেমপিয়ার একটি নোটে উল্লেখ করেন। ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডেমপিয়ারকে জানান, বারাসত, যশোহর, ময়মনসিংহ ও রাজসাহী থেকে আগত প্রায় ৮০০—৯০০ মুসলমান এক একজন নেতার অধীনে ভাগলপুর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যাত্রা করেছে। তারা বলে যে তারা মক্কা যাচ্ছে।[৮৫]

১৩ এপ্রিলের (১৮৪৩ খ্রী) নোটে ডেমপিয়ার লেখেন, যে সমস্ত জেলায় ফরাজীদের প্রাধান্য সেখান থেকে অন্য গ্রুপের মোল্লারা চলে যাওয়ায় এইসব জেলা থেকে ধর্মযোদ্ধা গমন বন্ধ হয়ে যাবে। স্বভাবতই গণ্ডগোলের আশঙ্কাও থাকবে না। ডেমপিয়ার তাঁর নোটে একথাও লেখেন, এনায়েত আলি যেসব জেলাতে সফর করেন সেখানেই ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাব বিদ্যমান। নামাজ পড়া সম্পর্কে কেরামত আলি ও দুদু মিঞার মধ্যে মত পার্থক্য থাকায় তাঁদের অনুগামীরা ভিন্ন পথ অনুসরণ করে এবং তাদের মধ্যে তিক্ততা

বিরাজ করে। অন্যদিকে কেরামত আলি ও তুতু মিঞার অনুগামীরা এনায়েত আলি পরিচালিত ধর্ম-আন্দোলনে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে। বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেও ডেমপিয়ার বলেন, বাংলাদেশের মুসলমানদের মনোভাব লক্ষ্য করা প্রয়োজন।[৮৬]

ডেমপিয়ারের নিকট হতে কয়েকটি পত্র পেয়ে বাংলাদেশের ডেপুটি গবর্ণরের অভিমত বাংলাদেশ সরকারের সেক্রেটারী এফ. আই. হ্যালিডে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল ডেমপিয়ারের নিকট লিখিত পত্রে উল্লেখ করেন। তখন কেরামত আলি ঢাকা ছিলেন। সেজন্য এই পত্রে ডেমপিয়ারকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তিনি যেন কেরামত আলির সঙ্গে কথা বলে তাঁর প্রকৃত মনোভাব জেনে নেন। ডেপুটি গবর্ণরের মতে, কেরামত আলি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। অতএব তাঁকে যেন বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তাঁর সমর্থকেরা কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে তার দায়িত্ব তাঁকেও নিতে হবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে যাঁরা বিচক্ষণ তাঁরাও যেন তাঁদের জেলায় সফররত প্রভাবশালী নেতার নিকট একই ধরণের মনোভাব ব্যক্ত করেন। ইতিমধ্যে পুলিশকে নির্দেশ দিতে হবে তারা যেন এইসব অস্বাভাবিক জমায়েত গুলোর প্রতি ও মুসলমানদের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এই আন্দোলনের বিষয়ে সংবাদ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করার বিষয়েও পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়। অবশ্য একথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, এই আন্দোলনের প্রকৃতির কথা বিবেচনা করে যেন যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে এইসব দায়িত্ব পালন করা হয়। পরিশেষে বলা হয়, ডেমপিয়ার যেন এই আন্দোলনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং এই বিষয়ে নিয়মিত তথ্য ডেপুটি গবর্ণরের নিকট প্রেরণ করেন।[৮৭]

হ্যালিডের পত্র পেয়ে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ মে ডেমপিয়ার হ্যালিডেকে লেখেন যে, তিনি ঢাকায় কেরামত আলির সঙ্গে

কথাবার্তা বলেন। কেরামত আলি স্পষ্ট করেই বলেন, তাঁর সঙ্গে ফরাজীদের কোন সম্পর্ক নেই। বরঞ্চ অনেক বিষয়েই তাঁর সঙ্গে ফরাজীদের মতপার্থক্য আছে। ডেমপিয়ার এ কথাও বলেন, যে উত্তেজনা মুসলমানদের মধ্যে ছিল তা অনেকটা প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এনায়েত আলি ও তাঁর দলের মোল্লারা ধর্মযুদ্ধের তত্ত্ব প্রচার করেন এবং তার ফলে ৫০০।৬০০ মুসলমান ময়মনসিংহ, পাবনা, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি জেলা থেকে কয়েকটি 'কাফলা' (kafla) বা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে, একজন করে পৃথক নেতার অধীনে ভাগলপুর দিয়ে যাত্রা করে। তারা বলে যে, তারা মক্কা যাচ্ছে। এই চিঠিতে ভাগলপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টের সত্যতা প্রমাণিত হয়, তবে সংখ্যার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, ডেমপিয়ার তাঁর নোটে লেখেন, মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরে এক ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে। নারায়ণপুর গ্রামে মুসলমানদের সমবেত হবার কথা ছিল। এই গ্রামের মুসলমানেরা তাদের দৃঢ়তা, একতা ও ধর্মান্ধতার জন্য খ্যাত ছিল। তাই স্থানীয় পুলিশকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা যেন তাদের সঙ্গে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করে। ইতিমধ্যে একটি জেলাতে কয়েকজন মুসলমান অফিসারকে এইসব মতবাদ সমর্থন করার জন্য সরকারী কর্ম থেকে বহিষ্কার করা হয়।[৮৮] যে সব জেলায় ফরাজী-ওয়াহাবিরা প্রভাবশালী ছিল সে সব জেলা ডেমপিয়ার সফর করেন। তিনি মনে করেন, সতর্কতা অবলম্বনের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটদের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার ফলে বর্তমানে কোন গোলযোগ হবার সম্ভাবনা নেই। যদিও ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও যশোহর জেলার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।[৮৯]

ওয়াহাবি খলিফাদের প্রচারের ফলে সুদূর ত্রিপুরা-সিলেটসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা, পাটনা, বেনারস, কানপুর, দিল্লি, থানেশ্বর, আম্বালা, অমৃতসহর, ঝিলাম, রাওয়ালপিণ্ডি, আটক, পেশওয়ার

ইত্যাদি স্থানে এই দলের কার্যালয় স্থাপিত হয়। তাছাড়া বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদেও ওয়াহাবি মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে যোগদান করে। এমনকি হায়দ্রাবাদের শাসকের ভ্রাতা নবাব মুবারিজ উদদৌল্লা ওয়াহাবি দলভুক্ত হন। ১৮৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে একটি কমিশন হায়দ্রাবাদ রাজ্য ও ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করে। মুবারিজ উদদৌল্লাকে গোলকুণ্ডা দুর্গে বন্দী করা হয় এবং সেখানেই ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দশজন প্রধান সহযোগীকেও দশ বৎসরের অধিক কারাগারে আবদ্ধ রাখা হয়।[২০]

একদল স্থায়ী ওয়াহাবি প্রচারক ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান সফর করে বেড়ায়। এই দল পরিচালনার জন্য জেলা কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে ওয়াহাবিদের প্রধান কেন্দ্র সীতানার দূরত্ব দু-হাজার মাইল হলেও এক চমৎকার গুপ্ত সংগঠন মারফত সব কাজ সুসম্পন্ন হত। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অর্থ ও সভ্য সংগ্রহ করে সীতানাতে প্রেরণ করা হত। এতই সুচারুরূপে ও গোপনীয়তা অবলম্বন করে ওয়াহাবি সংগঠন পরিচালিত হত যে, ব্রিটিশ সরকার অনেক চেষ্টা করেও তাদের বিষয়ে কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেনি। সীতানা শিবিরে ওয়াহাবিদের যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গুপ্তচর নিযুক্ত করা হয়। গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে ওয়াহাবি সংগঠনের খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই দলের সভ্যরা এক ধরণের 'গুপ্তভাষা' ব্যবহার করত। সুতরাং এক সুশৃঙ্খল-সুসংগঠিত কাঠামো তৈরি করে এই দলকে পরিচালনা করা হয়।[২১]

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর পাঞ্জাবের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে সিন্ধু নদীর বাম তীরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ওয়াহাবিরা প্রাধান্য স্থাপন করে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব স্থাপনের পর ওয়াহাবিদের সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয়।

তখন থেকে ওয়াহাবি আন্দোলন ব্রিটিশ-বিরোধী রূপ ধারণ করে। তারা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুতি সুরু করে। ওয়াহাবি প্রচারকেরা জনসাধারণকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকে এবং সবাইকে ব্রিটিশ-বিরোধী পবিত্র যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান জানায়। আর যারা প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না তাদের সরকারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলা হয়।[১২]

এই সময়ে পাটনার বেলায়েত আলি ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রধান নেতা মনোনীত হন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বেলায়েত আলি সীতানা যাত্রা করেন। তিনি পথে বিভিন্ন শহরে জেহাদের কথা প্রচার করতে করতে অগ্রসর হন। তিনি দুমাস দিল্লিতে থাকাকালীন মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহর নিকট ওয়াহাবি মতবাদ প্রচার করেন এবং সম্রাট এই মতবাদের প্রতি তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেন। অবশেষে তিনি সীতানাতে পৌঁছান। তাঁর ভ্রাতা এনায়েত আলিও সেখানে ছিলেন। এনায়েত আলি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'সামগ্রিক যুদ্ধ' (total war) ঘোষণা করতে বলেন। কিন্তু বেলায়েত আলি ভালো করে প্রস্তুতির পূর্বে এই পথ অনুসরণ করতে অসম্মত হন।[১৩] ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বেলায়েত আলির মৃত্যুর পরে এনায়েত আলি ওয়াহাবিদের অবিসংবাদী নেতা নিযুক্ত হন এবং তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে সচেষ্ট হন। এই সময়ে ওয়াহাবি প্রচারকেরা বাংলাদেশের ও বিহারের বিভিন্ন জেলায়, মীরাট, বেরিলী ও দিল্লিতে খুবই সক্রিয় হয়। পাটনা কেন্দ্রের ওয়াহাবি বিদ্রোহীরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহের বার্তা প্রচার করে। পাটনার বিখ্যাত ওয়াহাবি নেতা আহমদুল্লাহের নেতৃত্বে সাতশত সশস্ত্র ওয়াহাবি ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে কোন তদন্তে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। এমনকি পুলিশের সঙ্গেও বিদ্রোহীদের সংযোগ স্থাপিত হয়। তাছাড়া ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যেও বিদ্রোহের প্রচার চলে। ইতিমধ্যে

এনায়েত আলি সওয়াট-এর আখণ্ড এবং সীতানার সৈন্যদের সমর্থন লাভ করেন। তারপর তিনি ব্রিটিশ-অনুগত অম্বের শাসক জাহানদাদ খানকে আক্রমণ করে আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেন। কিন্তু অম্বের শাসক গোপনে ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের সাথে এক সংঘর্ষে ওয়াহাবিরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের নেতা করম আলি নিহত হন এবং এনায়েত আলি অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করেন। এই ঘটনার পর এনায়েত আলি তাঁর ভ্রাতার উপদেশ অনুযায়ী ভালো করে প্রস্তুতির পূর্বে ব্রিটিশ সৈন্যদের সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হবার পথ পরিহার করেন।[২৪] তখন দক্ষ সেনাবাহিনী গঠনের জন্য তৎপরতা দেখা যায় এবং মাঝে মাঝে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের দুর্গম স্থানে আক্রমণ চালিয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক রাত্রে এনায়েত আলি সীমান্তের উপজাতিদের সহায়তায় শেখজানা নামক স্থানে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার লেফটেনাণ্ট হর্নিকে আক্রমণ করেন এবং ওখানকার ব্রিটিশ শিবির বিধ্বস্ত করে সাফল্যের সঙ্গে লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ ফিরে আসেন।[২৫]

এই সময়ে এনায়েত আলি যখন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন ভারতবর্ষে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়। তারফলে ভারতবর্ষের ওয়াহাবি আন্দোলনের শক্তিশালী কেন্দ্র পাটনার সঙ্গে সীতানা কেন্দ্রের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় এবং পাটনা থেকে সাহায্য প্রেরণ বন্ধ হয়ে যায়। পাটনার ওয়াহাবি নেতা আহমদুল্লাহ ও মুহম্মদ হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সময়ে সীতানা শিবির থেকে ওয়াহাবিরা যাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে কোন যোগাযোগ না রাখতে পারে তার জন্য ব্রিটিশ সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তাছাড়া ওয়াহাবি নেতৃবৃন্দের পক্ষে এই বিদ্রোহের তাৎপর্য উপলব্ধি করতেও বিলম্ব হয়। তাঁদের ধারণা ছিল, এই বিদ্রোহ সিপাহীদের ব্যাপার মাত্র।

এইসব কারণে ১৮৫৭-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময়ে ওয়াহাবিরা দলগতভাবে এক সুস্পষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে না পারলেও, এই বিদ্রোহের সময়ে বিভিন্ন স্থানে তাদের ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যক্রমের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ব্যক্তিগতভাবে ওয়াহাবিরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং অনেক জায়গায় তারাই ছিল বিদ্রোহের নেতা। এই বিদ্রোহে দিল্লি, আগ্রা, হায়দ্রাবাদ ও পাটনা ইত্যাদি অঞ্চলে ওয়াহাবিদের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এই তথ্যও প্রকাশিত হয় যে, জয়পুর, ভোপাল ও হিসার থেকে বহু সংখ্যক ওয়াহাবি এই বিদ্রোহে যোগ দিতে দিল্লিতে প্রবেশ করে।[৭৬]

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এনায়েত আলির মৃত্যুর পরে বিহারের মাকসুদ আলি সীতানা ক্যাম্পের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই সীতানা কেন্দ্র ইংরেজের উদ্বেগের কারণ ছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ওয়াহাবি বিদ্রোহীদের ও তাদের সহযোগীদের ধ্বংস করবার জন্য প্রায় ষোলটি অভিযান প্রেরণ করে। তবুও ব্রিটিশ সরকার সফল হয়নি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সিডনী কটন পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে ওয়াহাবিদের আক্রমণ করেন এবং সীতানা অঞ্চলের জমি এই সর্তে পার্বত্য উপজাতিদের দেওয়া হয় যে, তারা ওয়াহাবিদের এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সীমান্তের অভ্যন্তরে আক্রমণ করতে দেবে না। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াহাবি নেতা মাকসুদ আলির মৃত্যুর পরে বেলায়েত আলির পুত্র আবদুল্লাহ সীতানায় ওয়াহাবিদের নেতা নির্বাচিত হন। আবদুল্লাহ প্রচণ্ডভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী অভিযান চালান এবং মুসলমানদের ইসলামের সেনাবাহিনীতে যোগদান করে ভারতবর্ষ জয় করতে বলেন। তখন আহমদুল্লাহ ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতবর্ষের ওয়াহাবি সংগঠনের পরিচালক ছিলেন। তিনি প্রচুর অর্থ ও বহু সংখ্যক মুজাহিদ সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের ওয়াহাবি শিবিরে প্রেরণ করেন। এই সময়ে ঐ অঞ্চলের কয়েকটি উপজাতি ও

সওয়াটের আখণ্ড ওয়াহাবিদের সঙ্গে যোগ দেয়। কিছুদিন হস্তচ্যুত হলেও ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ওয়াহাবিরা তাদের পুরাতন প্রধান কর্মস্থল সীতানা পুনরায় দখল করতে সমর্থ হয়। তখন ব্রিটিশ সরকার তাদের দমনের জন্য কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্যার নেভিল চেম্বারলেনের নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরিত হয়। কিন্তু ওয়াহাবিরা ও তাদের মিত্ররা প্রচণ্ড-ভাবে বাধা দেওয়ায় ইংরেজ সৈন্য চুমলা উপত্যকায় প্রবেশ করতে পারেনি। তারা ইংরেজ সৈন্যদের হটিয়ে দেয়। এই সংঘর্ষে ইংরেজ বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তাদের অনেকে আহত ও নিহত হয়। চেম্বারলেন আরও সৈন্য পাঠাবার জন্য জরুরী বার্তা পাঠান। এই সময়ে জেনারেল গারভোক সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নয় হাজার সৈন্যসহ ওয়াহাবিদের আক্রমণ করেন। তিনি লালোর নিকটে ও বোনার পর্বতের পাদদেশে বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন। কেবলমাত্র সামরিক শক্তি প্রয়োগে সফল না হয়ে ব্রিটিশ সরকার একই সঙ্গে সামরিক শক্তি প্রয়োগ ও কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কূটনীতি প্রয়োগ করে ব্রিটিশ সরকার উপজাতিসমূহের কনফেডারেসী ভেঙ্গে ফেলতে সমর্থ হয় এবং তার ফলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী সীতানা থেকে ৩৫ মাইল দূরবর্তী বিদ্রোহীদের কেন্দ্র মূলকা নামক গ্রামে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। স্বভাবতই সীতানা কেন্দ্রের ওয়াহাবিদের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন ওয়াহাবিদের মূল কেন্দ্র বিধ্বস্ত করা অনেকটা সহজ হয়।[২৭]

তারপরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়াহাবিদের প্রভাব সমূলে বিনাশ করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কয়েকটি গোপন পত্র থেকে ওয়াহাবিদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকার অনেক তথ্য সংগ্রহ করে। অনেক ওয়াহাবিকে বন্দী করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে পর পর কয়েকটি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়, যথা—

আম্বালা মামলা (১৮৬৪ খ্রী), পাটনা মামলা (১৮৬৫ খ্রী), মালদহ মামলা (সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ খ্রী), রাজমহল মামলা (অক্টোবর, ১৮৭০ খ্রী)এবং ওয়াহাবি মামলা (১৮৭০-৭১ খ্রী)। তাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে, তারা ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। এইভাবে বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রীয় বিচার অনুষ্ঠিত হয়। আম্বালা মামলায় বিচারে কয়েকজনকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। পাটনা মামলায় পাটনার নেতা আহমদুল্লাহর জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাঁকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়।[৯৮] আম্বালার ও পাটনার বিচারের পরেও ওয়াহাবিরা পুনরায় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সীতানায় বিদ্রোহ করে। আহমদুল্লার অবর্তমানে পাটনায় মৌলবী মুবারক আলি ওয়াহাবিদের নেতা হন। দিল্লির রাজপরিবারের রাজকুমার ফিরোজ শাহ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সীতানায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। এই সময়ে উপজাতিসমূহকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টাও হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে সীতানার বিদ্রোহ দমন করে।[৯৯] মালদহ মামলার বিচারে ওয়াহাবি নেতা মৌলবী আমিরুদ্দীনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় ও তাঁকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন মালদহের বিখ্যাত ওয়াহাবি নেতা রসিক মণ্ডলের পুত্র। বিচারের রায় ঘোষিত হবার পরে বৃদ্ধ রসিক মণ্ডল গর্বিতভাবে পুত্রকে হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে বলেন ঃ 'আমার পুত্র কখনও তাঁর বিশ্বাস পরিত্যাগ করেনি। এই নতুন মতবাদে তাঁর আস্থা যদি অবিচল থাকে তাহলে তিনি তাঁর পুত্রকে হারাতেও প্রস্তুত আছেন।'[১০০]

রাজমহল মামলার বিচারে ইসলামপুরের বিখ্যাত ওয়াহাবি নেতা ইব্রাহিম মণ্ডলকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। তিনি মালদহ, রাজসাহী, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার

ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। ইব্রাহিম মণ্ডল সততা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য এই অঞ্চলে এতই সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন যে, সরকারের পক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী গ্রহণ করা কষ্টকর হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটনের আদেশে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।[১০১]

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলকাতার কলুটোলার চর্মব্যবসায়ী আমির খান ও হাসমত দাদ খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করে পীর মহম্মদ মারফত সীতানা ক্যাম্পে প্রেরণ করতেন। এই মামলায় আরও চারজনকে অভিযুক্ত করা হয়। বহুদিন তাঁদের বিনাবিচারে কারারুদ্ধ রাখা হয়। এই মামলার বিচার ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পাটনায় সুরু হয় এবং ছয় মাস ধরে চলে। পাটনা থেকে কলকাতায় এই মামলা নিয়ে আসার জন্য যে আবেদনপত্র দাখিল করা হয় তা কলকাতা হাইকোর্ট অগ্রাহ্য করে। এই মামলায় প্রায় ১৩৬ জন সাক্ষী দেয়। বিচারে পাঁচজনকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। তাঁদের মুক্তির জন্য কলকাতা হাইকোর্টে আপীল করা হলে প্রধান বিচারপতি নর্মান তা অগ্রাহ্য করেন। ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ আমির খানকে নির্বাসিত করা না হলেও তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তি দেওয়ার কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।[১০২]

এইসব কঠোর ব্যবস্থার মাধ্যমে ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ওয়াহাবি আন্দোলন দমন করা হয়। কিন্তু কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনায় ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি কলকাতা টাউন হলের সামনে বিচারপতি নর্মানকে খুন করেন। আবদুল্লাহর সঙ্গে ওয়াহাবিদের সংযোগ ছিল, এই সন্দেহ করা হয়। কিন্তু এই বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আন্দামান

দ্বীপের পোর্টব্লেয়ারে শের আলি নামক এক নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত আফগান ভাইসরয় লর্ড মেয়োকে খুন করেন। শের আলির সঙ্গে ওয়াহাবিদের কোন যোগাযোগ ছিল কিনা সে বিষয়ে কোন সঠিক তথ্য জানা যায়নি। তবে ভারতীয় মুসলমানেরা শের আলিকে তাঁদের স্বার্থসংরক্ষণকারী শহীদরূপে বরণ করেন।[১০০]

(গ) বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ :–উপরে বর্ণিত সর্বভারতীয় ওয়াহাবি আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপ মনে রাখলে বাংলাদেশে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পরে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপের ভূমিকা বিশ্লেষণ সহজ হবে। সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পরে 'তারিকা-ই-মহম্মদীয়া' আন্দোলন প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যথা–(১) পাটনা স্কুল, (২) তাঐউনি আন্দোলন এবং (৩) আহল-ই-হাদিস।[১০৪]

(১) পাটনা স্কুল—পাটনা স্কুলের নেতা ছিলেন বেলায়েত আলি ও এনায়েত আলি। ১৮৩১ অথবা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এনায়েত আলি বাংলাদেশে এসে এই স্কুলের সমর্থকদের সংগঠিত করেন। যেহেতু বাঙালী মুসলমানেরা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল সেজন্য তিনি গ্রামাঞ্চলেই তাঁর প্রচার কেন্দ্রীভূত করেন। অসংখ্য গ্রাম সফর করে তিনি ইসলামের বাণী প্রচার করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যশোহরের হাকিমপুর গ্রামে তাঁর কেন্দ্র স্থাপন করেন। এখানে সপরিবারে এনায়েত আলি প্রায় ৩।৪ বৎসর বসবাস করেন। বিভিন্ন সরকারী সূত্র থেকে জানা যায়, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এনায়েত আলি ও তাঁর অনুগামীবৃন্দ মুসলমানদের এক সুশৃঙ্খল সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করে ও মুসলিম প্রাধান্য বিনাশকারীদের বিরুদ্ধে গ্রামবাংলার মুসলিম সমাজে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের তত্ত্ব প্রচার করে এক ধর্মীয় জাগরণ ঘটান। এইভাবে বাংলাদেশে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এনায়েত আলির আগমন তিতুমীরের প্রচেষ্টাকে শুধু পুনরুজ্জীবিত করেনি, একই সঙ্গে তিনি তারিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলনের কেন্দ্রীয়

তরঙ্গকে সুদূর গ্রামে পর্যন্ত পৌঁছে দেন। সীতানা ক্যাম্পের সঙ্গে সুদূর গ্রামাঞ্চলের যোগসূত্র কেন বজায় ছিল, তার প্রকৃত উত্তর পেতে হলে তারিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলনের প্রভাব মনে রাখা দরকার।[১০৫] কিন্তু এই দিক থেকে ভারতীয় গবেষকরা বিষয়টি বিশ্লেষণ করেননি।

(২) তাঐউনি আন্দোলন—সৈয়দ আহমদের শিষ্য জৌনপুরের কেরামত আলি (১৮০০-১৮৭৩ খ্রীঃ) ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই বাংলা-দেশের মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন সুরু করেন। শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে তিনি যে মত প্রচার করেন তার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে ফরাজীদের ও ওয়াহাবিদের (পাটনা স্কুল) পার্থক্য ছিল। কেরামত আলি যে সংস্কার প্রবর্তন করেন তাকে তাঐউনি আন্দোলন বলে। আরবি 'তাঐউন' (ta'aiyun) শব্দের অর্থ হল এক বা অভিন্ন করা। আর এই 'তাঐউন' থেকে 'তাঐউনি' (ta'aiyuni) শব্দের উদ্ভব, এবং যে ব্যক্তি একটি বিশেষ মতের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করেন তাঁকে তাঐউনি বলা হয়। তাঐউনি আন্দোলনকে 'রহি' (Rahi, ফারসি শব্দ 'rah' বা 'a path', 'রহ' বা 'পথ') নামেও অভিহিত করা হয়।[১০৬] অন্যান্য মুসলমান সংস্কারকদের মত কেরামত আলিও মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও অ-ইসলামীয় আচরণবিধির বিরোধিতা করেন। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে এইসব ত্রুটি লক্ষ্য করে তিনি তাদের খাঁটি মুসলমানে পরিণত করার চেষ্টা করেন। ফরাজী, পাটনা স্কুল ও আহল-ই-হাদিস মতের সমর্থকদের সঙ্গে কেরামত আলির মতের পার্থক্যও লক্ষণীয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকাকালীন ফরাজীরা জুম্মার ও ঈদের নামাজ বন্ধ করায় কেরামত আলি তাঁদের নিন্দা করেন। এই বিষয়ে পাটনা স্কুলের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল। কিন্তু পাটনা স্কুলের সমর্থকেরা চারটি স্বীকৃত সুন্নী স্কুলস অব লর (Four recognised Sunni Schools of Law)

কোন একটির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত থাকায় কেরামত আলি তাঁদেরও নিন্দা করেন। আবার এই বিষয়ে ফরাজীদের সঙ্গে কেরামত আলির মতের মিল দেখতে পাওয়া যায়। আরব দেশীয় ওয়াহাবিদের সঙ্গে ফরাজীদের ও পাটনা স্কুলের অভিন্নতার কথা উল্লেখ করে কেরামত আলি এই দুটো গ্রুপের সমালোচনা করেন।[১০৭]

এই দুটো গ্রুপের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালানো সত্ত্বেও তারা কেরামত আলির বিরুদ্ধে কোন যৌথ ফ্রন্টে মিলিত হয়ে তাঁর প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। বস্তুতঃ কেরামত আলি ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে এক বিতর্কের অবতারণা করেন এবং খুবই প্রবলভাবে প্রচার চালিয়ে বিভিন্ন গ্রুপের ধর্মীয় পার্থক্য তুলে ধরেন। সুতরাং বাংলাদেশে ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইসলামের যে পুনর্জাগরণ ঘটে তাতে প্রধানতঃ ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। যেভাবে প্রতিটি গ্রুপ নিজেদের মতের সপক্ষে বক্তব্য রাখে তাতে তাদের মধ্যে তিক্ততাও বৃদ্ধি পায়। এমন কি একবার কেরামত আলি ফরাজীদের দ্বারা আক্রান্তও হন।[১০৮] অবশ্য ফরাজী, পাটনা স্কুল, তাঐউনি ও পরবর্তীকালে আহল-ই-হাদিস একই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়; অর্থাৎ ইসলামীয়করণের প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলে।

(৩) আহল-ই-হাদিস—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাটনা স্কুলের একটি অংশ বেরিয়ে আসে ও তারা বাংলাদেশে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে। এই গ্রুপ আহল-ই-হাদিস নামে খ্যাত। এই গ্রুপ 'প্রফেটিক ট্রাডিশনের' সমর্থক ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাজী প্রভাবিত ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলায় তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই গ্রুপের চিন্তাধারা গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এক গণআন্দোলনের রূপ ধারণ করতে পারেনি। ফরাজীরা হানাফি স্কুলের সমর্থক হলেও

তাঁরা 'প্রফেটিক ট্রাডিশন' অনুসরণ করার বিরোধী ছিলেন না। সুতরাং ফরাজীদের সঙ্গে আহল-ই-হাদিস গ্রুপের কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়নি। অবশ্য আহল-ই-হাদিস গ্রুপ জুম্মা ও ঈদের নামাজ পড়ায় ফরাজী শাস্ত্রকারেরা তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন এমন ছু-একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাছাড়া ফরাজী ও আহল-ই-হাদিস গ্রুপ পরস্পরের প্রতি উদাসীন ছিল।[১০৯]

সুতরাং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের পরে বাংলাদেশে চারটি ধর্মীয় গ্রুপ সক্রিয় ছিল, যথা—(১) ফরাজী, (২) পাটনা স্কুল, (৩) তাঐউনি এবং (৪) আহল-ই-হাদিস। কিন্তু তাদের মধ্যে ধর্মীয় আচার-আচরণ নিয়ে বিরোধ ও মতপার্থক্য কখনই দূরীভূত হয়নি। যদিও তাদের মধ্যে একই আচরণ-বিধি প্রণয়ণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে ১৮৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতাতে ফরাজী নেতা শরীয়ত উল্লাহর সঙ্গে কেরামত আলির সাক্ষাৎকার ঘটে। এইভাবে তাঁদের মধ্যে বিরোধ-মীমাংসার প্রচেষ্টা সুরু হলেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌছুতে পারেননি। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কেরামত আলির সঙ্গে ছুদু-মিঞার সাক্ষাৎকার ঘটে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে ধর্মীয় আচার-আচরণ নিয়ে যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে কেরামত আলি ও ফরাজী নেতা মৌলবী আবতুল জব্বার কয়েকটি বিষয়ে একমত হতে পারেননি। আবার ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মাদারীপুরে কেরামত আলি ও নোয়া মিঞার মধ্যে বিতর্ক হয়। এই বিতর্কের বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দেও আর একটি সভা বসে। এই বিতর্কের অবসান না হলেও গ্রামবাংলার মুসলমানদের ওপর ধর্ম চেতনা কতটা প্রভাব বিস্তার করে তার পরিচয় বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপের কার্যাবলী ও ধর্মসভা থেকে পাওয়া যায়।[১১০]

এরমধ্যে প্রথম তিনটি গ্রুপের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক গণভিত্তি ছিল। আবার তাদের মধ্যে ফরাজী ও পাটনা স্কুল পরিচালিত ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন-

সমূহ যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়। ফরাজীরা ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' মনে করত। তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ফরাজী আন্দোলন মূলতঃ ধর্মীয় আন্দোলনরূপে বিরাজ করলেও ব্রিটিশ শাসনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ফরাজীরা একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এখন আর এই রাষ্ট্র 'দারুল হরব' নয়। সুতরাং পাকিস্তানে জুম্মার ও ঈদের নামাজ পড়তে হবে।[১১১] অবশ্য পাটনা স্কুল পরিচালিত আন্দোলনই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বিরোধী ওয়াহাবি আন্দোলনরূপে পরিচিত ছিল এবং ওয়াহাবিরাই দীর্ঘকাল ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করে ব্রিটিশ শাসনকে বিব্রত করে। কিন্তু কেরামত আলি বাংলাদেশে যখন তাঐউনি আন্দোলন পরিচালনা করেন তখন তিনি ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক মনোভাব যুক্ত করেননি। এমনকি তিনি একথাও বলেন, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনে 'দারুল হরব'-এ পরিণত হয়নি। অর্থাৎ পরিবর্তিত অবস্থাকে মেনে নিয়েই তিনি ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে সচেষ্ট হন এবং বাঙালী মুসলমানকে খাঁটি মুসলমানে পরিণত করতে চেষ্টা করেন।[১১২]

কেরামত আলি একজন পণ্ডিত ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর খ্যাতি বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর বাঙালী শিষ্যরাই তাঁর মতবাদ প্রচারে সক্রিয় হন। তিনি একজন সুদক্ষ সংগঠক ছিলেন। তিনি বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর একটানা নৌকোয় করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়ান। তাঁর মতবাদ সমগ্র বাংলাদেশের ও বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জের মুসলমানদের ওপর অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি আসামের নাগাদের মধ্যেও তাঁর মতবাদ প্রচারিত হয়। তাঁর খবর পেলেই দলে দলে মুসলমান

তাঁর কথা শুনতে চলে আসতো। তাই তাঁর নৌকো ছিল যেন 'ভাসমান কলেজ'। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে রঙ্গপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম থেকে তাঁর শিষ্যরা রঙ্গপুরে এসেছিলেন এই একটি ঘটনা থেকেই তাঁর প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।[১১৩] কেরামত আলির মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র মৌলবী হাফিজ আহমদ (তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) তাঐউনি আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং তারপরে এর দারিত্বভার গ্রহণ করেন মহম্মদ মহসীন। এখনও কয়েকটি জেলায় কেরামত আলির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[১১৪]

(ঘ) ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলনের চরিত্র :—উপরে উল্লিখিত প্রতিটি আন্দোলন ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার মনোভাবকে পরিপুষ্ট করে এবং ইসলামের পুনরুজ্জীবনের পথ প্রশস্ত করে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর যেসব মরমী সাধক তাঁদের কর্মের ও গানের মাধ্যমে উদার-মানবতাবাদী ভাবধারা গ্রাম বাংলায় প্রচার করেন, ওয়াহাবি মতবাদের ফলে তার প্রভাব যথেষ্ট হ্রাস পায়। ওয়াহাবি মতবাদ অনুযায়ী আদিম ইসলামে প্রত্যাবর্তনই চিরন্তন ধর্ম। স্বভাবতই তাঁরা ধর্মের ক্ষেত্রে চিন্তাকে সম্প্রসারিত করার বিরোধিতা করেন। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এই সব আন্দোলনের বড় অবদান হল মুসলিম সমাজে ঐশ্লামিক আচরণ-বিধি প্রবর্তন ও বিধবা বিবাহের প্রচলন করা। সরকারী সূত্র থেকে জানা যায়, এইসব আন্দোলনের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে মুসলমান বিধবার সংখ্যা হ্রাস পেতে সুরু করে এবং সমাজ জীবনে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে।[১১৫] এইভাবে মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন সংহত হয়। অন্যদিকে ফরাজী ও ওয়াহাবিদের অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে শ্রেণী সংগ্রামের উপাদান পাওয়া যায়, আর রাজনৈতিক কর্মসূচীতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়। তার ফলে ভাববিলাসিতা থেকে মুক্ত হয়ে মুসলমানেরা আরও সজ্ঘ-

বদ্ধ হন। এইসব গ্রুপের মধ্যে ওয়াহাবিদের কর্মসূচীতে প্রথমে শিখ বিরোধী, পরে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়। ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় আন্দোলনরূপে আরম্ভ হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই তা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। অবশ্য প্রথম দিকে এই আন্দোলনে ধর্মান্ধতার উপকরণ পাওয়া যায়। জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফরাজী ও ওয়াহাবিরা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে গো-হত্যা করে, হিন্দুর মন্দির অপবিত্র করে ও হিন্দু গ্রাম লুট করে, এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মূলতঃ হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হলেও, তাদের এইসব আচরণে হিন্দুদের ধর্মীয় মনোভাব খুবই আহত হয় এবং তারা খুবই শঙ্কিত হন। হিন্দুদের মনে এই আন্দোলন কি গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করে তার এক বিবরণ ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল 'সমাচার দর্পণ' নামক কাগজে প্রকাশিত পত্রে পাওয়া যায়। আলোচনার সুবিধার জন্য মূল পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ "শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু—সংপ্রতি জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমির নামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছায় দলবদ্ধ হইয়া প্রথমত গোবরডাঙ্গানিবাসি বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ধন প্রাণ আঘাতের বিষয় এবং আর২ হিন্দুদিগের জাতি প্রাণ ধ্বংস করণে প্রবর্ত্ত হইলে তথাকার মাজিস্ট্রেট সাহেব এ বিষয় দাঙ্গা বোধ করিয়া ফৌজদারী নাজির মহম্মদ পুলিমকে কএকজন চাপড়াশ সমেত নারিকেলবাড়িয়া পাঠাইয়াছিলেন। দুষ্ট জবনেরা নির্দ্দয়তারূপে ঐ অভাগা পুলিম নাজিরকে বধ করিলে মাজিস্ট্রেট সাহেবের রিপোর্ট মতে কলিকাতা হইতে অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইয়া তিতুমির জবন এক কালীন নিপাত হইল। ইদানীং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে সরিতুল্লা নামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২০০০ জোলা ও মোসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন

এক সরা জারী করিয়া নিজ মতাবলম্বি লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছা-খোলা কটিদেশে চর্ম্মের রজ্জু ভৈল করিয়া তৎচতুর্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটী চড়াও হইয়া দেবদেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মলকত গঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজনগরনিবাসি দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটীতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভস্ম রাশি করিলে এক জন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার দপ্তরায় অর্পিত হইয়াছে। আর শ্রুত হওয়া গেল সরিতুল্লার দলভুক্ত দুষ্ট জবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিণীচরণ মজুমদারের প্রতি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার বাটীতে দেব-দেবী পূজার আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্ম উপস্থিত করিলে মজুমদারবাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্ব্বক কএকজন জবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয় দুষ্ট জবনেরা মফঃস্বলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচার গৃহে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল ফরিদপুরের মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে যে সকল আমলা ও মোক্তারকারেরা নিযুক্ত আছে তাহারা সকলেই সরিতুল্লা জবনের মতাবলম্বি তাহারদিগের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয় তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ হাজার লোক দলবদ্ধ ইহাতে ফরিয়াদী সাক্ষির ত্রুটি কি আছে। শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম ফরিদপুরের বর্ত্তমান মাজিস্ত্রেট ধর্ম্মাবতার শ্রীযুত রাবর্ট গ্রট সাহেব এমতপ্রকার কএক মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়া জবনেরদিগকে

শাস্তি দিয়াছেন কিন্তু জবন দল ভঙ্গের কিছু উপায় উদ্যোগ করিয়াছেন কিনা শ্রুত হই নাই…। আমি বোধ করি সরিতুল্লা যখন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর ২ প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার জোটপাটের শত অংশের এক অংশ তীতুমির করিয়া ছিল না। অতএব আমরা শ্রীল শ্রীযুতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও দেশ-রক্ষার নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তির দল ভঙ্গের বিহিত আজ্ঞা করুন। ইতি সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র।

জিলা ঢাকা নিবাসি দুঃখি তাপিগণস্য।"[১১৬]

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, জমিদারদের নির্যাতনের ফলেই ফরাজী ও তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলনের উদ্ভব। তাই হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। কিন্তু এইসব আন্দোলনের যে কয়েকটি ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের দাবি ছিল, তা মুসলমান জমিদারের পক্ষে মেনে নেওয়া কষ্টকর ছিল না। সুতরাং মুসলমান জমিদারেরা এইসব দাবি মেনে নেওয়ায় তাঁদের ঠিক হিন্দু জমিদারের মত ধর্মীয় বিদ্বেষের সম্মুখীন হতে হয়নি।[১১৭] অপ্রকাশিত সরকারী দলিল থেকে জানা যায়, মুসলমান জমিদারেরা ফরাজীদের দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে ফরাজীদের বিরোধ চলে এবং মামলা মোকদ্দমাও হয়।[১১৮] অন্য-দিকে হিন্দু জমিদারেরা ধর্মীয় কারণে যেমন প্রকাশ্যে গো-হত্যা তাঁদের জমিদারিতে মেনে নিতে পারেননি, তেমনি নিজেদের প্রভাব-প্রতি-পত্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাঁদের পক্ষে ফরাজী-ওয়াহাবিদের অর্থ-নৈতিক দাবি-দাওয়া ও সাংগঠনিক অধিকার মেনে নেওয়াও কষ্টকর ছিল। স্বভাবতই হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে ফরাজী-ওয়াহাবিদের বিরোধের মীমাংসা হয়নি। উপরন্তু হিন্দু জমিদারেরা ইউরোপীয় নীলকর ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে ফরাজী-ওয়াহাবিদের প্রভাব নষ্ট করতে সচেষ্ট হন। এই কারণেই হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে

ফরাজী-ওয়াহাবিদের বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং ফরাজী-ওয়াহাবিদের ক্ষোভ কয়েকটি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে। কিন্তু এই সংঘর্ষ মূলতঃ হিন্দু জমিদারদের এলাকাতে জমিদারদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিন্দু গোমস্তা-পেয়াদা বা স্থানীয় কিছু সংখ্যক অধিবাসীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। জমিদারদের স্বার্থরক্ষাকারী নয় অথবা জমিদারদের বাসস্থানের সংলগ্ন এলাকার নয় এমন হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসীরা কেবলমাত্র হিন্দু হওয়ার জন্য আক্রান্ত হয়েছেন এমন কোন তথ্য সরকারী বা বে-সরকারী সূত্র থেকে পাওয়া কষ্টকর। মোট কথা, কোন তথ্য থেকেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় না, ফরাজী-ওয়াহাবিরা হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সময় সাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যক্ত করলেও, জমিদারী প্রথার সঙ্গে কোন সংযোগ নেই এমন ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেছে। এমনকি 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত পত্রখানি ভালো করে পাঠ করলেও, আর শরীয়ত উল্লাহ, দুদু মিঞা ও নোয়া মিঞা পরিচালিত ফরাজী আন্দোলন এবং তিতুমীর পরিচালিত ওয়াহাবি আন্দোলনের ঘটনাবলী থেকেও এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হয়। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত তথ্য স্বীকার করেও কয়েকটি প্রশ্ন মনে আসে : ফরাজী প্রভাবিত অঞ্চলে অথবা অন্যত্র প্রকাশিত কাগজপত্রে এই ধরণের আর কোন তথ্য পাওয়া যায় কি? ফরাজীদের অত্যাচারের ফলে হিন্দুরা দলে দলে গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, এমন কোন সংবাদ পাওয়া যায় কি? এই বিষয়ে কোন সরকারী তথ্য আছে কি? এই প্রশ্নগুলো আলোচনা করলেই 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত তথ্যের ওপর আরও আলোকপাত করা যায়। প্রথমতঃ এই সময়ে শিক্ষিত হিন্দু সমাজে হিন্দু জমিদারদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। মফস্বল বা শহরাঞ্চলে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগও ছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি জমিদারেরা নানাভাবে ফরাজী-ওয়াহাবিদের

প্রভাব হ্রাস করতে চেষ্টা করেন। তাই তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারকে সক্রিয় করে তাদের প্রভাব দমন করতে চেষ্টা করেন। এমনকি জমিদারেরা প্রয়োজন মত হিন্দুদের ধর্মীয় মনোভাবকে ব্যবহার করে হিন্দুদের মধ্যে ফরাজী-ওয়াহাবি সম্পর্কে আতঙ্কের ভাব স্বষ্টি করেন এবং এইভাবে তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে হিন্দুদের সহায়তালাভে সচেষ্ট হন। এই রকম প্রচেষ্টা যে জমিদারদের পক্ষ থেকে হয়েছে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ফরাজী-ওয়াহাবি প্রভাবিত অঞ্চলে কয়েকটি ঘটনায় হিন্দু জমিদারেরা বা কিছু শান্তিপ্রিয় অধিবাসী সাময়িকভাবে তাঁদের বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেও দলে দলে হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। ফরাজী-ওয়াহাবি প্রভাবিত অঞ্চলের হিন্দু জনসংখ্যা লক্ষ্য করলেই তো বোঝা যায়। তৃতীয়তঃ সরকারী সূত্রে ধর্মান্ধতার কথা বলা হলেও এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পর্যবসিত হয় এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ধর্মীয় তত্ত্বকে হাতিয়ার করে এই আন্দোলন পরিচালনা করায়, ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনের মূল কারণ ব্যাখ্যা করতে না পারায় এবং নেতৃত্বের নানা দুর্বলতা থাকায় ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলন জমিদার-নীলকর-সরকার বিরোধী হিন্দু-মুসলিম যুক্ত আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারেনি ঠিকই, তবুও কোনক্রমে এই আন্দোলনকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সাম্প্রদায়িক অন্দোলন বলা যায় না।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ওয়াহাবি আন্দোলন এক নতুনরূপ ধারণ করে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ওয়াহাবিরা শিখেদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিহার করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। তখন থেকেই হিন্দুরা এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি দেখায়। লক্ষণীয় এই যে, এমন দক্ষতার সঙ্গে এই আন্দোলন পরিচালিত হয় যে ওয়াহাবিদের উদ্দেশ্য ইংরেজ

বিতাড়ন করে মুসলিম শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হলেও কোথাও ওয়াহাবিদের সাথে হিন্দুদের সংঘর্ষ হয়নি। হিন্দুরা সম্প্রদায়গতভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করলেও তাঁদের সহানুভূতি প্রদর্শন ব্রিটিশ সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এই কারণে এই আন্দোলনের সময়ে কিছু সংখ্যক হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১১৯] যদি ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলনের চরিত্র প্রকটভাবে সাম্প্রদায়িক হত তাহলে দীর্ঘকালধরে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ব্রিটিশ বিরোধী করিডর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত না, আর নীল বিদ্রোহের সময়ে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান কৃষকদের অভূতপূর্ব ঐক্য গ্রাম বাংলায় সম্ভবপর হত না। শ্রেণী নির্বিশেষে মুসলমান সমাজের সহানুভূতি যেমন এই ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রতি ছিল, তেমনি হিন্দুরাও সম্প্রদায়গতভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও এই আন্দোলনকে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করতে অগ্রসর হয়নি। প্রথমদিকে নেতৃত্বের দুর্বলতায় ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলন কয়েকটি স্থানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের রূপ নেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ওয়াহাবি আন্দোলন এই দুর্বলতা দূর করতে সচেষ্ট হয়। তারফলেই ব্রিটিশ সরকার উদ্বিগ্ন হয় এবং কঠোরভাবে এই আন্দোলন দমন করে। মনে রাখা প্রয়োজন, ওয়াহাবিরাই সর্বপ্রথম বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারতবর্ষ হতে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী এক সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আর এই ওয়াহাবি আন্দোলনকে মুসলিম কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার অভিপ্রায়ে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে উল্লেখ করা যায়।[১২০]

সূত্র নির্দেশ

১. Proceedings of the Judicial Department, O. C. No. 99, 7 April, 1847, pp. 143-144, Henceforth abbreviated as P. J. D. ; James Wise, Notes on the Races, Castes, and Trades of Eastern Bengal, London, 1883, pp. 21-27 ; ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০, পৃষ্ঠা : ২৭-২৮ ; R. C. Majumdar (General Editor), British Paramountcy and Indian Renaissance, vol. IX, Part I, Bombay 1963, pp. 884-885 ; Azizur Rahman Mallick, British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856, Dacca, 1961, pp. 67-68 ; Muin-ud-Din Ahmad Khan, History of the Fara'idi Movement in Bengal (1818-1906) ; Karachi, 1965, Chapter III, pp. 1-7 ; Jagadish Narayan Sarkar, Islam in Bengal (Thirteenth to Nineteenth Century), Calcutta, 1972, pp. 52-53. ক্ষিতিমোহন সেন লেখেন. শরীয়ত উল্লাহ এক জোলার বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

২. P. J. D., O. C. No. 99, 7 April, 1847 p. 143 ; M. A. Khan, op. cit., Chapter II, p. xxxii. ডানবার ফরাজী শব্দের অর্থ যেভাবে ব্যাখ্যা করেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হল : "Ferz—Commandment of God—Feraizi (plural) Commandments of God—from which, Ferazee, one who acts up to the Commandments of God" (vide P. J. D., Ibid).

৩. Murray T. Titus, Islam in India And Pakistan, Calcutta, 1959, pp. 185-187 ; M. A. Khan, op. cit., p. xxxiii.

৪. M. A. Khan, op. cit., pp. xxxiii-xxxiv.

৫. P. J. D., O. C. No. 99, 7 April, 1847, p. 144 ; A. R. Mallick, op. cit., p. 69 ; M. A. Khan, op. cit., pp. 17-19.

৬. Ibid ; Report on the Census of British India, Taken on the 17th February 1881, vol. I, London, 1883, p. 27 ; M. Titus, op. cit., pp. 187-188 ; M. A. Khan, op. cit,, pp. 24-25. এই সেন্সাস রিপোর্টে লেখা হয় : "Dudu Miyan was a small landowner" (Ibid).

৭. P. J. D., O. C. No. 99, 7 April, 1847, pp. 144-145, 147.

৮. Ibid, O. C. No. 25, 29 May, 1843, pp. 461-462.

৯. M. A. Khan, op. cit., pp. 104-112.

১০. Ibid, p. 109.

১১. Ibid, pp. 109-110.

১২. Ibid, pp. 110-111.

১৩. P. J. D., O. C. No. 99, 7 April, 1847, p. 145.

১৪. P. J. D., O. C. No. 25, 29 May, 1843, p. 462.

১৫. P. J. D., O. C. No. 99, 7 April, 1847, pp. 145-146.

১৬. P. J. D., O. C. Nos. 21-25, 29 May, 1843 ; O. C. No. 99, 7 April, 1847 ; J. Wise, op. cit., p. 25 ; নবীন চন্দ্র সেন আমার জীবন, তৃতীয় ভাগ, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৭, পৃষ্ঠা : ১৪২-১৫০ ; M. A. Khan, op. cit., pp. 111-112.

১৭. P. J. D., O. C. No. 25, 29 May, 1843, p. 462.

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ মে ডেমপিয়ার ঢাকা থেকে এক নোটে লেখেন : "I can give an instance of their acts which will prove the above. A Mohammudan Zemindar (not a Ferazee) could not collect his rents, and on his trying to enforce his rents and on his trying to enforce his demands about 50 cases were brought against him. He came to the station and it was notified to him if he became one of Doo Doo Mea's disciples every thing would be settled. He did so, acknowledging that person as his

Murreed, and on the next day every complaint was withdrawn and the parties returned to their homes." (Ibid).

১৮. A. R. Mallick, op. cit., pp. 72-73 ; M. A. Khan, op. cit., pp. 27-28.

১৯. M. A. Khan, op. cit., pp. 27-29.

২০. P. J. D., O. C. No. 99, 7 April, 1847, p. 144 ; M. A. Khan, op. cit , pp. 29-30,

২১. P. J. D., O. C. No. 99, 7 April, 1847, p. 146 ; M. A. Khan, op. cit., p. xxxv.

২২. M. A. Khan, op. cit., p. 34.

২৩. Ibid, p. 35.

২৪. P. J. D., O. C. No. 99, 7 April, 1847, pp. 147-148 ; J. Wise, op. cit., p. 25.

২৫. P. J. D., O. C. No. 99, 7 April, 1847, p. 149.

২৬. M. A. Khan, op. cit., pp. 35-37.

২৭. P. J. D., O. C. No. 99, 7 April, 1847, p. 149.

২৮. Ibid, pp. 142-143.

২৯. Ibid, pp. 145-146.

৩০. Ibid, pp. 146-147.

৩১. Ibid, pp. 148-149.

৩২. Ibid, pp. 149-150.

ডানবার লেখেন : "The Heads of all offices should be enjoined to shut the doors of office and employment against all Ferazees, high or low, and the Collectors of Land Revenue should be instructed to discourage, as much as possible, their settlement in the Khas Mahals, to which they have heretofore resorted in great numbers, having there much more of their own

way than on the lands of the Zemindars and Talookdars. Notices might be also issued, warning the Ryotts against payment of the Ferazee tax, and promising full and immediate protection to those who resisted its levy. These measures, if they failed to eradicate the sect entirely, would at all events have the effect of weakening and dividing them and of giving confidence to all those who are opposed to them..." (Ibid).

৩৩. Ibid, O. C. No. 100, P. 151.

৩৪. M. A. Khan, op. cit., p. 37.

৩৫. J. Wise, op. cit., p. 25; M. A. Khan, op. cit., pp. 42-43.

৩৬. M. A. Khan, op. cit., pp. 46-47.
দুদু-মিঞা লম্বা সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কালো লম্বা দাড়ি ছিল এবং তিনি মাথায় এক বড় উষ্ণীষ পরিধান করতেন। গ্রামের প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায়, তিনি ১৮ বার বিয়ে করেন, তবে একসঙ্গে চারজনের বেশী স্ত্রী ছিল না। তবে তাঁর সর্বশেষ স্ত্রী কালামৃধা গ্রামের এক ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন (বাহাদুরপুর গ্রাম থেকে আট মাইল দূরে কালামৃধা গ্রাম ছিল)। দুদু-মিঞার জীবনের শেষ সময়ে এই স্ত্রীই তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং ঢাকাতে দুদু-মিঞার কবরের পাশেই তাঁর কবর আছে। (Ibid).

৩৭. Ibid, pp. 48-50.

৩৮. নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন (তৃতীয় ভাগ), পৃষ্ঠা : ২৭৪। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, নবীনচন্দ্র সেন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর মাদারীপুর মহকুমার শাসক হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর পাটনাস্থ বেহারে ডেপুটি কালেক্টার হিসেবে দায়িত্ব নেন। (দ্র নবীনচন্দ্র সেন, সাহিত্য সাধক চরিতমালা)

৩৯. নবীন চন্দ্র সেন, আমার জীবন (তৃতীয় ভাগ), পৃষ্ঠা : ১৪৯-১৫০

৪০. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৪২—১৪৪
মুয়ীন উদ্দীন আহমদ খান লেখেন যে, নবীনচন্দ্র সেন তাঁর গ্রন্থে 'আল্লার

ঢিল' লিখেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'আল্লার চিন্' হবে। সম্ভবতঃ মুদ্রণ ত্রুটির জন্যই 'ঢিল' হয়েছে। 'আল্লার চিন' বাক্য ফরাজীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। (Vide M. A. Khan, op. cit., pp. 54-55).

৪১. নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন (তৃতীয় ভাগ), পৃষ্ঠা : ১৪৪

৪২. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৪৪-১৪৫

৪৩. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৪৫-১৪৬

৪৪. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৪৬

৪৫. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৪৬-১৪৮

৪৬. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৪৬-১৪৭

৪৭. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৪৯-১৫৫

৪৮. ঐ, পৃষ্ঠা : ২৪৬

৪৯. M. A. Khan, op. cit., pp. 146-148.

৫০. Translation of an Arabic Pamphlet on the History and Doctrines of the Wahhabis, written by 'Abdullah, grandson of Abdul Wahhab, the founder of Wahhabism, By J. O. 'Kinealy, c.s., Calcutta, in Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XLIII, Part I, Nos. I to IV, 1874, pp. 68-82. (This Pamphlet was written in April, 1863); M. Titus, op. cit., pp. 188-190; M. A. Khan, op. cit., p. xli.

৫১. A. R. Mallick, op. cit., pp. 92-95.

৫২. M. A. Khan, op. cit., pp. xlvi-xlix.

৫৩. The Calcutta Review, vol. L1, 1870; W. W. Hunter, The Indian Musalmans, Calcutta, 1945, Reprinted; M. Husain, Origins of Indian Wahabism, in the Proceedings of the Indian History Congress, Calcutta, 1939; A. R. Mallick, op. cit., Chapter IV; M. A.

Khan, op. cit., pp. xxxvi-xl ; Qeamuddin Ahmad, The Wahabi Movement in India, Calcutta, 1966.

৫৪. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৭৫, পৃষ্ঠা : ৪২

৫৫. Hunter, op, cit. p. 5 ; আ. গ. সিদ্দিকী, তিতুমীর, পৃষ্ঠা : ৩৫-৩৯, ৪২ ; A. R. Mallick. op. cit., pp. 96-97.

সৈয়দ আহমদ যখন প্রথমবার কলকাতার দিকে রওনা হন তখন তাঁর সঙ্গে সর্বভারতের অতিবিশ্বাসী মুজাহিদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুইশতজন। এই সময়ে কলকাতায় অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তার মধ্যে কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। ফাতেমা খানম ও শামসুন নিসা খানম তাঁর নিকট মুরীদ হন। বিবিবাগানে শামসুন নিসা খানমের বাগানবাড়ি ছিল। সৈয়দ আহমদ এই বাগানবাড়িতে অবস্থান করেন। তারপরে আরও দুবার এসে তিনি এখানেই থাকেন। বর্তমানে কলকাতার যেখানে রাজাবাজার ট্রামডিপো আছে তাকেই বিবিবাগান বলা হত। এই বিবিবাগান ও বাগানবাড়ির মালিক ছিলেন শামসুন নিসা খানম। (দ্রঃ ঐ, পৃষ্ঠা : ৪২)

৫৬, R. C. Majumdar, op. cit., p. 887 ; A. R. Mallick, op. cit., p. 98.

৫৭. Hunter, op. cit., Chapter I ; M. Titus, pp. 190-193 ; R. C. Majumdar, op. cit., pp. 887-888 ; A. R. Mallick, op. cit., P. 99.

৫৮. Hunter, op. cit., Chapters I-II ; A. R. Mallick, pp. 100-101.

৫৯. আ. গ. সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা : ১-১৫

৬০. ঐ, পৃষ্ঠা : ১২-১৪

৬১. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৫-২৯

৬২. ঐ, পৃষ্ঠা : ৩০-৪০ ; A. R. Mallick, op. cit., pp. 76-77.

৬৩. সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা : ৪৩-৪৫, ৫০-৫১ ; A. R. Mallick, op. cit., pp. 77-78.

৬৪. সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা : ৪৪

৬৫. ঐ, পৃষ্ঠা : ৪৩-৪৪

৬৬. ঐ, পৃষ্ঠা : খ-গ, ৪৩

৬৭. ঐ, পৃষ্ঠা : গ

৬৮. বিহারীলাল সরকার, তিতুমীর বা নারকেলবেড়িয়ার লড়াই, কলিকাতা, ১৩০৪, পৃষ্ঠা : ৪৭

৬৯. A. R. Mallick, op. cit., p. 78.

৭০. সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা : ৪৫-৪৯ ; A. R. Mallick, op. cit., pp. 78-79.

৭১. সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা : ৫০-৫১

৭২. ঐ, পৃষ্ঠা : ৫২-৫৩

৭৩. A. R. Mallick, op. cit., p. 81.

৭৪. Hunter op. cit. pp. 37-38 ; সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা : ৬৮-৭৩

৭৫. Hunter, op. cit., p. 38 ; A. R. Mullick, op. cit., pp. 82-83.

৭৬. Hunter, op. cit., p. 38 ; A. R. Mallick, op. cit., pp. 83-86, 89.

হান্টার লেখেন : "They were equally bitter, however, against any Muhammadan who would not join their sect, and on one occassion, in sacking the house of a wealthy and obdurate Musalman, varied the proceedings by forcibly marrying his daughter to the head of their band." (Ibid).

৭৭. Hunter, op. cit., pp. 38-39 ; সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা : ৯০-৯৯ ; A. R. Mallick, op. cit., pp. 86-87.

৭৮. R. C. Majumdar, op. cit., p. 888.

৭৯. P. J. D., O. C. Nos. 21-22, 29 May, 1843, pp. 454-455.

৮০. Ibid, O. C. Nos. 22-22A, 29 May, 1843, pp. 455-456.

৮১. Ibid.

৮২. Ibid, O. C. No. 21, 29 May, 1843, p. 454.

৮৩. Ibid, O. C. No. 22, 29 May, 1843, p. 455.

৮৪. Ibid, O. C. No. 22A, 29 May, 1843, p. 456.

৮৫. Ibid, O. C. No. 23, 29 May, 1843, p. 457.

৮৬. Ibid, pp. 457-458.

৮৭. Ibid, O. C. No. 24, 29 May, 1843, pp. 458-459.

৮৮. Ibid, O. C. No. 25, 29 May, 1843, pp. 460-461.

৮৯. Ibid, p. 461.

৯০. R. C. Majumdar, op. cit., pp. 888-889.

৯১. Ibid, pp. 896-899.

৯২. Ibid, pp. 889-890.

৯৩. Ibid, p. 890.

৯৪. Ibid, pp. 890-891.

৯৫. Ibid, p. 891.

৯৬. Ibid.

৯৭. Ibid, p. 892.

৯৮. Ibid, p. 893.

৯৯. Ibid, pp. 893-894.

১০০. Ibid, p. 894.

১০১. Ibid, p. 895.

১০২. Ibid.

১০৩. Ibid, pp. 895-896.

১০৪. M. A. Khan, op. cit., Part I, Chapter II ; J. N. Sarkar, pp. 48-75.

১০৫. M. A. Khan, op. cit., pp. lxix-lxx.

১০৬. Ibid, pp. lxxiii-lxxiv.

১০৭. M. Titus, op. cit., p. 194 ; M. A. Khan, op. cit., pp. lxxiv-lxxvi.

১০৮. P. J. D., O. C. No. 25, 29 May, 1843, p. 461.
১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ মে ঢাকা থেকে ডব্লিউ. ডেমপিয়ার একটি নোটে লেখেন : "I have stated above that Keramut allee repudiates all connexion with the Ferazees, and I find that he has been attacked by them when travelling, for which several of the offenders were punished. He is a learned man and much respected here, the others are ignorant men, proved of their influence over the lower classes and much inclined to abuse it." (Ibid).

১০৯. M. Titus, op. cit., pp. 195-197 ; M. A. Khan, op. cit., pp. Ixxvi-Ixxvii.

১১০. M. A. Khan, op. cit., pp. 90-103, 145-150 ; J. N. Sarkar, op. cit., p. 74.
মুয়ীন উদ্দীন আহমদ খান ফরাজী আন্দোলনের সময়কাল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উল্লেখ করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাজীদের প্রধান নেতা খান বাহাদুর সৈয়দ আল-দীন আহমদ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র বাদশা মিঞা ফরাজীদের প্রধান নেতা হন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর বাদশা মিঞা মারা যান। তারপরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুদু মিঞা ফরাজী গ্রুপের পরিচালক হন। (Vide M. A. Khan, op. cit., p. xvii.)

১১১. M. A. Khan, op. cit., pp. 147-148.

১১২. J. Wise, op. cit., p. 28 ; M. A. Khan, op. cit., pp. 98-99. জেমস ওয়াইজ লেখেন : "In late years Karamat Ali made the important admission, that India under the English rule was not Dar-ul-harb, a country where the infidels were legitimate objects of attack, as had been maintained by Dudhu Miyan and Wilayat Ali". (Vide J. Wise, op. cit., p. 28).

১১৩. J. N. Sarkar, op. cit., p. 70.

১১৪. M. Titus, op. cit., pp. 194-195.

কেরামত আলির সব রচনাই উর্দু ভাষায়। এখন পর্যন্ত যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে বলা যায়, তিনি ৪৬ খানা গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের মুসলমানদের বিষয়ে আলোচনা করতে হলে কেরামত আলির রচনাসমূহ একান্ত অপরিহার্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'মুসলমানী বাংলা ভাষায়' ওয়াহাবিদের সম্পর্কে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়: (১) জোনাবালি সাহেব, ওয়াজিবুল এজাহার, কলিকাতা, ১৮৮৩-৮৪। এই গ্রন্থে ওয়াহাবি আন্দোলনের কারণ আলোচিত হয়েছে। (২) মৌলবী নৈমুদ্দিন, ইনসাফ, কলিকাতা, ১৮৮৫-৮৬। (৩) হলাল উদ্দীন খাঁ, শহীদ নারকেলবেড়ে, কলিকাতা, ১৮৮৫-৮৬। এই গ্রন্থে তিতুমীর সম্পর্কে তথ্য আছে। (৪) মোকাদ্দাস আলি, তামাকের জন্মকথা ও লামজ হামিজার গল্প, কলিকাতা, ১৮৮৬-৮৭। (৫) আবুল হোসেন, বারকাল মাওয়াদ্দিন আল্লা রাসেল মাকালেদ্দিন, কলিকাতা, ১৮৯৫-৯৬। এই গ্রন্থে ওয়াহাবি-সুন্নী বিতর্ক আলোচিত হয়েছে। (৬) আবদুল্লা, আকবর পীর নজদী, (১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে প্রকাশিত)। এই গ্রন্থে ওয়াহাবি আন্দোলনের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত হয়েছে।

১১৫. E. A. Gait, Census of India, 1901, Vol. VI, The Lower Provinces of Bengal and their feudatories, Part I, The Report, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902, p. 262; কাজী আবদুল ওদুদ, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত নিজাম বক্তৃতা, ১৯৩৫, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, মাঘ, ১৩৪২ বাংলা সন, পৃষ্ঠা: ১৮-২৩

সেন্সাস রিপোর্টে লেখা হয়: "It is said that the Farazis and other reformed sects strongly advocate widow-marriage, and that in consequence the practice is gradually coming into greater favour. The Census statistics lend some support to their statement, and the

proportion of widows appears to be steadily falling; that of widowers on the other hand has scarcely varied at all since 1881". (Vide Gait, op. cit., p. 262).

১১৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩৪২, পৃষ্ঠা : ৩১১-৩১২

১১৭. Hunter, op. cit., pp. 37-38; S. B. Chaudhuri, Civil Disturbances during the British Rule in India (1765-1857), Calcutta, 1955, p. 97.

ডঃ শশীভূষণ চৌধুরী লেখেন যে, জমিদারদের অত্যাচারের ফলে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও, মুসলমান জমিদারদের হিন্দু জমিদারদের মত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বলি হতে হয়নি।

১১৮. P. J. D., O. C. No. 25, 29 May, 1843, p. 462.

১১৯. The Calcutta Review, Vol. L I, 1870; R. C. Majumdar, op. cit, pp. 899-901, 954.

১২০. R. C. Majumdar, op. cit.

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লেখেন : "The Wahabis were undoubtedly inspired by the motive of freeing India of the British rule, but their struggle was not for securing freedom for India but for the re-establishment of Muslim supremacy. The history of the Wahabi movement, as noted above, clearly proves that even the most wide-spread and well-organized movement for driving away the British need not always be taken as a national war of independence". (Ibid, p. 901).

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদের পটভূমি রচনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রভাব

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় খুব দীর্ঘ না হলেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দেই স্যার সৈয়দ আহমদ সর্বপ্রথম দ্বিজাতিতত্ত্বের এক অস্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করেন। পরে মৌলানা মহম্মদ আলির চিন্তাতেও তার ছায়া পড়ে। তারপরে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কবি ইকবালের ভাষণে দ্বিজাতিতত্ত্ব সুস্পষ্ট-ভাবে প্রতিভাত হয়। লণ্ডনে 'কেমব্রিজ গ্রুপ' ভারতীয় মুসলমানদের জন্য 'পাকিস্তান' নামক পৃথক রাষ্ট্রের দাবিতে মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি ইকবাল ও মহম্মদ আলি জিন্নার মধ্যে যে মতবিনিময় হয়, তাতে এই তত্ত্ব আরও বিকশিত হয় এবং পরিশেষে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর প্রস্তাবে তার চূড়ান্ত রূপ ঘটে। লক্ষণীয় এই যে, এই সময়ে যাঁরা দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচারক ছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন অবাঙালী মুসলমান।[১] কিন্তু লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে বাঙালী মুসলমানেরা ক্রমান্বয়ে আরও সক্রিয়ভাবে এই দাবির সমর্থনে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হন, এবং এইভাবে পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের আন্দোলন দেশভাগের ঘটনাকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে : কি কারণে চল্লিশের দশকে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব সমগ্র বাঙালী জাতিকে আচ্ছন্ন করে? হঠাৎ কি এই মনোভাব তাঁদের মনকে আলোড়িত করে? এর পেছনে কি কোন ঐতিহাসিক কারণ নেই? এইসব প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পেতে হলে আমাদের হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের

অসমান বিকাশের ধারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে হবে। যেহেতু উনবিংশ শতাব্দীতেই এই বিচ্ছিন্নতাবাদের উপকরণগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেজন্য তখন থেকেই এই প্রবন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করা হল। বলা বাহুল্য, ইংরেজ শাসকদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের শাসন বজায় রাখা। আর এই শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতেই এই দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর নায়কেরা উনবিংশ শতাব্দীতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রগতির চেষ্টা করেন। এই দুই সম্প্রদায়ের অসমান বিকাশের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ শাসকেরা যে বিভেদের রাজনীতি প্রয়োগ করেন, তাতে বিচ্ছিন্নতাবাদের উপকরণগুলোর শিকড় আমাদের জীবনের গভীরে প্রবেশ করে। বিদেশী শাসকের এই ভেদনীতি মোটামুটি আমাদের সকলেরই জানা রয়েছে। তাই এই দিক থেকে সমস্যাটি এখানে আলোচনা করা হয়নি। এই ভেদ নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও হিন্দু-মুসলমানের অসমান বিকাশ কিভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রতিনিয়ত উনবিংশ শতাব্দীতে পুষ্ট করতে থাকে, তারই কয়েকটি দিক এখানে আলোচনা করা হল।

(১) বাঙালী মুসলিম-মানস বিশ্লেষণের প্রশ্নটি কিভাবে দেখা উচিত :

এখন পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানদের বিষয়ে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাতে মুসলিম মানসের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি পরিষ্কার করে আলোচিত হয়নি। কোন কোন লেখক ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে, এই সময়ে স্যার উইলিয়াম হাণ্টার রচিত The Indian Musalmans : Are they bound in conscience to rule against the Queen ? (London 1871) নামক গ্রন্থে মুসলমান সমাজের অবস্থা বিশ্লেষণে যে মনোভাব

ব্যক্ত করা হয়, তারই প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর শেষে দুইজন প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তানায়ক মৌলবী আবদুল লতিফ খান বাহাদুর (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রী) ও সৈয়দ আমির আলির (১৮৪৯-১৯২৮ খ্রী) ওপর পড়ে।[২] ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা-ধারায় হাণ্টারের প্রভাব নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ না থাকলেও আবদুল লতিফের ভূমিকা বিশ্লেষণে এই উক্তি যথার্থ নয়। কারণ হাণ্টারের গ্রন্থ প্রকাশের অনেক আগেই আবদুল লতিফ বাঙালী মুসলমানের সমস্যা সম্পর্কে যেসব সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন, তার সঙ্গে পরবর্তীকালে হাণ্টারের মনোভাবের কোনও কোনও বিষয়ে মিল পরিলক্ষিত হয়। বাঙালী মুসলিম মননের ক্রমবিকাশের ধারাটিকে বুঝতে হলে আমাদের প্রধানতঃ দুটো ভাগে বিভক্ত করে তা আলোচনা করা প্রয়োজন, যথা—(ক) ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ এবং (খ) ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম স্তরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল: মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব, আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে ইসলামীয়করণের সূত্রপাত, ভূমিব্যবস্থার প্রভাব, রেভারেণ্ড লঙ, আবদুল লতিফ ও কেরামত আলির ভূমিকা ইত্যাদি। দ্বিতীয় স্তরের প্রধান ঘটনা হল: হাণ্টারের মতবাদের প্রভাব, আবদুল লতিফ ও আমির আলির ভূমিকা, সেন্সাস রিপোর্টের প্রভাব, জাতিতত্ত্বের প্রভাব ইত্যাদি। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতাতে আরবি ভাষার মাধ্যমে মুসলিম ধর্মশাস্ত্র, আইন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপনের আবেদনপত্র কতিপয় মুসলমান গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট পেশ করেন। এই বছরেই অক্টোবর মাসে ক্যালকাটা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়।[৩] ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রেভারেণ্ড জেমস লঙ ও আবদুল লতিফ মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করে এই বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৭০

খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরের মৌলানা কেরামত আলি (১৮০০-১৮৭৩ খ্রী) এক ভাষণে মুসলমানদের সরকার-বিরোধী মনোভাব পরিত্যাগ করতে বলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হাণ্টারের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় এই সমস্যা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে খুব দ্রুতগতিতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বাংলা-দেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে পরিণত হওয়ায় মুসলিম মননে তার প্রভাব পড়ে। আর উনবিংশ শতাব্দীর আয়ুষ্কাল যখন শেষ হয় তখন আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষকে পৃথিবীর জাতি-সমূহের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র দেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] অর্থাৎ এই সময়ে নতুন চিন্তাধারার সংস্পর্শে বাঙালী মনন বিকশিত হলেও বিদেশী শাসনে ভারতের দৈন্যদশা লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। আর এই সময়েই দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের শিক্ষিত নায়কেরা পরস্পর থেকে দূরে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন।

(২) কেন বাঙালী মুসলমান পিছিয়ে পড়লেন ঃ

প্রাক-পলাশী যুগে শাসক সম্প্রদায়রূপে মুসলমানেরা সেনাবাহিনী ও ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। আমিল ও ফৌজদার পদে অধিষ্ঠিত থাকায় শাসনব্যবস্থার প্রধান পরিচালকও তাঁরাই ছিলেন। অন্যদিকে ভূমি ব্যবস্থায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে হিন্দুদের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। দশ ভাগের নয় ভাগ জমিদারীই হিন্দুদের দখলে ছিল। কানুনগো বিভাগে কর্মরত সবাই, আর বড় বড় ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারও হিন্দু ছিলেন। অন্যদিকে বেশীর ভাগ কৃষক মুসলমান ছিলেন। ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে হিন্দুরা কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করলেও বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এমনভাবে নিযুক্ত ছিলেন যে সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের ভারসাম্য তখনও নষ্ট হয়নি। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজ

কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। খুব দ্রুতগতিতে মুসলমানেরা দুরবস্থায় পতিত হন। শাসনযন্ত্রে নিযুক্ত মুসলমান আমিল-ফৌজদারেরা অধিকারচ্যুত হন। মুসলমান সৈন্যদের পরিবর্তে সিপাহীরা নিযুক্ত হওয়ায় তাঁরাও কর্মচ্যুত হন। বিচার বিভাগেও মুসলমানদের ক্ষমতা লুপ্ত হয়। এইভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানদের অধোগতি হয়। অবশ্য হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের দুর্গতি অনেক বেশী হয়। পূর্বের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে নিজেদের সন্তোষজনকভাবে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ শাসকেরা মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। ফরাজী ও ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে এই বিরূপতা আরও বৃদ্ধি পায়। স্বধর্ম থেকে পতিত হবার ভয়ে মুসলমানেরা সহজে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। অন্য-দিকে হিন্দুরা দ্রুত পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ-খাইয়ে নেন। অবশ্য ইংরেজ শাসনের পূর্বেই হিন্দুদের মধ্যে গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং হিন্দুরা সহজেই ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি গ্রহণ করেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে তাঁদের ইংরেজ প্রভুদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। যেহেতু হিন্দুরা ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেন সেজন্য তাঁরা সহজেই ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শাসনতন্ত্রে কর্মে নিযুক্ত হন। এইভাবে ব্রিটিশ শাসনের সুরুতেই হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা পিছিয়ে থাকেন।[৫]

ক্যালকাটা মাদ্রাসা মুসলমানদের মনে এক নতুন ভাবাবেগের সৃষ্টি করে। তাঁরা এই মাদ্রাসাকে তাঁদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে বরণ করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের দুয়ার মুসলমান ছাত্রদের জন্য বন্ধ ছিল। ফলে ক্যালকাটা মাদ্রাসাই ছিল মুসলিম চেতনা বিকাশের একটি প্রধান কেন্দ্র। আর এই চেতনা আরবি-ফারসি ভাষায় ধর্মচর্চার মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়।

তখন মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্যোক্তরা ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেননি, এমনকি মাতৃভাষার প্রতিও তাঁরা কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। অন্যদিকে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করতে আরম্ভ করেন, আর সেই সঙ্গে মাতৃভাষারও চর্চা সুরু করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা মাদ্রাসার সঙ্গে ইংরেজি বিভাগ যুক্ত করার পরেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। মাদ্রাসা শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই মুসলিম নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়। অনেকটা ক্যালকাটা মাদ্রাসার অনুকরণেই হাজী মহম্মদ মহসীনের দানে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে আর একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেও কেবলমাত্র মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি অ্যাংলো-পারসিয়ান বিভাগ খোলা হয়। অবশ্য হুগলি কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুল হিন্দু ও খ্রীষ্টান ছাত্রদের জন্য খোলা ছিল। লক্ষণীয় এই যে, হুগলি মাদ্রাসার বেশীর ভাগ ছাত্র শহরতলির জেলাগুলি থেকে আসেন। কিন্তু ক্যালকাটা মাদ্রাসার বেশীর ভাগ ছাত্র ছিলেন পূর্ববঙ্গের।[৬] সুতরাং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের ছাত্রদের শিক্ষা জীবন সুরু হয়।

এই সময়ে সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে তার ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের অসমান বিকাশ আরও বৃদ্ধি পায়। ফারসি ভাষাকে স্থানচ্যুত করে ইংরেজি ভাষাকে সরকারী মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সরকারী কাজে ইংরেজি অথবা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সরকারী কাজে সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে থাকেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, মুন্সেফ, দারোগা ও উকিলের পদের প্রায় অর্ধেক তাঁদের জন্যই সংরক্ষিত রাখা হবে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রেন্স অথবা উচ্চ

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সমস্ত আইন পরীক্ষা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নিয়ম করা হয় যে, যাঁরা আইনের গ্রাজুয়েট তাঁরাই মুন্সেফ হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।[৭] ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হয় যে, কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষায় সফল হতে পারলেই ভালো সরকারী পদ লাভ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া মুসলমান শাসকদের আমল থেকে জ্ঞানী মুসলমানেরা দাতব্য ও পবিত্র কাজের জন্য খাজনামুক্ত যেসব জমিজমা ভোগ করতেন তাও ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সরকারী নির্দেশে কেড়ে নেওয়া হয়। সুতরাং মুসলিম ধর্মচর্চার কেন্দ্রগুলো ও ফারসি ভাষায় অভিজ্ঞ মুসলমানেরা নিদারুণ অসুবিধার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হন।[৮] আর্থিক অসুবিধার জন্য মুসলমান ছাত্ররা পড়াশুনা চালাতে পারেননি। তারফলে বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি হুগলিতে মহসীন কলেজ মুসলমানের অর্থে স্থাপিত হলেও তাতে কার্যতঃ হিন্দু ছাত্রদেরই প্রাধান্য ছিল।[৯] সুতরাং মুসলমান ছাত্রদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল।

(৩) আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহঃ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা অনুধাবন করেন যে, ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতার এবং তাদের সাহায্যের মাধ্যমেই বাঙালী মুসলমানের উন্নতি সম্ভব। যখন ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা মাদ্রাসাকে পুনর্গঠিত করবার বিষয় আলোচিত হয় তখন আবদুল লতিফ খুব পরিষ্কার করেই ইংরেজি ও ফারসি উভয় ভাষাতেই মুসলমানদের শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৬০-১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দেই সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা

নিজেদের ধর্মীয় সত্তা বজায় রেখে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে উদ্যোগী হন। এই সময়ে আবদুল লতিফ ছিলেন বাঙালী মুসলমানদের প্রধান মুখপাত্র।[১০]

আর বিদেশীদের মধ্যে যিনি মুসলমানদের দুরবস্থা দূরীকরণে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন, তিনি হলেন রেভারেণ্ড জেমস লঙ। মনে রাখা দরকার, হাণ্টারেরও অনেক আগে রেভারেণ্ড লঙ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা বিস্তারিত আলোচনা করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে একটানা দীর্ঘকাল রেভারেণ্ড লঙ এই সমস্যা সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং অর্থনৈতিক-সামাজিক দুর্দশা থেকে বাঙালী মুসলমানদের উদ্ধার করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। ব্রিটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করার এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজনেই এই দায়িত্ব পালন করা উচিত, এই কথাই বিভিন্ন প্রবন্ধে রেভারেণ্ড লঙ বারে বারে উল্লেখ করেন এবং এইভাবে এই বিষয়ের প্রতি সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের আগ্রহ বৃদ্ধি করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড লঙ যখন মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রাসাদে একসপ্তাহ কাটান তখন ওখানকার সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সঙ্গে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার তাঁর সুযোগ হয়। তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলে। এই আলোচনা থেকে রেভারেণ্ড লঙের মনে হয় যে, মুসলমানদের সামনে কোন ভবিষ্যৎ না থাকায় তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততা ও অসন্তোষ রয়েছে। তাঁদের রাজনৈতিক আধিপত্য নষ্ট হওয়ায় এবং ইংরেজ সরকার কর্তৃক পুঁথিগত পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মে নিয়োগের নীতি অনুসরণ করায় মুসলমানদের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই অসন্তোষের প্রবল স্রোতধারা হায়দ্রাবাদ, লখনৌ ও বোখারা পর্যন্ত প্রবাহিত।[১১]

রেভারেণ্ড লঙ ও আবদুল লতিফ উভয়েই পরস্পরের পরিচিত ছিলেন এবং উভয়েই ব্রিটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করার ও মুসলিম সমাজের

উন্নয়নের বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহশীল ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতাতে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের কাজকর্মের সঙ্গে দুজনেই যুক্ত ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই এসোসিয়েশনের কার্য-বিবরণীতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এইসব প্রবন্ধের উপর যেসব মতামত ব্যক্ত হয় তাও উল্লেখযোগ্য। রেভারেণ্ড লঙ ও আবদুল লতিফ-এই এসোসিয়েশনকে তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেন।[১২]

(৪) আবদুল লতিফের ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের লেফটেনাণ্ট-গবর্ণর স্যার জে. পি. গ্রাণ্টের অনুরোধে আবদুল লতিফ A Minute on the Hooghly Mudrassah (Calcutta, 26 December, 1861) নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি এই প্রবন্ধে বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মুসলিম সমাজ প্রধানতঃ দুটো অংশে বিভক্ত ঃ একটি অংশ মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী (learned class), আর একটি অংশ জাগতিক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত (worldly class)। প্রথম অংশের মুসলমানেরা দরিদ্র। তাঁরা অবস্থাপন্ন মুসলমানদের আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। তাঁরা হজরত মহম্মদের সেই অমর বাণী 'জ্ঞানচর্চার জন্য যদি চীন দেশেও যেতে হয়, তাহালে যেও', তা অনুসরণ করলেও তাঁরা এখানে থেকেও আরবি ভাষাতে ধর্মচর্চা করতে আগ্রহী ছিলেন। এই জ্ঞানী মুসলমানেরা মুসলিম সমাজে খুবই সম্মানিত। অর্থবান ব্যক্তিরা তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারলে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেন। আর এই জ্ঞানী মুসলমানেরাই মুসলিম সমাজের পুরোহিত-দের তৈরি করেন। স্বভাবতই তাঁরা যথেষ্ট প্রভাবশালী। সুতরাং

এই জ্ঞানী মুসলমানদের প্রচেষ্টার ফলেই ধর্ম ও সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা বজায় রয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন তাঁদের মনের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। তাঁদের ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই, এমনকি এই শিক্ষা গ্রহণে তাঁদের কোন আগ্রহও নেই। এই জ্ঞানী মুসলমানদের মনোভাব ও ভূমিকা আলোচনা করে আবদুল লতিফ বলেন, তাঁদের শিক্ষার জন্য হাজী মহম্মদ মহসীন ফাণ্ড থেকে আর্থিক সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। এই জ্ঞানী মুসলমানদের প্রয়োজনে সরকার অর্থ ব্যয়ে উদ্যোগী না হলে মুসলমানেরা অসন্তুষ্ট হবেন।[১৩]

অন্যদিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমানেরা তাঁদের জাগতিক স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। তাঁরা আরবি ভাষা আয়ত্ত করতে বিশেষ আগ্রহী নন। তাঁরা ফারসি ভাষা আয়ত্ত করে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারলে ও সমাজে মেলামেশা করতে পারলেই খুশি। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমানেরাই ছিলেন সংখ্যায় বেশী, আর তাঁদের অর্থ ও সম্পদ ছিল যথেষ্ট। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা ও ব্যবসায়ীরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবদুল লতিফ অনুভব করেন, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমানেরা ইংরেজি শিক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি করবেন। সুতরাং তিনি প্রথম শ্রেণীর (learned class) জন্য আরবি চর্চার প্রতিষ্ঠান ও দ্বিতীয় শ্রেণীর (worldly class) জন্য ইংরেজি-ফারসি বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলেন।[১৪]

এই প্রবন্ধে আবদুল লতিফ একথাও বলেন. মুসলিম সমাজে সম্মানজনক আসন পেতে হলে একজন মুসলমানকে অবশ্যই আরবি-ফারসিতে জ্ঞানবান হতে হবে। আরবি-ফারসি বাদ দিয়ে কেউ যদি কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন তাহলে তাঁর পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল নিজ সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের প্রদান করা সম্ভব হবে না, আর তিনি ব্রিটিশ শাসনের মাহাত্ম্য ও উপকারিতা বোঝাতে সক্ষম হবেন না। সুতরাং আরবি-ফারসির সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার

ব্যবস্থা করলেই এই উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব। এই কারণে আবদুল লতিফ সরকারকে উপায় নির্ধারণে উদ্যোগী হতে বলেন।[১৫]

তারপরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারী আবদুল লতিফ কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে মুসলমানেরা কিভাবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন সে বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন।[১৬] অবশ্য তিনি পরিষ্কার করে বলেন, মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার মূল কাঠামোর কথা ভেবে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসার করতে হবে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি একই মনোভাব ব্যক্ত করেন। মুসলমান জনসাধারণের নিকট ক্যালকাটা মাদ্রাসার সমাদর দেখে আবদুল লতিফ সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেন, যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যে ক্যালকাটা মাদ্রাসাই কেবলমাত্র জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। হিন্দু কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজের তুলনায় ক্যালকাটা মাদ্রাসার সাফল্য অনেক বেশী। অগণিত হিন্দু জনসাধারণের নিকট এই দুটো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব কেবলমাত্র নামেই রয়েছে। অন্যদিকে ক্যালকাটা মাদ্রাসাকে প্রতিটি মুসলমান তাঁদের জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে বরণ করেন। তাঁরা যা চান তাই এই প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁরা পান। যে মুসলিম অনুশাসন ভিত্তি করে মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত তার নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাও এই মাদ্রাসায় পাওয়া যায়। তাই আবদুল লতিফ ক্যালকাটা মাদ্রাসাকে মুসলিম চেতনার প্রধান উৎস হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি মাদ্রাসা-শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ তাঁর মতে, এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলিম সমাজের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে সক্ষম।[১৭]

একই সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে এবং

দ্বিতীয় শ্রেণীর (worldly class) মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজির প্রতি আগ্রহ দেখে, আবদুল লতিফ ক্যালকাটা মাদ্রাসার ইংরেজি-ফারসি বিভাগকে উন্নত করে একটি পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করতে বলেন।[১৮] আবদুল লতিফ সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মনোভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তখন সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মনের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল ছুতমার্গ ও অহংকার। তাঁরা ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার নামে তাঁদের ছেলেদের ভিন্নধর্মী ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে দিতে চাননি। সুতরাং স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করার পরে তাঁদের ছেলেদের প্রেসিডেন্সী অথবা হুগলি কলেজে গিয়ে ভিন্নধর্মী ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে দেওয়ার পক্ষপাতী তাঁরা ছিলেন না।[১৯] এমনকি তাঁদের মনে এই আশঙ্কাও ছিল, মুসলমান তরুণেরা যদি ক্যালকাটা মাদ্রাসা অথবা স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় তাহলে হয়তো তারা ইয়ং বেঙ্গলের পথ অনুসরণ করবে।[২০]

পরবর্তীকালে মুসলমান ছাত্ররা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভের সুযোগ পান তখন হিন্দু ছাত্রদের তুলনায় মুসলমান ছাত্রদের যেসব অসুবিধা ছিল তাও আবদুল লতিফ উল্লেখ করেন।[২১] শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান ছাত্ররা যাতে হিন্দু ছাত্রদের সমতুল্য হতে পারেন সেজন্য তিনি মাদ্রাসার ইংরেজি-ফারসি বিভাগের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত কলেজ ক্লাসের ব্যবস্থা করিতে বলেন।[২২] তিনি বলেন, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে আর কোন মতানৈক্য নেই। একটি সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি শিক্ষা সন্তানদের দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা খুবই ইচ্ছুক। সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। ইউরোপীয় সভ্যতার আশীর্বাদ গ্রহণ করতে মুসলিম মন উন্মুখ হয়ে আছে। তারই প্রকাশ এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে। তাই আবদুল লতিফ অনুভব করেন, মুসলমানদের মধ্যে যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটেছে তাকে সযত্নে লালন করা প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করেন, যদি বাঙালী মুসলমানেরা ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীতে পরিণত হন তাহলে ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে প্রচলিত

জনমত, ভারতীয় রাজনীতিবিদদের গোঁড়ামি এবং ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের সঙ্কীর্ণ মনোভাব পরিবর্তিত হবে।[২৩] সুতরাং সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা ও অনগ্রসরতা দূর করাই ছিল আবদুল লতিফের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মহসীন ফাণ্ডের টাকায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হুগলি কলেজে হিন্দু ছাত্রদের প্রাধান্য দেখে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আবদুল লতিফ সরকারের নিকট বারে বারে আবেদন করে মহসীন ফাণ্ড সুচারুরূপে পরিচালনার কথা বলেন। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা স্যার ক্যাম্পবেলের ও লর্ড নর্থব্রুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশেষে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার এই উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ৫০,০০০ টাকা বাৎসরিক দেয়। এই টাকায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহীতে তিনটি মাদ্রাসা স্থাপন করা হয় এবং বাংলাদেশের মুসলমান ছাত্রদের প্রয়োজনে কিছু সংখ্যক স্কলারসিপ দেওয়া হয়।[২৪] প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রতিষ্ঠায় আবদুল লতিফ অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারী লর্ড নর্থব্রুক নতুন প্রেসিডেন্সী কলেজ গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ধর্ম ও মত নির্বিশেষে প্রেসিডেন্সী কলেজে সকলে স্থানলাভ করায় আবদুল লতিফ ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা খুশী হন। তাঁরা অনুভব করেন, প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভের সুযোগ গ্রহণ করে মুসলমানেরা নিজেদের পশ্চাৎপদ অবস্থা দূরীকরণে সক্ষম হবেন।[২৫]

মনে রাখা প্রয়োজন, বাস্তব জীবনে কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের আশাতেই আবদুল লতিফ ইংরেজি শিক্ষা সমর্থন করেন। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক ভাবধারায় বাঙালী মুসলমানকে উজ্জীবিত করবার কোন উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেননি। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই পাশ্চাত্যের নতুন ভাবধারা কিছু সংখ্যক শিক্ষিত হিন্দুর মনে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। তাঁদের মধ্যে যুক্তিনিষ্ঠ

মন নিয়ে ধর্মীয়-সামাজিক সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণের এক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আবদুল লতিফের চিন্তা ভাবনা মোটামুটিভাবে এক ক্ষয়িষ্ণু ও জীর্ণ কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে মুসলমানদের বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা। শিক্ষিত হিন্দুদের মত পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক শিক্ষা অর্জনে তাঁর কোনই আগ্রহ ছিল না। বস্তুতঃ তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাকেই শক্তিশালী করতে মনোযোগী হন। তার ফলে মুসলিম মনন একদিকে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা ও অন্যদিকে রক্ষণশীল সেকেলে মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে বিচরণ করায় তাঁদের চিন্তা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্য দীর্ঘকাল বিরাজ করে।[২৬]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে মৌলবী ওবাইদুল্লাহ আলোবাইদি যে মন্তব্য করেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন ঃ "বর্তমানে কলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্রদের বেশীর ভাগ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত। আবার তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রামের এবং সুধারামের ছাত্রসংখ্যাই ছিল বেশী। পশ্চিমবঙ্গের বা শহরতলির জেলাগুলো থেকে আগত ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা চার বা পাঁচ ভাগ। চট্টগ্রামের মুসলমান ছাত্ররা খুবই ধর্মান্ধ এবং তাঁদের আধুনিক জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। স্বভাবতই তাঁরা ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী। এই কারণেই ক্যালকাটা মাদ্রাসার আরবি বিভাগে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।"[২৭] এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার মুসলিম সমাজে রক্ষণশীল মনোভাবকে শক্তিশালী করে এবং ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যার ফলে এই মনোভাবকে দূর করা সম্ভব হয়নি।

(৫) রেভারেণ্ড জেমস লঙের মনোভাব :

রেভারেণ্ড লঙ লক্ষ্য করেন, সরকারী চাকরিতে ইংরেজি ভাষা অপরিহার্য হওয়ায় মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। কতিপয় সরকারী পদে সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা নিয়োজিত থাকলেও বেশীর ভাগ মুসলমান যুক্ত রয়েছেন পিয়ন ও দপ্তরীর কাজে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী বৃত্তির বেশীরভাগই হিন্দু ছাত্ররা ভোগ করেন, আর প্রায় সমস্ত ভালো সরকারী চাকরিই হিন্দুদের দখলে আছে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ আগস্ট ভারত সরকার একটি প্রস্তাবে বলে, যোগ্য ভারতীয়দের আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিযুক্ত করার জরুরী রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। রেভারেণ্ড লঙ ভারত সরকারের এই প্রস্তাবটির উল্লেখ করে মুসলমানদের কর্মে নিয়োগের প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। তিনি অনুভব করেন, সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ জনসমষ্টির অসন্তোষ স্বাভাবিক ভাবেই থেকে যায়। তিনি মনে করেন, ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হবার মত জ্ঞান অর্জন করতে পারলেই মুসলমানদের ক্ষোভ সহজেই প্রশমিত হবে। আর তা করা সম্ভব যদি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য আরও আর্থিক সাহায্য দেওয়া যায় এবং শিক্ষণ যোগ্যতা নির্ধারনের জন্য হিন্দুদের চেয়ে পৃথক পরীক্ষা মারফত যদি আরও বেশী সংখ্যক মুসলমানকে সরকারী পদে নিযুক্ত করা যায়। তাহলে বাঙালী মুসলমানদের সামনে জীবিকার পথ উন্মুক্ত হবে এবং দেশে শান্তি বিরাজ করবে। রেভারেণ্ড লঙ সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন, ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলনের ইতিহাস একথাই প্রমাণ করে যে মুসলমানেরা মৃত নন, তাঁরা ঘুমিয়ে আছেন।[২৮]

প্রসঙ্গতঃ রেভারেণ্ড লঙ মুসলমান ছাত্রের অসুবিধাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, একজন হিন্দু ছাত্রের তুলনায় একজন মুসলমান ছাত্রের অসুবিধা অনেক। মুসলমান ছাত্রকে ইংরেজিসহ ফারসি ও বাংলা শিখতে হয়। অন্যদিকে হিন্দু ছাত্রকে ইংরেজি ও বাংলা শিখলেই

চলে। তাছাড়া মুসলমান ছাত্রের বাংলা ভাষায় দখলও কম ছিল, আর ইংরেজি উচ্চারণ ও রচনা নিম্নমানের ছিল। এইজন্য রেভারেণ্ড লঙ মুসলমান ছাত্রের ফারসি জ্ঞানকে সরকারী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে ধরতে বলেন। অর্থাৎ ইংরেজিতে ও বাংলায় হিন্দু ছাত্রের তুলনায় কম দক্ষতার জন্য যেন তাঁকে সরকারী পদ থেকে বঞ্চিত না করা হয়। রেভারেণ্ড লঙ একথাও সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, খুব সঙ্গত কারণেই মুসলমানেরা আরবি ও ফারসি ভাষার জন্য গর্ব অনুভব করেন। এই দুটো ভাষা মুসলিম ধর্মের ও শাসনের বাণীবাহক এবং তাঁদের মহান ঐতিহ্যের ধারক ছিল। এই বিষয়ে তাঁদের অনুভূতি তখনও খুব প্রখর ছিল। তাঁরা একথাও মনে রাখেন, মুসলমানেরাই তো ফারসিকে দেশ শাসনের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা করেন। তাই বাংলাদেশে যখন বাংলা ভাষা বাঙালীর জাতীয় ভাষারূপে বিকশিত হয় এবং ফারসিকে স্থানচ্যুত করতে থাকে, তখন শিক্ষিত মুসলমানেরা তা সহজে মেনে নিতে পারেননি।[২৯] যেহেতু সকল জাতিই মায়ের ভাষা অনুসরণ করে, সেজন্য তাঁদের পক্ষে বাংলা ভাষার অগ্রগতি রোধ করা অসম্ভব ছিল। তাই এই সময়ে শিক্ষিত মুসলমানেরা আরবি-ফারসি শব্দ মিশিয়ে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক বাংলা ভাষা গঠনে উদ্যোগী হন। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি নির্ভর এই ভাষা ও সাহিত্য তাঁদের পৃথক সত্তা বজায় রাখতে সহায়ক হবে, এই ছিল তাঁদের আশা। একেই 'মুসলমানী বাংলা' বলা হয়।[৩০]

অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের এক বাস্তব চিত্র অঙ্কন করে রেভারেণ্ড লঙ বাঙালী মুসলমানেরা যে ক্রমান্বয়ে অবসাদ কাটিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করছেন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেন। তাঁর মতে, মাদ্রাসার ইংরেজি-ফারসি শিক্ষা অনেকটা সফল হয়েছে। কয়েকজন ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। মাতৃভাষার সাহায্যে চিকিৎসাবিদ্যা কলকাতা, আগ্রা ও লাহোরের মুসলমানদের

মধ্যে ফলপ্রসূ হয়েছে। হুগলি কলেজের ইংরেজি-আরবি অধ্যাপক মৌলবী ওবাইদুল্লাহ আলোবাইদি কর্তৃক সঙ্কলিত আরবি ভাষায় প্রকাশিত ব্যাকরণ ভারতীয় মুসলমানেরা ব্যবহার করছেন। এই সিরিজে আরও গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পাশ্চাত্য ও মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান কিভাবে পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে সেই বিষয়েও অধ্যাপক ওবাইদুল্লাহ একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সার্ভে বিভাগে মুসলমানদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে। বাংলা ও ফারসি শব্দ মিশিয়ে 'মুসলমানী বাংলা' নামে এক নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। এই সাহিত্য নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের (অর্থাৎ নৌকার মাঝি ও অন্যান্য সাধারণ মুসলমান) সচেতন করে তুলছে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কলকাতার মুসলিম প্রেস থেকে 'মুসলমানী বাংলায়' অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এইসব গ্রন্থ ছিল ফারসি ও উর্দু থেকে অনুবাদ।[৩২] অবশেষে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল লতিফের নেতৃত্বে শিক্ষিত মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ম্যাহোমেডান লিটারেরি সোসাইটি অব ক্যালকাটা'।[৩৩] এইভাবে মুসলমানদের জীবনে এক নতুন আলোড়ন অনুভূত হয়। শিক্ষিত মুসলমানেরা ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন। রেভারেণ্ড লঙের ভাষায়, তাঁদের জীবনে নিশ্চলতার অবসান ঘটছে।[৩৪]

কিন্তু রেভারেণ্ড লঙের এই বিবরণ পাঠ করে কয়েকটি প্রশ্ন মনে আসে ঃ মুসলমানদের মধ্যে যে চেতনার প্রকাশ ঘটে ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের মনোভাব ব্যক্ত হয় তা কি সমগ্র বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে সুস্থ জাতীয় চেতনা বিকাশে সহায়ক ছিল? তা কি মুসলমানদের অগ্রসর হিন্দুদের নিকট হতে দূরত্ব বজায় রেখে এক স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত করেনি? সম্ভবতঃ রেভারেণ্ড লঙ এই ধরণের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না।

(৬) ভূমি ব্যবস্থার প্রভাব ঃ

এই স্বাতন্ত্র্যবোধ যে কতটা শক্ত জমির উপর দাঁড়িয়ে ছিল তা আমরা ভূমি ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারব। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুগল আমলে বাংলাদেশে অনেক হিন্দু ও মুসলমান জমিদার ছিলেন। অবশ্য হিন্দু জমিদারেরাই সংখ্যায় বেশী ছিলেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে বড় বড় মুসলিম জমিদার পরিবার জমিদারী হারিয়ে ফেলেন। প্রথমতঃ মুসলিম সমাজে যে ধরনের উত্তরাধিকারের আইন চালু ছিল তাতে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি যেভাবে বন্টিত হত তাতে জমিদারী টিকিয়ে রাখা কষ্টকর হয়। দ্বিতীয়তঃ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। সেল ল-র (Sale Law) ফলে অনেক পুরানো হিন্দু ও মুসলমান জমিদার জমিচ্যুত হন। কিন্তু এই সমস্ত জমিতে পরে যারা জমিদার হয়ে বসলেন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু। খুব অল্পসংখ্যক মুসলমান জমিদার টিকে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কেবলমাত্র ঢাকার নবাবের অনেক জমি-জমা ছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায়, সেই সময়ে যে সমস্ত বৃহৎ জমিদার পরিবার ছিল তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি পরিবার প্রথম যুগের ব্রিটিশ শাসনের পূর্বেও ছিল। সুতরাং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে জমিদারী হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে হিন্দু জমিদারদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৫] তৃতীয়তঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের অবস্থার যে উন্নতি হয় তাতে আনুপাতিক হারে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারেরা কি পরিমাণ লাভবান হন তা নিম্নের হিসেব থেকে বোঝা যায়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমি রাজস্বের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল ২৮৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পতিত জমি উদ্ধার, কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, টাকার মূল্য হ্রাস ইত্যাদির ফলে জমিদারদের কৃষকদের নিকট হতে খাজনা (Rent-roll) ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১৮ লক্ষ

টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১,৪৭২ লক্ষ টাকা হয়। অন্য-দিকে এই সময়ে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি পায় ২৮৬ লক্ষ টাকা থেকে ৩২৩ লক্ষ টাকা মাত্র।[৩৬] স্বাভাবিকভাবে অর্থ নৈতিক জীবনে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অর্থবান বাঙালী আইনজীবী, কুসীদজীবী ও ব্যবসায়ীরা তাঁদের উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে জমিজমা ক্রয় করেন। তাঁরা অনেকেই শহরে নিজেদের পেশায় নিযুক্ত থেকে এজেণ্ট দিয়ে সগুকেনা জমি-জমা পরিচালনা করেন। জমি-জমা ক্রয় করা শুধু লাভজনকই নয়, সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র উপায়ও বটে। স্বভাবতই উদ্বৃত্ত অর্থ শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত না হয়ে জমিদারী ক্রয় করাতেই নিযুক্ত হয়। এই কারণেই বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব হয়নি।[৩৭] তাছাড়া শহরবাসী জমিদারেরা নায়েব-গোমস্তা দিয়ে তাঁদের জমিদারী পরিচালনা করায় কৃষকের সঙ্গে জমিদারের সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে তিক্ত হয়। উপরন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষির উন্নয়নে জমিদারদের উৎসাহিত করতে ও কৃষকের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় এবং কৃষক ও জমিদারদের মাঝখানে অনেক মালিকানা স্বত্ব সৃষ্টি করে (sub-in feudation) ভূমি ব্যবস্থাকে জটিল করে তোলে, আর গ্রামের এক বৃহৎ জনসমষ্টির জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে।[৩৮] তাছাড়া কৃষকের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে মহাজনী প্রথাও গ্রাম বাংলার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সুরু করে। জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিরা অর্থ ধার দেবার কারবারে অংশ গ্রহণ করেন। অর্থবান মহাজনেরা জমি-জমা নিয়ে ব্যবসা সুরু করেন। গ্রাম-বাংলার অর্থনীতির লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, মহাজনী স্বার্থ জমি-জমার স্বার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। আর এই মহাজনদের বৃহৎ অংশই ছিলেন হিন্দু। জমিদারী ও মহাজনী প্রথার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ভূমি ব্যবস্থাকে যথেষ্ট জটিল করে তোলে এবং সমস্ত দুর্ভোগ কৃষককেই ভোগ করতে হয়।[৩৯]

লক্ষণীয় এই যে, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যেসব আইন পাশ করা হয় তার সবটুকু সুবিধা জমিদারেরাই ভোগ করেন, কৃষকেরা নন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে (Act X of 1859 ও Act XI of 1859) কৃষকের স্বার্থে আইন পরিবর্তন করা হলেও কার্যতঃ তা কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেনি। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আইনের অনেক ত্রুটি প্রকটিত হয়। ফলে কৃষকের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। জমিদার-কৃষক সম্পর্ক ও এই আইনসমূহ আলোচনা করলেই উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহের কারণ বোঝা যায়।[৪০] ভূমি সংক্রান্ত আইনের ত্রুটি দূর করবার উদ্দেশ্যে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রেণ্ট ল কমিশন (Rent Law Commission) নিয়োগ করা হয়। এই কমিশন একটি রিপোর্ট পেশ করে এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিলও রচনা করা হয়। অনেক আলোচনার পরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট (Bengal Tenancy Act of 1885) পাশ করা হয়। এই আইন জমিতে স্থায়ী কৃষকের অধিকার মেনে নেয় এবং জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে যে বাড়তি আয় হয় তার একটি ভাল অংশ জমিদারদের প্রাপ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সহজেই ও সমনীতির ভিত্তিতে জমিদার-কৃষক বিরোধের মীসাংসার জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলা হয়, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আইনের ত্রুটি এই আইনে দূর করা হয়েছে। কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে প্রজা বা রায়তের দখলী স্বত্ব স্বীকৃত হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধির অধিকার জমিদারেরা ভোগ করেন। যেহেতু অস্থিতিবান রায়তের (non-occupancy ryot) সংখ্যাই ছিল বেশী সেজন্য এই ধরণের রায়তদের সঙ্গে সম্পর্কে জমিদারেরা কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন। তাছাড়া জমি হস্তান্তর বিষয়ে এই আইনের প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে পরবর্তীকালে জটিলতা সৃষ্টি হয়। তাই এইসব ত্রুটি দূর করতে বারে বারে আইনের সংশোধন করতে হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আইনে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট পত্তনীপ্রথা, যা জমিদার ও কৃষকের মাঝখানে নানা স্বত্বের (Sub-infeudation) সৃষ্টি করে, তার কোনও পরিবর্তন সাধন করেনি। অর্থাৎ ভূমি ব্যবস্থার মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে রায়তের কয়েকটি অধিকার স্বীকৃত হয়। তাই রায়তের অবস্থার কোনও মৌলিক পরিবর্তন হয়নি।[৪১]

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের এই ত্রুটি মনে রাখলে পূর্ববঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের জটিলতা বোঝা সহজ হবে। যেহেতু পুর্ববঙ্গের বেশীর ভাগ জমিদারই হিন্দু এবং বেশীর ভাগ কৃষক মুসলমান, সেজন্য উপরের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা মনে রাখলে উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বোঝা সহজ হবে। জমিদারী প্রথার বোঝা কৃষককেই বহন করতে হয়। তার ফলে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। একই কারণে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু কৃষকদের সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের ও উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দুদের ব্যবধান বৃদ্ধি পায়।[৪২] তাই জমিদার-কৃষক সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবৈষম্যের মনোভাব মিশ্রিত হওয়ায় অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনে জটিলতা বৃদ্ধি করে। সমগ্র বাংলাদেশের, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের জমি বিচ্ছিন্নতাবাদে পক্ষে কেন এতটা উর্বর হয়ে ওঠে, তার কারণ ভূমি ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে অনেকটা জানা যায়।

(৭) ফরাজী ও ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাব :

উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে ফরাজী ও ওয়াহাবি আন্দোলন বাংলা দেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে প্লাবিত করে। ওয়াহাবি আন্দোলন ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে প্রসারিত হলেও এবং ওয়াহাবি মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও বাংলাদেশে ফরাজী ও ওয়াহাবি আন্দোলন এক বিশেষ আঞ্চলিক রূপ ধারণ করে। ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত

এই সব আন্দোলন গ্রাম-বাংলায় মুসলমানদের এক নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ায় মুসলমানেরা যে হতাশায় নিমজ্জিত ছিলেন তা দূর করতে এই আন্দোলন অনেকটা সহায়তা করে। অনেক ক্ষেত্রেই এই আন্দোলন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির দাবিতে সোচ্চার ছিল। এই ধর্ম-সমাজ আন্দোলন বহুমুখী আন্দোলনে রূপান্তরিত হওয়ায় জটিল রূপ ধারণ করে, যথা—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক। অবশ্য বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির ও নতুন শ্রেণী বিন্যাসের পটভূমিকায় এই জটিল রূপ ধারণ করা খুবই স্বাভাবিক ছিল।[৪৩]

আদর্শ হিসেবে ফরাজী-ওয়াহাবি মতবাদের দুর্বলতাও যথেষ্ট ছিল। এই মতবাদ অনুযায়ী 'আদিম ইসলামে প্রত্যাবর্ত্তন' করাই চিরন্তন ধর্ম। সুতরাং "এ-মত সর্বপ্রকার চিন্তার সম্প্রসারণের বিরোধী ; সমস্ত রকমের নূতন পরীক্ষা সন্দেহের চোখে দেখা এর প্রকৃতি।" যদি আমরা সামগ্রিকভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম আন্দোলনসমূহকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখতে পাবো যে ধর্মশাস্ত্রের সাহায্যেই মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। একটা স্তরে হয়তো তা অনিবার্য ছিল। তবুও এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী হয়। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মিশ্রিত হওয়ায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে এই আন্দোলন এক জটিল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক দিক থেকে পরাজিত হবার ফলে ধর্মের কক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করায় এই সময়ের মুসলিম নেতৃবৃন্দ জীবনের ও রাজনীতির বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে মুসলমানদের রাজনৈতিক পতনের সমস্যাটি বিশ্লেষণ করতে পারেননি। যেসব প্রশ্ন তখন মুসলমানদের মনকে আন্দোলিত করে, এইসব ধর্মীয় ব্যাখ্যা তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, আর বাস্তব অবস্থা থেকে অন্যত্র তাঁদের চিন্তাকে

চালিত করে। তাই কোন্ রাজনৈতিক ও কোন্ অর্থনৈতিক কারণে ইংরেজরা বাংলাদেশে আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হন তার কোন স্বচ্ছ ধারণা ফরাজী-ওয়াহাবি নেতৃবৃন্দের চিন্তায় পাওয়া যায় না। এই কারণে এই আন্দোলনকে প্রচলিত অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বলাই সঙ্গত, কোন সমাধান একে বলা চলে না।[৪৪]

উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তার তীব্রতা এই শতাব্দীর শেষে অনেকটা লোপ পায়। মুসলমানেরা দেখতে পান ব্রিটিশ শাসন খুবই সুদৃঢ় হয়েছে। তাই ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ পাশ্চাত্য শিক্ষার সাহায্যে এবং আর একটি অংশ ধর্মীয় শিক্ষার সাহায্যে মুসলমানদের জাগ্রত করতে ও তাঁদের অধিকার রক্ষায় অগ্রসর হন। তাই প্রায় একই সঙ্গে আলিগড়ে ও দেওবন্দে মুসলিম প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষণীয় এই যে, এই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও মওলানা মহম্মদ কাসিম উভয়েই তত্ত্বগতভাবে ও ভাবগতভাবে শাহওয়ালি উল্লাহর (১৭০৩-১৭৬৩ খ্রী) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৪৫]

প্রায় একই সময়ে বাংলাদেশে মৌলানা কেরামত আলি ও আবদুল লতিফ সক্রিয় ছিলেন। আর তাঁদের মধ্যে যোগাযোগও ছিল। আবদুল লতিফ তাঁকে দিয়ে একটি 'ফতোয়া' লেখান। তাতে বলা হল: ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকার মুসলমানদের ধর্মে-কর্মে বাধা দেয় না। সুতরাং ভারতবর্ষ হল 'দারুল ইসলাম', 'দারুল হরব' নয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর কলকাতায় আবদুল লতিফের বাসভবনে অনুষ্ঠিত 'ম্যাহোমেডান লিটারেরি সোসাইটি অব ক্যালকাটার' সভায় কেরামত আলি একটি ভাষণে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে উপরি-উক্ত মন্তব্য করে মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকার বিরোধী মনোভাব

পরিত্যাগ করতে বলেন। উপরন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনে মুসলমান ছাত্রদের ইউরোপীয় ভাষা আয়ত্ত করতে বলেন। এইভাবে তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে ওয়াহাবি মতবাদের বিরোধিতা করেন। কিন্তু ধর্মসংস্কারকরূপে কেরামত আলি ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিলেন। ধর্মীয় আচার-আচরণ নিয়ে তাঁর সঙ্গে ফরাজী-ওয়াহাবিদের মতপার্থক্য থাকলেও, তাঁদের মত কেরামত আলিও 'আদিম ইসলামে প্রত্যাবর্তণের মনোভাব' ব্যক্ত করেন। ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলন চলাকালীন ও স্তিমিত হয়ে যাবার পরে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রভাবশালী ধর্মসংস্কারক।[৪৬] স্বভাবতই ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলনের ও কেরামত আলির প্রচারের ফলে মুসলমানদের মধ্যে এক ধর্মীয়-সামাজিক মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীকালে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করে।[৪৭]

(৮) নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা :

(ক) **মুসলিম মানসে হাণ্টারের প্রভাব**—১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' নামক গ্রন্থে ওয়াহাবি আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ দেবার পরে হাণ্টার যে প্রশ্ন উথাপন করেন, তা হল এই : ভারতের মুসলমানেরা ইংরেজ শাসনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে এবং একই সঙ্গে নিজেদের আদর্শ বজায় রাখতে পারবে কিনা ? ওয়াহাবিদের মতে, তা মোটেই সম্ভব নয়। হাণ্টার মনে করেন, শান্তিপূর্ণভাবে ইংরেজ শাসনাধীন থাকার সঙ্গে ঐশ্লামিক রাজনৈতিক তত্ত্বের কোন বিরোধ নেই। অন্ততঃ বেশীরভাগ মুসলমানদের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। হাণ্টার মুসলমানদের ওয়াহাবি ও অ-ওয়াহাবি এই দুই অংশে বিভক্ত করে দেখান যে, অ-ওয়াহাবি মুসলমানেরা ইংরেজ শাসনকে সহজেই মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু ইংরেজ শাসকেরা এই ধরনের মুসলমানদের সমস্ত সরকারীকাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে

অবস্থাকে জটিল করে তুলছেন। তিনি লেখেন, ইংরেজ শাসনের পূর্বে রাষ্ট্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদেই মুসলমানেরা ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে হিন্দুরা নানা সুবিধা ভোগ করেন, অথচ অন্যদিকে মুসলমানদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বভাবতই মুসলমানদের মনে অনেক অভিযোগ জমে আছে।[৪৮] হাণ্টার মুসলমানদের দুরবস্থার যে বিবরণ দেন তাতে শিক্ষিত মুসলমানেরা খুবই প্রভাবান্বিত হন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ভারত বিভাগের সময় পর্যন্ত মুসলিম চিন্তাধারায় এই গ্রন্থের প্রভাব নানাভাবে প্রকাশিত হয়।[৪৯]

(খ) জাতিতত্ত্বের প্রভাব—ঠিক একই বছরে (অর্থাৎ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে) ভারতবর্ষে আধুনিক পদ্ধতিতে আদমশুমারি আরম্ভ হয়। এই সময়ে বাঙালীজাতির উৎপত্তি ও পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা সুরু হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আদমশুমারি রিপোর্টে এইচ. বেভেরলি লেখেন, বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান হিন্দু-সমাজের নিম্নশ্রেণী থেকে উদ্ভূত।[৫০] ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ জেমস ওয়াইজ লেখেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে উৎসাহী সৈনিকেরা ভীরু বাঙালী জাতির মধ্যে ইসলামের বার্তা প্রচার করে এবং তরবারির সাহায্যে বলপ্রয়োগ করে তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। এই ভাবে পূর্বপ্রান্তের গভীর অরণ্যদেশ পর্যন্ত ইসলামের বার্তা প্রসারিত হয় এবং শ্রীহট্টের গ্রামে অর্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা উত্তোলিত হয়। তাই বাঙালী মুসলমানদের উৎপত্তি মুগল বা পাঠান বংশ থেকে হয়নি, প্রকৃতপক্ষে তারা হল ধর্মান্তরিত হিন্দু।[৫১] স্যার হার্বার্ট রিজলিও লেখেন, বাংলাদেশের মুসলমানেরা হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণী থেকে উদ্ভূত। হিন্দু সমাজে বর্ণবৈষম্যের ফলে সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য তারা অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।[৫২] আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের মতে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে বিদেশী

উপাদান খুবই সামান্য আছে। অর্থাৎ জাতিতত্ত্বের দিক থেকে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।[৫৩]

এই মত খণ্ডন করে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ স্টেটের দেওয়ান খন্দকার ফজলে রাব্বি ফারসিতে 'হকিকত-ই মুসলমান-ই-বাঙ্গালা' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই বিষয়ের প্রতি ব্রিটিশ সরকার ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য তিনি নিজেই এই ফারসি গ্রন্থকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে The Origin of the Muhammadans of Bengal (Calcutta, 1895) নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।[৫৪] এই গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, ইসলাম তলোয়ারের জোরে এদেশে প্রচারিত হয়নি। তাই যদি হত তাহলে উত্তর ভারতে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেত। মুসলমান শাসকদের আমলে বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য মুসলমানের আগমন হয়। অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানদের পূর্ব-পুরুষ হলেন আরব, তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে আগত মুসলমানেরা। দিল্লি রাষ্ট্রবিপ্লবের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় অনেক মুসলমান সুদূর বাংলাদেশে বসতি স্থাপন নিরাপদ মনে করেন। তাছাড়া সমুদ্র পথে যেমন অনেক বিদেশী মুসলমান বাংলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেন, তেমনি আকবরের আমলেও অনেক স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমান বাংলাদেশে নির্বাসিত হন। সুতরাং এইভাবেই বাংলাদেশে মুসলমানের উৎপত্তি হয়। উচ্চ বা নীচ কোন স্তরের হিন্দুদের বংশধর মুসলমানেরা নন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে বাংলাভাষায় কথা বল্লেও তাঁদের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য বিদ্যমান। মুসলমানের বাংলায় অনেক আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণ আছে।[৫৫]

এই বিতর্কের ফলে শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানেরা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হন। হিন্দুদের সঙ্গে সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে নয়, বিদেশ থেকে আগত অবাঙালী রক্তই তাঁদের শিরায়

উপশিরায় প্রবহমান, এই মনোভাব তাঁরা যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমানেরা নিজেদের বিদেশ থেকে আগত পরিবারের বংশধররূপে পরিচয় দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। কোন্ মস্তবড় পীর, কোন্ বিখ্যাত মওলানা, কোন্ সৈয়দ বা কোন্ কোরেশ বংশের সঙ্গে তাঁদের রক্তের যোগ রয়েছে, তাই উল্লেখ করে তাঁরা নিজেদের বংশকৌলিন্য ঘোষণা করেন। তাঁদের মধ্যে এমন ধারণাও প্রকাশ পায় যে, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের থেকে উদ্ভূত।[৩] সুতরাং সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মুসলমানদের সঙ্গে এই শ্রেণীর মুসলমানদের সামাজিক-পারিবারিক সম্পর্ক ছিল না। ইসলামী তত্ত্বে জাতিভেদ বা বর্ণ-বৈষম্য না থাকলেও কার্যতঃ জাতিভেদ দেখা দেয়। সামাজিক জীবনে মুসলমানেরা তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েন, যথা—(১) আশরাফ (Ashraf) বা শরিফ অথবা সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান। সৈয়দ, শেখ, মুগল, পাঠান, মল্লিক, মীর্জা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলমানেরাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা নিজেদের বহিরাগত আশরাফি বা শরিফি মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেন। মুসলিম সমাজে সৈয়দ মুসলমানদের অবস্থান হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণদের মতই ছিল। অর্থাৎ তাঁরা প্রথম স্থান দখল করেন। যে সব প্রকৃত শেখ মুসলমান বিদেশ থেকে আগত ও যে সব সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাঁদেরই 'শেখ মুসলমান' বলা হয়। অবশ্য কোন কোন স্থানে পাঠান ও মোগল শ্রেণীর মুসলমানদের আজলাফ মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হয়। (২) আজলাফ (Ajlaf) বা আতরাফ অথবা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। এই শ্রেণীর মুসলমানেরা 'কামিনা' বা 'ইতর' অথবা 'রযীল' (Razil) নামেও পরিচিত ছিলেন। আজলাফ শ্রেণীর মুসলমানেরা চারটি ভাগে বিভক্ত ছিলেনঃ (ক) কৃষিকর্মে নিযুক্ত শেখ মুসলমান—আজলাফ সম্প্রদায়ে এদের স্থানই উচ্চে ছিল। (খ) দর্জি, জোলা, ফকির ও রঙ্গরেজ। (গ) বারহি, ভাতিয়ারা,

ছিক, চুড়িহার, দাই, ধাওয়া, ধুনিয়া গদ্দি, কালাল, কসাই, কলু, কুনজরা, লাহেরী, মাহিফারোশ, মাল্লাহ, নালিয়া, নিকারী। (ঘ) আবদাল, বাখো, বেদিয়া, ভাট, ছম্বা, দাফালি, ধোবি, হাজ্জাম, মুচি, নগরচি, নাট, পানওয়ারিয়া, মাদারিয়া, তুতিয়া। (৩) আরজাল (Arzal) বা অবনমিত শ্রেণীর মুসলমান। ভানর, হালালখোর, হিজরা, কাসবি, লালবেগী, মাঙ্গতা, মেহতর প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কোন কোন স্থানে আবদাল ও বেদিয়া মুসলমানদের এই শ্রেণীর মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হয়। এই তৃতীয় শ্রেণীর মুসলমানদের মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল এবং তাঁদের সাধারণ কবরখানাও ব্যবহার করতে দেওয়া হত না। অবশ্য এই তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যা খুবই অল্প ছিল।

উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর হিন্দুরা যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন তাঁরা আশরাফি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতেন। কিন্তু নিম্ন ও অবনত শ্রেণীর মুসলমানেরা হিন্দুসমাজের নিম্ন ও পতিত শ্রেণী থেকে উদ্ভূত। আশরাফ শ্রেণীর মুসলমানেরা আজলাফ শ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতেন না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা অর্থবান ও প্রভাবশালী ছিলেন তাঁরা দরিদ্র আশরাফ পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে আশরাফি মুসলমান হবার চেষ্টা করেন। মুসলিম সমাজে যে উত্তরাধিকারের আইন (Law of inheritance) প্রচলিত ছিল তার ফলে মুসলিম পরিবারগুলো দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং অনেক আশরাফ পরিবার আজলাফ শ্রেণীভুক্ত হয়। এই সমস্যার প্রতি মুসলিম নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ও তাঁরা আশরাফ শ্রেণীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিনষ্ট হওয়ায় উদ্বিগ্ন হন। মুসলিম নেতৃবৃন্দ বলেন, এই মুসলিম উত্তরাধিকারের আইন আরব দেশের কথা ভেবেই করা হয়, এই আইন ভারতবর্ষের বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁরা একথাও বলেন যে, পুরানো পরিবারগুলো অবলুপ্ত হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং

অবিলম্বে এই পরিবারগুলো রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। উল্লেখযোগ্য এই যে, শহরের আজলাফ শ্রেণীর মুসলমানদের পক্ষে আশরাফ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অনেকটা সহজ ছিল। কিন্তু গ্রামের মুসলমানেরা যেমন অনেক বেশী রক্ষণশীল ছিলেন, তেমনি প্রত্যেকের পারিবারিক পরিচিতিও সকলের নিকট জানা ছিল। এই অবস্থায় গ্রাম্য জীবনে নিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চশ্রেণীতে ওঠা কষ্টকর ছিল। মোট কথা, উচ্চশ্রেণীতে ওঠার প্রবণতা থেকেই মুসলিম সমাজে জাতিভেদ প্রথা কতটা প্রকট ছিল তা বোঝা যায়। এই প্রবণতা মুসলিম সমাজে বহুল আলোচিত বিখ্যাত প্রবাদ বাক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ 'গত বছর আমি একজন জোলা ছিলাম, এই বছরে আমি একজন শেখ এবং আগামী বছরে আমি একজন সৈয়দ হব' ("Last year I was a Jolaha, this year I am a Shekh ; next year if prices rise I shall be a Saiad.") নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নামের সঙ্গে বড় বড় পদবী সংযোজন করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য করেই এই চলতি কথার প্রচলন হয়ঃ

"আগে থাকে উল্লা তুল্লা শেষে হয় উদ্দিন,
তলের মামুদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন।"

("Age thake Ulla Tulla sheshe hay Uddin,
Taler Mamud upare jay kapal phere Jaddin".)

মুগল আমল থেকেই শহরাঞ্চলে 'আশরাফ সমাজ' গড়ে ওঠে এবং তাঁরা আরবি-ফারসি-উর্দু চর্চার মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এই আশরাফ মুসলমানেরাই বলেন, তাঁদের মাতৃভাষা হল উর্দু। তাঁরা বাঙালী মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা হল উর্দু, বাংলা নয়। এই আশরাফি মুসলমানেরা কথাবার্তা বলেন উর্দুতে, লেখেন ফারসিতে। তাঁরা বাংলা ভাষার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন।

তখন মুসলিম সমাজে শিক্ষিত শ্রেণী অর্থে আশরাফ শ্রেণীকেই বোঝাতো। এই শ্রেণীর কথা ভেবেই আবহুল লতিফ ইংরেজি ও মাদ্রাসা শিক্ষার সমর্থনে অনুকূল জনমত সৃষ্টি করেন। লক্ষণীয় এই যে, ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে যাঁরাই বিত্তবান হলেন তাঁরাও উর্দুভাষা আয়ত্ত করে সামাজিক জীবনে মর্যাদালাভে সচেষ্ট হন। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে আরবি-ইরানী-তুর্কী প্রভাবিত সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়াস এক প্রকট স্বাতন্ত্র্যবোধেরই পরিচায়ক হয়। অথচ উর্দুভাষী বাঙালী মুসলমানদের সংখ্যা বাংলা-ভাষী মুসলমানদের তুলনায় খুবই অল্প ছিল। নিম্নশ্রেণীর মুসল-মানদের নিকট হতে পারিবারিক-সামাজিক জীবনে দূরত্ব বজায় রাখলেও এই আভিজাত্যগর্বী উর্দুভাষী উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা ইসলামের বিশুদ্ধতা ও সংহতি রক্ষার নামে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের ওপর প্রভাব বজায় রাখতে সব সময়ে সচেষ্ট থাকেন। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই আশরাফ মুসলমানেরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ মুসলমানদের প্রধান্যের যুগে তাঁরাই ছিলেন শাসন-ব্যবস্থার প্রভাবশালী অংশ। ক্ষমতাচ্যুত হয়ে একদিকে তাঁরা আরবি-ইরাণী-তুর্কী ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থেকে নিজেদের পৃথক ধর্মীয় সত্তায় ও বংশমর্যাদায় আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন, আর অন্যদিকে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে অগ্রসর হিন্দু সমাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে সরকারের নিকট হতে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, নিম্নশ্রেণীর সংখ্যাধিক্য মুসলমানেরা এদেশেরই বাসিন্দা হওয়ায় তঁদের সঙ্গে বাঙালী সংস্কৃতি ও জীবনধারার নাড়ীর যোগ ছিল। অশিক্ষা ও অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত থাকায় বাঙালীর জীবনপ্রবাহকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার মত চেতনা তাঁদের ছিল না। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মসংস্কারকদের ও ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের আন্দো-লনের ফলে তাঁদের মধ্যে মুসলমানীকরণের মনোভাব জাগ্রত করে

আরবি-ইরানী-তুর্কী সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা হলেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র কখনই ছিন্ন হয়নি। আরবি-ইরানী-তুর্কী সংস্কৃতির ধারকেরা বাংলা ভাষা হিন্দুর ভাষা বলে ঘৃণা করলেও বাংলা ভাষা বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের ভাষায় পরিণত হয়। ধর্মের ও উর্দু ভাষার যে দেয়াল রচনা করে বাঙালী জীবনের মূল প্রবাহ থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা মুসলমান নেতৃবৃন্দ করেন তা বাধার সম্মুখীন হয়। তাই তাঁরা বাংলা ভাষাকে আরবি-ফারসি শব্দ দিয়ে পরিশুদ্ধ করে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি বজায় রাখতে চেষ্টা করেন।[৫৭]

(গ) জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি– এই সময়ে বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি স্বাতন্ত্র্যবোধকে প্রকট করে তোলে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমাদের তুলনায় বেশী ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিভিন্ন কারণে বংলাদেশের লোকসংখ্যার মানচিত্র পরিবর্তিত হয়। কয়েকটি জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা কি হারে বৃদ্ধি পায় তার পরিচয় নিম্নের এই তথ্য থেকে পাওয়া যায়ঃ

১৮৭২—%	১৮৮১—%
বগুড়া—৮০ ৩৭	বগুড়া—৮০.৮০
রাজসাহী—৭৭.৬৬	রাজসাহী—৭৮.৪১
নোয়াখালি—৭৩.১৪	নোয়াখালি—৭৪ ১৫
চট্টগ্রাম—৭০.৫১	চট্টগ্রাম—৭০.৮২
পাবনা—৬৯.৯২	পাবনা—৭২.৪১
বাখরগঞ্জ—৬৬.৭৫	বাখরগঞ্জ—৬৬.৬৮
ত্রিপুরা—৬৪.৭৫	ত্রিপুরা—৬৬.৩২
ময়মনসিংহ—৬৪.৬৯	ময়মনসিংহ—৬৬.৭৯

এইসব জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে (Bengal Proper) হিন্দুর সংখ্যা ১৭,২৫৪,১২০ ও মুসলমানের সংখ্যা ১৭,৮৬৩,৪১১ হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুর সংখ্যা ১৮,০৬৮,৬৫৫ ও মুসলমানের সংখ্যা ১৯,৫৮২,৩৪৯ হয়। তখন থেকেই অব্যাহত গতিতে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৫৮] জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরা আত্মসচেতন হন এবং এক গভীর আত্মবিশ্বাস আত্মপ্রতিষ্ঠালাভে তাঁদের অনুপ্রাণিত করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর সুরুতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে যে অনেক বেশী সচেতন হন তার পেছনে ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সচেতনতা।

(ঘ) সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল ম্যাহোমেডন এসোসিয়েশনের ভূমিকা —আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আবদুল লতিফ ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য সচেষ্ট হলেও একই সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বস্তুতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় অনেক অর্থ ব্যয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসারিত হয়। এই যুগে আবদুল লতিফ ছাড়াও আরও দুজন মুসলিম নেতা মুসলমানদেরমধ্যে শিক্ষা প্রসারে ও তাঁদের অবস্থা উন্নয়নে উদ্যোগী হন। তাঁরা হলেন সৈয়দ আমির হোসেন ও জাষ্টিস সৈয়দ আমির আলি। তাঁরা দুজনেই স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন। মুসলমানদের অবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আমির আলির প্রচেষ্টায় 'সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমির আলি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।[৫৯] ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আমির হোসেন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হন। তিনি বোধ হয় পাটনার লোক ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে আমির আলি A Cry from the Indian Muhammadans নামক প্রবন্ধে মুসলমানদের দুরবস্থা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে তার প্রতিকারের জন্য নিজের সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশন এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ভিত্তি

করে সরকারের নিকট একটি আবেদন পত্র পেশ করে মুসলমানদের দুরবস্থা প্রতিকারের দাবি করে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এসোসিয়েশনের এই আবেদনপত্রের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ভারত সরকার যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাকে আমির আলি 'মুসলিম অধিকারের ম্যাগনা কার্টা' হিসেবে অভিনন্দিত করেন। তারফলেই বাংলাদেশে ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রাইমারী শিক্ষা প্রসারের জন্য বৃত্তি চালু করা হয়।[৮০] এই এসোসিয়েশন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থেকে তাদের সাহায্যে মুসলমানদের অবস্থা উন্নত করতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এই এসোসিয়েশনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসনতান্ত্রিক ও শিক্ষাবিষয়ক প্রশ্নে সরকার এই এসোসিয়েশনের মতামত নিয়েও আলোচনা করে।[৮১]

আবদুল লতিফ কর্তৃক প্রচারিত মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোটি বজায় রেখেও আমির হোসেন উচ্চশিক্ষা সুগম করতে চান। তিনি একখানি ইংরেজি পুস্তিকায় মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, মহসীন ফাণ্ডের টাকা দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে ধরণের মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজের কোন উন্নতি হচ্ছে না। তাই তিনি কয়েকটি স্থানে মাদ্রাসা উঠিয়ে দিয়ে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যয় কমিয়ে যে অর্থ উদ্ধৃত্ত হবে তা দিয়ে ক্যালকাটা মাদ্রাসায় বি. এ. কলেজ খোলার প্রস্তাব করেন। সেখানে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য আবশ্যিক বিষয়রূপে পঠিত হবে। এইভাবে মুসলমানদের জন্য উচ্চশিক্ষার একটি সুব্যবস্থা তিনি করতে চান। লক্ষণীয় এই যে, এই প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন করে হিন্দু পেট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান মিরার (কেশবচন্দ্র সেনের পত্রিকা), বেঙ্গলী প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদপত্র। কিন্তু গবর্ণর ইডেন আমির হোসেনের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। কারণ তাঁর মতে, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনুরাগ যথেষ্ট রয়েছে। তাছাড়া মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত কলেজ

প্রেসিডেন্সী কলেজের মত উচ্চমানের হবে না। তাই ইডেন অল্প বেতনে মুসলমান ছাত্রদের জন্য কলকাতার কলেজগুলোতে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করে দেন।[৬২] এই অবস্থায় যাঁদের অর্থ ছিল তাঁরা সন্তানদের শহরাঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু গ্রাম বাংলার বৃহত্তর অঞ্চলে মাদ্রাসা বা মক্তব ছিল মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে উপোযোগী একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাদের সামনে শিক্ষা লাভের আর অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। অন্যদিকে যেসব মুসলমান ছাত্ররা শহরে উচ্চশিক্ষালাভে বসবাস করেন তাঁরাও সমাজ ও সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব বজায় রাখবার জন্য সচেষ্ট থাকেন এবং ধর্ম ও সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবার কথা কখনও চিন্তা করেননি। উপরন্তু তাঁরা মুসলমানদের মন থেকে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দূর করতে আপ্রাণ পরিশ্রম করেন। আর তাঁরা সফলও হন। এইভাবে প্রথমে আবদুল লতিফ প্রতিষ্ঠিত ম্যাহোমেডান লিটারেরি সোসাইটি অব ক্যালকাটা এবং পরবর্তীকালে আমির আলি প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট্রাল ন্যাশন্যাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা মাদ্রাসা-মক্তবের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধান করে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত এক শিক্ষিত মুসলমান সমাজ গঠনে সহায়তা করে।[৬৩]

(ঙ) **ম্যাহোমেডান লিটারেরি সোসাইটির ভূমিকা**—আমরা পূর্বেই বাঙালী মুসলমানদের সচেতন করার ব্যাপারে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সোসাইটির কথা উল্লেখ করেছি। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা এই সোসাইটির সভ্য হন এবং তাঁরা প্রধানতঃ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থেই যত্নবান ছিলেন। এই সোসাইটির সভ্যরা বাংলা-ভাষাকে খুবই অবজ্ঞা করেন। তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সভ্য বাংলা ভাষায় অজ্ঞ ছিলেন। আর যাঁরা বাংলা জানতেন তাঁরা কখনও এই ভাষায় কথা বলতেন না। তাঁরা উর্দুকে নিজেদের মাতৃভাষারূপে ঘোষণা করে গর্ব অনুভব করেন। এই সোসাইটির যে সভা প্রতিমাসে

হত তাতে উপস্থিত সভ্যরা উর্দু, ফারসি, আরবি ও ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। সুতরাং এই সোসাইটি বাংলাভাষাকে নিদারুণ অবহেলা করে।[৬৪]

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা কমিশনের নিকটে সাক্ষ্য দেবার সময় আবদুল লতিফ বলেন, যেহেতু নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা জাতিগতভাবে হিন্দুদের থেকে পৃথক নয় সেজন্য তাদের প্রাথমিক স্তরে বাংলা-ভাষায় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। তবে এই বাংলাভাষাকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ দ্বারা পরিশুদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ এই বাংলাভাষা শিক্ষিত হিন্দুদের দ্বারা ব্যবহৃত সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলাভাষা নয়। অবশ্য আবদুল লতিফ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্নধরণের সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, বিদেশ থেকে আগত মুসলমানদের বংশধরেরা এই শ্রেণীভুক্ত এবং তাঁদের মাতৃভাষা হল উর্দু। সুতরাং তাঁদের শিক্ষার মাধ্যম উর্দুই হওয়া উচিত। এইভাবে জাতিগত দিক থেকে ও মাতৃভাষা অনুযায়ী আবদুল লতিফ মুসলমানদের দুটো ভাগে বিভক্ত করেন। বাংলাভাষী মুসলমানেরা নিম্নশ্রেণীভুক্ত, আর উর্দুভাষী মুসলমানেরা বহিরাগত উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত।[৬৫] কিন্তু এই চিন্তাধারা জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে সুস্থতার পরিচায়ক ছিল না। বাংলাভাষার প্রতি অবজ্ঞা, আর উর্দুর সমাদর বাংলাদেশের মুসলমান ছাত্রদের সহজ-স্বাভাবিক অগ্রগতির পথে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। উত্তর প্রদেশে উর্দু সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা। স্বভাবতই সেখানে উর্দু চর্চার ফলে মুসলমানদের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি যথেষ্ট হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে উর্দু চর্চা তাঁদের উন্নতিকে ব্যাহত করে, আর সমগ্র বাঙালীর জাতীয় জীবনের মূল প্রবাহ থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে।[৬৬]

(চ) **আঞ্জুমানের প্রভাব**—ওয়াহাবি মতবাদ ও বিদ্রোহের ফলে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজের যে অবিশ্বাস দেখা দেয় তা দূর করতে

১২

আমির আলিও আবতুল লতিফ ও স্যার সৈয়দ আহমদের মত সচেষ্ট হন। এক সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমানদের ওপর আমির আলির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁরই অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্জুমান বা সম্মেলন গড়ে ওঠে। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি বিষয়ে মুসলমানদের বক্তব্য তুলে ধরা ও তাঁদের সংহত করাই ছিল আঞ্জুমানের উদ্দেশ্য। একথাও বলা হয়, "মুসলমান হিন্দু থেকে স্বতন্ত্র।" মৌলবী ও মওলানারা এই সংগঠনকে কেন্দ্র করে মুসলমানীকরণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করেন। অ-ইসলামীয় আচার ও চাল-চলনের তুলনায় প্রাচীন ইসলামের আচার অনেক ক্ষেত্রেই বেশী প্রশংসনীয় ছিল। আর পীরের আনুগত্যের চাইতে পয়গম্বরের আনুগত্যের গৌরব অনেক বেশী ছিল। তাই মুসলমানীকরণ অপেক্ষাকৃত কম বাধায় নিষ্পন্ন হয়।[৬৭]

(ছ) **মুসলমান লেখকদের ভুমিকা**—উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন কয়েকজন মুসলমান লেখকের আবির্ভাব হয়। ইসলামীয়করণের প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করার ব্যাপারে তাঁদের অবদানও যথেষ্ট ছিল। বাঙালী মুসলমানদের অজ্ঞতা ও তাঁদের ওপর অ-ইসলামীয় আচরণ-বিধির প্রভাব দেখে মুসলমান লেখকেরা খুবই শঙ্কিত হন।[৬৮] ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের অজ্ঞতা কতটা ছিল তার এক বিবরণ ডাঃ জেমস ওয়াইজের রচনা থেকে পাওয়া যায়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ওয়াইজ লেখেন, বেশীর ভাগ বাঙালী মুসলমান হল অজ্ঞ ও সরল কৃষক। সম্প্রতি তাদের মধ্যে হিন্দু আচরণ-বিধির প্রভাব মুক্ত হয়ে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাদের বলা হয়, যদি খাঁটি মুসলমান হতে চাও তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে আরবি ভাষায় নামাজ পড়বে। যদিও আরবি তাদের বোধগম্য নয় এবং আরবি শব্দ উচ্চারণ করাও তাদের পক্ষে কষ্টকর। অনেক স্থানেই মুসলমান কৃষকদের পক্ষে আরবি ভাষায় সঠিকভাবে নামাজ পরিচালনার জন্য

যোগ্য ব্যক্তি সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি গ্রামের মুসলমানেরা বকর-ঈদ পালন করবার জন্য লখীয়া নদীর ধারে সমবেত হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে নামাজ পরিচালনা করতে পারে এমন কেউ ছিল না। তখন কুড়ি বছরের একজন ঢাকার যুবক নৌকাতে করে তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে সেখানে নামে এবং নামাজ পরিচালনা করে তাদের সাহায্য করে।[৬৯]

ডাঃ ওয়াইজের এই বর্ণনা থেকেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ঢাকা জেলার সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। তখনও তাঁরা আরবি ভাষায় নামাজ পড়তে পারতেন না। শুধু ঢাকা জেলাতে নয়, সর্বত্রই গ্রাম বাংলায় সাধারণ মুসলমানদের এই অবস্থা ছিল। যাতে সাধারণ মুসলমানেরা ইসলাম ধর্ম, আচরণ-বিধি ও মুসলমান ধর্মের বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারে ও অনুসরণ করতে পারে সেজন্য মুসলমান লেখকেরা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ বাংলাভাষায় রচনা করেন। এইজাতীয় প্রথম গ্রন্থ হল মৌলবী মোহাম্মদ নইমুদ্দীন কর্তৃক সংগৃহীত 'জোব্দাতল মসায়েল—প্রথম খণ্ড' অর্থাৎ মুসলমানী ব্যবস্থার সার সংগ্রহ (কলিকাতা প্রেসে মুদ্রিত, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে করটীয়া, ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত)। জমিদার হাফেজ মাহ্মুদালী খাঁর অনুমতি নিয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ মুসলিম সমাজে এতটা জনপ্রিয় হয় যে, লেখক জীবিত থাকাকালীন এই গ্রন্থের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৭০] এই জাতীয় দ্বিতীয় গ্রন্থ হল শেখ আবদুর রহিম রচিত 'হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্ম্মনীতি' (১৮৮৮ খ্রী) নামক গ্রন্থ।[৭১] প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয় সেখ আবদোস্ সোবহান রচিত 'হিন্দু মোসলমান' (কলিকাতা, ১৮ এপ্রিল, ১৮৮৮ খ্রী) নামক গ্রন্থ। পরে এই গ্রন্থের এক পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিভাবে মুসলমান জমিদারদের হিন্দু আমলারা মুসলমান জমিদারদের অদূরদর্শিতা ও বিলাসিতার সুযোগ নিয়ে নিজেরাই তাঁদের জমি-জমার মালিক হয়ে বসছে, তার এক বিস্তৃত

বিবরণ লেখক দেন। তাছাড়া সকল বিষয়ে মুসলমানদের দুরবস্থা কিভাবে বৃদ্ধি পায় এবং হিন্দুরা কিভাবে শক্তি সঞ্চয় করে, তা আলোচনা করে লেখক মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে অগ্রসর হতে বলেন। কিভাবে শিক্ষিত হিন্দুদের দ্বারা সরকারী পদ থেকে মুসলমানেরা বঞ্চিত হয় এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে কংগ্রেস সংগঠন ব্যবহৃত হয়, তাও এই গ্রন্থে আলোচিত হয়। তৎকালীন আমলে প্রকাশিত আর কোন গ্রন্থেই মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বিবরণ এতটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়নি।[৭২]

এই সময়ে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত বাংলাভাষায় প্রকাশিত কয়েকখানি পত্র-পত্রিকা মুসলিম-মনকে আন্দোলিত করে। তাঁরা একই সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের আলোচনা ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের জাগাতে চেষ্টা করেন। এইসব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ সাধন করতে তৎপর হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মীর মশারফ হোসেন পরিচালিত 'আজীজন নেহার' নামক পাক্ষিক পত্রিকাকে প্রাচীনতম মুসলিম সাহিত্য-পত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই পত্রিকা বেশীদিন চলেনি। এই পত্রিকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে সরল বাংলাভাষায় প্রবন্ধ লিখিত হয়।[৭৩] ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার করটীয়া গ্রাম থেকে মৌলবী মোহাম্মদ নইমুদ্দীন সাহেবের সম্পাদনায় 'আখবারে এসলামিয়া' নামক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় এবং প্রায় দশ বছর এই পত্রিকাটি চলে। মৌলবী নইমুদ্দীন ছিলেন বাংলাভাষায় কোরান শরীফের প্রথম অনুবাদক। তাছাড়া তিনি একজন আলেম ও ধর্মনেতা ছিলেন। খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের প্রভাব থেকে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই ছিল 'আখবারে এসলামিয়া' পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। করটীয়ার বিখ্যাত জমিদার খানপন্নী পরিবার এই পত্রিকাকে আর্থিক সাহায্য দেয়।[৭৪]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে গো-বধ বা গো-রক্ষা প্রশ্ন ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বহুল আলোচিত বিষয় ছিল। ধর্মীয় কারণে গো-বধ করাকে 'আখবারে এসলামিয়া' পত্রিকা সমর্থন করে এবং যেসব মুসলমান হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনে গো-বধ বন্ধ করে গো-রক্ষার কথা বলেন তাঁদের এই পত্রিকা নিন্দা করে। বলা বাহুল্য, এই পত্রিকা গো-রক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে তদানীন্তন সাধারণ মুসলমানদের মনোভাবই ব্যক্ত করে।[৭৫] এই সময়ে খুবই নরম ভাষায় মীর মশারফ হোসেন 'গোজীবন' নামক পুস্তিকায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনে গো-বধ বন্ধ করতে বলায় গোঁড়া মুসলমানেরা তীব্রভাষায় তাঁর নিন্দা করে তাঁর কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেন।[৭৬]

আর একটি বিষয়েও মুসলিম নেতৃবৃন্দের উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে বাংলাদেশের নানা জেলা থেকে খবর আসে, মুসলমানেরা খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করছে। যশোহর জেলায় কিছু সংখ্যক মুসলমান কারিগর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে হাটে-মাঠে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করে বেড়ায়। চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাটে ও খুলনার সাতক্ষীরা মহকুমায় কতিপয় মুসলমান ব্রাহ্ম ধর্ম অবলম্বন করে। তাদের মধ্যে বনগাঁয়ের একজন মুসলমান উকিল ও দাস গফ্‌ফারের নাম উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে ঢাকার জালাল-উদ্দীন নামক এক ব্যক্তি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করায় মুসলমানদের মনে এতটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে, তিনি প্রাণভয়ে জলপাইগুড়ি চলে যান। এমন খবরও প্রকাশিত হয় যে রংপুর জেলার কিছুসংখ্যক মুসলমান "খোল করতাল যোগে হরি সংকীর্ত্তন করে; নিরামিষ খায়, হিন্দুর মতো পিঁড়িতে বসিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে আহার করে। তাহাদের মধ্যে মুসলমানের কোন কিছু দৃষ্ট হয় না।"[৭৭]

এই অধঃপতন থেকে মুসলমানদের উদ্ধার করবার জন্য ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে কয়েকটি

খণ্ডে ‘এসলাম তত্ত্ব’ বা মোসলমান ধর্মের সার সংগ্রহ নামক গ্রন্থ বাংলা ১২৯৫ সালের আশ্বিন মাস থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ শুধু মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতেই সাহায্য করেনি, ইসলামীয়-করণের প্রচেষ্টাকে সম্পন্ন করতেও সহায়তা করে।[৭৮]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে মুসলমান সমাজ ব্যবস্থায় প্যান-ইসলামীয় চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৮৮১ অথবা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত মুসলমান নেতা জামালউদ্দীন আফগানীর কলকাতায় আগমন ও তাঁর প্রচারের ফলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্যান-ইসলামীয় মতবাদের প্রতি আরও আকৃষ্ট হন।[৭৯] মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের মনোভাব মুসলমানদের তাঁদের উৎপত্তির একই উৎস সম্পর্কে এবং সম্প্রদায় হিসেবে তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। ভারতবর্ষের বাইরে দূর প্রান্তের খলিফার সঙ্গে আত্মিক যোগ স্থাপন করে মুসলমানেরা আনন্দ অনুভব করেন এবং সারা পৃথিবীতে ইসলামের বিস্তারে গর্ব অনুভব করেন। কিন্তু ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে এই প্যান-ইসলামীয় চিন্তাধারার সামঞ্জস্য বিধানের কোন সুচিন্তিত সমবেত প্রয়াস মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে দেখা যায় না। তার ফলে প্যান-ইসলামীয় মতবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদকেই পরিপুষ্ট করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়।

(জ) **সরকারী কর্মে হিন্দু প্রাধান্য সম্পর্কে** উদ্বেগ—মুসলমানদের জন্য কতটা বেশী সুযোগ-সুবিধা আদায় করা যায়, তাই ছিল মুসলিম নেতৃবৃন্দের একমাত্র লক্ষ্য। ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হাণ্টার কমিশনের নিকটে ও ১৮৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আচিসন কমিশনের নিকটে তাঁরা এই মনোভাবই ব্যক্ত করেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের নিয়মাবলী এবং একই সময়ে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার আয়োজন করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ দীর্ঘকাল বিতর্কে লিপ্ত হন। এই বিষয়ে যেসব দাবি হিন্দু নেতৃবৃন্দ করেন, তা মুসলিম নেতৃবৃন্দ সন্দেহের চোখে দেখেন। এইসব দাবি

মেনে নিলে সরকারী চাকরিতে হিন্দুদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে, এই আশঙ্কা তাঁরা করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় পরিচালিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে তাঁরা কখনই নিজেদের প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই তাঁরা এই দুটো সংগঠন থেকে দূরত্ব বজায় রেখেই চলেন।[৮০]

মুসলিম সমাজে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম নেতৃবৃন্দের শ্রেণীগত চরিত্র অনেকখানি দায়ী ছিল। যেসব মুসলিম নেতৃবৃন্দের কথা এখানে উল্লেখ করা হল তাঁদের মধ্যে কেরামত আলি ও আমির হোসেন অবাঙালী ছিলেন। হুগলি জেলার আমির আলির ওপর ইংরেজির প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। আর আবদুল লতিফ ফরিদপুর জেলার লোক হলেও তিনি ফারসি ও উর্দু চর্চাই করেন। আর তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। আবার তাঁরাই বাঙালী মুসলমানদের তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও পশ্চাৎপদ অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাকে কার্যকরী করতে হলে মুসলমানদের মধ্যে জীবন ও জগত সম্বন্ধে একটি পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত করা যে একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে তাঁরা আদৌ সচেতন ছিলেন না, অথবা তার প্রয়োজন অনুভব করেননি।[৮১] উপরিউক্ত কারণে শিক্ষিত অগ্রসর হিন্দু সমাজ থেকে পিছিয়ে পড়া শিক্ষিত মুসলমানদের মনে একই জাতীয়-সাংস্কৃতিক চেতনার ও অনুভূতির সঙ্গমে অবগাহনের বিষয়টি তখনও কোন প্রশ্ন তোলেনি। তাই মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রসার সমগ্র বাঙালী জাতির পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রগতির সূচনা করলেও, এই নবলব্ধ চেতনার সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবোধের উপকরণসমূহ মিশ্রিত হওয়ায় একই বাঙালী জাতীয় চেতনার তথা ভারতীয় চেতনার প্রবাহে এগুবার পথে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

(৯) অগ্রণী হিন্দু নেতৃবৃন্দের ভূমিকা বিশ্লেষণ ঃ

(ক) নবজাগরণের উদ্যোক্তাদের দায়িত্ব—উপরিউক্ত তথ্য আলোচনার পরে যে কোন আত্ম অনুসন্ধানী ব্যক্তির মনে প্রশ্ন দেখা দেবে ঃ বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদের যে সব উপকরণ ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করে তাতে কি নবজাগরণের উদ্যোক্তাদের কোনই দায়িত্ব নেই? ইংরেজ শাসনের ফলে, ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা ও আধুনিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করায় এক শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী মধ্যবিত্তের গোড়াপত্তন হয়। এই শ্রেণী সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ শাসনের ওপর নির্ভরশীল হলেও ইউরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার বাহকরূপে উনবিংশ শতাব্দীতে এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটায়। তাকেই 'বাংলার নবজাগরণ' নামে উল্লেখ করা হয়। প্রধানতঃ কলকাতা শহরের হিন্দুদের কেন্দ্র করেই এই জাগরণ ঘটলেও তার প্রভাব কয়েকটি মফস্বল শহরেও পড়তে সুরু করে। বাংলাদেশে শিক্ষার, বাংলাভাষার ও সাহিত্যের, সমাজ সংস্কারের ও জাতীয়-চেতনার বিকাশে এই নবজাগরণের অবদান অসামান্য। আর তার ফলেই আধুনিক বাংলার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। তবুও মনে রাখা দরকার, শিক্ষিত হিন্দুদের গণ্ডীর বাইরে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে এই চেতনা ছড়িয়ে পড়েনি। স্বভাবতই মুসলমান জনসমষ্টি ও হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ এই জাগরণের উত্তাপ ততটা অনুভব করতে পারেননি। তাই এই নবজাগরণকে প্রধানতঃ কলকাতা শহর-কেন্দ্রিক হিন্দুদের জাগরণ বলাই সঙ্গত।

বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের বিকাশ এমনভাবে হয় যে, জন্মের সূত্র থেকেই তাঁরা নানা সীমাবদ্ধতায় বিব্রত ছিল। তাই ভবিষ্যতে জাতীয় গণতান্ত্রিক জীবন গড়ে তুলবার প্রয়োজনে কৃষক ও কৃষি সমস্যাকে যতটা গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ছিল ও এই সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করা উচিত ছিল, তা তাঁরা করতে

পারেননি। তেমনি হিন্দু-মুসলিম জনসমষ্টির অসমান বিকাশ ভবিষ্যত বাঙালী জীবনে কি পরিণতি ডেকে নিয়ে আসতে পারে সে সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা তাঁদের চিন্তায় ও কর্মে পাওয়া যায় না। অনেকেই জমিদারী প্রথার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছেন ঠিকই, কিন্তু কৃষি কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন করতে না পারলে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা যে জটিল হতে পারে ও অনেক নতুন সমস্যা নানা প্রতি-বন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে ফরাজী-ওয়াহাবি ও অন্যান্য কৃষক আন্দোলন প্রত্যক্ষ করে এই চিন্তা তাঁদের কতটা উদ্বিগ্ন করে তোলে, তা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে উনবিংশ শতাব্দীর যুগনায়কদের সীমাবদ্ধতা আরো স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারব।

কৃষকের দুরবস্থা সম্পর্কে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে অসংখ্য পুস্তিকা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয় কুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চটোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেকে এই বিষয়ে অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। রামমোহনের রচনায় সেই আমলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রাম-বাংলায় ফরাজী-ওয়াহাবি আন্দোলন কি ধরণের সামাজিক-অর্থনৈতিক সংঘাত সৃষ্টি করে, সে বিষয়ে কোন আলোচনা তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না।[৮২] ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় অনেক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসকদের বিধি-ব্যবস্থার ফলে ও ইংরেজ প্রবর্তিত জমিদারী প্রথায় নতুন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর আবির্ভাবে কৃষকদের দুরবস্থার কথা আলোচিত হলেও, এই পত্রিকার সম্পাদক জমিদারদের সপক্ষেও ওকালতি করতে কুণ্ঠিত হননি। এইসব প্রবন্ধ পাঠ করলে বোঝা যায়, জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে শ্রেণীগত ব্যবধান ঈশ্বর গুপ্তের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই যে, শিক্ষিত

বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যান্য অনেকের মত তিনিও মনে করেন, সিপাহী বিদ্রোহ হল এ দেশের সিংহাসনচ্যুত মুসলমান রাজশক্তির ষড়যন্ত্র।[৮৩]

যে ইয়ং বেঙ্গলের নেতৃবৃন্দ যুক্তিবাদী মননের অধিকারী ছিলেন এবং আমেরিকা ও ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাদেশিক চিন্তার উন্মেষ ঘটান, তাঁরাও এই সময়ে বাংলাদেশের কৃষিসমস্যা বিশ্লেষণ করে জমিদারী প্রথার ও হিন্দু-মুসলমান অসমান বিকাশের পরিণতি সম্পর্কে কোন যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য রাখতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের কয়েকজন কৃষিসমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ লিখলেও তাঁরাও এই দিক থেকে সমস্যার বিশ্লেষণ করেননি।[৮৪] ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অব জেনারেল নলেজের যে কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে তাতেও এই সমস্যা সম্পর্কে কোন আলোচনা চোখে পড়ে না। ১৭৭২ শকাব্দে (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে) অক্ষয় কুমার দত্ত 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা' এই শিরোনামায় তিনটি প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বৈশাখ, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লেখেন। বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যায় তিনি প্রধানতঃ জমিদারদের অত্যাচারের ফলে রায়তদের দুরবস্থা বর্ণনা করেন। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার উল্লেখ করেন।[৮৫] হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজে নীলকরদের অত্যাচার ও কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে অসংখ্য প্রবন্ধ লেখেন।[৮৬] আরও অনেক পত্র-পত্রিকায় এই বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৮৭] ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' নীল বিদ্রোহে ও পাবনা বিদ্রোহের সময়ে মুসলমান কৃষকদের ভূমিকার ও কলকাতার গাড়োয়ানদের ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে মুসলমানদের সাংগঠনিক দক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লক্ষ্য করে যে, যেসমস্ত জেলায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তাঁরা জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। মুসলমানদের

একতাবোধ, সাহস ও সাংগঠনিক দক্ষতা প্রশংসা করে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' মন্তব্য করে, যদি হিন্দুদের বুদ্ধি ও কৌশলের সঙ্গে মুসলমানদের এইসব গুণ একত্রিত করা যায়, তাহলে তাঁরা সহজেই তাঁদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারেন। মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে সদ্ভাব ও একতা সমগ্র দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা উল্লেখ করে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' মন্তব্য করে যে, তাঁদের ও দেশের উন্নতির জন্যই মুসলমান ও হিন্দুর ঐক্য হওয়া কর্তব্য। কয়েকটি বিষয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা সুচিন্তিত বক্তব্য প্রকাশ করলেও, প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিত হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বিশ্লেষণ তাতে পাওয়া যায় না।[৮৮]

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজিতে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে তিনি বাংলাদেশের প্রজাদের পূর্বেকার অবস্থা, ইংরেজ শাসকদের আমলে আইনসমূহের ফলাফল বিচার ও প্রজাদের উন্নতির বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। এই গ্রন্থ শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, হাইকোর্টের জজেরা মন দিয়ে এই গ্রন্থখানি পাঠ করেন।[৮৯] ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত একখানি গ্রন্থে কৃষকদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করেন।[৯০] কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমর্থন করেন।[৯১] ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে অভয়চরণ দাস এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তারিণী দাস ব্যানার্জি রচিত গ্রন্থে জমিদার-কৃষক সম্পর্ক আলোচিত হয়।[৯২] ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও কৃষকের দুরবস্থা উল্লেখ করেন। অবশ্য তিনি 'ভাল জমিদার' ও 'মন্দ জমিদার' এই দুইভাগে জমিদারদের বিভক্ত করে কৃষক-জমিদার সম্পর্ক আলোচনা করেন।[৯৩] বাংলার নবজাগরণের পুরোধাদের রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের গুরুত্ব লাঘব না করেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে সামাজিক-অর্থনৈতিক সংঘাত বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদকে জন্ম দেয় ও লালন করে তাঁর মূল কারণ তাঁরা ব্যাখ্যা করতে পারেননি।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' কাগজে প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তিকাকারে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকার ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন : "'বঙ্গদেশের কৃষকে" এ দেশীয় কৃষকদের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা আর নাই। জমিদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। কৃষকদের ক্ষমতারও অনেক উন্নতি হইয়াছে।"[২৪] যে নূতন আইনের কথা বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বলেছেন তা হল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। এই পুস্তিকায় ভূমি ব্যবস্থা, কৃষকের দুরবস্থা ও অত্যাচারী জমিদার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি একথাও সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের সঙ্গে না হয়ে প্রজার সঙ্গেই হওয়া উচিত ছিল।[২৫] আবার একই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র একথাও বলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান হলে বাংলাদেশে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন : "১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজা-বর্গের চিরকালের অবিশ্বাস ভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। যেদিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব।"[২৬] উল্লেখযোগ্য এই যে, এই পুস্তিকার কোথাও বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ববঙ্গে এই ভূমি ব্যবস্থা কিভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের উপকরণকে পুষ্ট করে চলেছে, সেই বিষয়ে কোন আশঙ্কা প্রকাশ করেননি। আর যে প্রজাস্বত্ব আইন

(১৮৮৫ খ্রী) তিনি স্বাগত জানান তা ভূমি-ব্যবস্থার মূল কাঠামোকে রূপান্তরিত করতে কতটা সহায়ক হল তার কোন ইঙ্গিতও তাঁর রচনায় নেই। এই আইনে জমিদার ও কৃষকের মাঝখানে নানা মালিকানা স্বত্ব (Sub-infeudation) পুরোমাত্রায় বজায় রইল। আর তা অটুট রেখে কৃষকের দুরবস্থা কতটা লাঘব করা সম্ভব? এইসব প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাবিয়ে তোলেনি। অথচ তিনি এইসব সমস্যা সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন না তা কি করে বিশ্বাস করা যায়। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন, কৃষকের দুরবস্থা নিয়ে যাঁরাই সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন, তাঁদের রচনাতেও এই দিক থেকে সমস্যার বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না।[২৭]

(খ) জনশিক্ষা সম্পর্কে হিন্দু নেতৃবৃন্দের মনোভাব—এবার কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের বিষয়ে জমিদার ও শিক্ষিত ব্যাক্তিদের মনোভাব আলোচনা করা যাক। দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বসবাস করার ফলে রেভারেণ্ড জেমস লঙ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড লঙ একটি নোট তৈরি করে সরকারের নিকট পেশ করেন। তাতে তিনি মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। পুনরায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ আগস্ট রেভারেণ্ড লঙ একটি নোটে এই বিষয় আলোচনা করে গবর্ণর জেনারেল স্যার জন লরেন্সের নিকট প্রেরণ করেন।[২৮] রেভারেণ্ড লঙ উপলব্ধি করেন, বাংলাভাষার মাধ্যমে ভার্ণাকুলার স্কুল মারফত শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা না করলে বৃহৎসংখ্যক কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবেন। আর ভার্ণাকুলার এডুকেশনের সাহায্যেই উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারণ সম্ভবপর হবে। তিনি লক্ষ্য করেন, মুসলমানদের শিক্ষিত করে তোলার বিষয়টি অবহেলিত হওয়ায় সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া জমিদার ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা

কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের বিরোধী। রেভারেণ্ড লঙ মনে করেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে কৃষকেরা যেভাবে অর্ধদাসে পরিণত হয়েছে তাতে কৃষকের সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হয়। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, খুব কম সংখ্যক জমিদার ও শিক্ষিত ব্যক্তিই বাঙালী কৃষকের অবস্থা উন্নয়নে আগ্রহী। সুতরাং দরিদ্র ও অসহায় কৃষক সম্পর্কে সরকার তার দায়িত্ব পরিহার করতে পারে না। রেভারেণ্ড লঙ প্রশ্ন করেন ঃ শারীরিক দিক থেকে কৃষক ক্ষুধার্ত, তার আত্মাকেও কি ক্ষুধাতুর রাখা হবে?[৯৯]

এই অবস্থা থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য সরকারকে তিনি শিক্ষাখাতে আরও অর্থ ব্যয় করতে বলেন এবং প্রয়োজনমত জমিদারদের উপর শিক্ষাকর বসিয়ে অর্থ সংগ্রহের উপদেশ সরকারকে দেন। রেভারেণ্ড লঙ একথাও বলেন, ইংরেজি স্কুলে ও কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করে সহজেই এইসব প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্য কমানো যায় এবং তাতে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হবে তা ভার্ণাকুলার এডুকেশনের জন্য ব্যয় করা যেতে পারে। যেহেতু এই-সব বিদ্যালয়ে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরাই পড়াশুনা করে সেজন্য রেভারেণ্ড লঙ মনে করেন, তাঁদের বেতন বৃদ্ধি করলে ইংরেজি শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।[১০০]

আশ্চর্য হবার কোনই কারণ নেই, জমিদার ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাই রেভারেণ্ড লঙের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সরকার এই প্রস্তাব সম্পর্কে প্রতিনিধি স্থানীয় জমিদার ও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মতামত চেয়ে পাঠায়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মার্চ উত্তরপাড়ার জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সরকারের নিকট প্রেরিত নোটে রেভারেণ্ড লঙের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি লেখেন, নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগথেকে তিনি বলতে পারেন, তারা নিজ নিজ বৃত্তির প্রতি এতটা অনুরক্ত যে তারা শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনই গুরুত্ব আরোপ করে না।

বস্তুতঃ তাঁর জমিদারীর দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা তাদের সন্তানেরা পাঠশালায় যে ধরণের শিক্ষালাভ করে তাতেই সন্তুষ্ট। এই শ্রেণীর দারিদ্র্য উল্লেখ করে ও প্রচলিত ভার্ণাকুলার এডুকেশনের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে সিদ্ধান্ত করেন তাও লক্ষণীয়। তিনি বলেন, নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষের ঠিক ওপরে যেসব শ্রেণীর মানুষেরা রয়েছে তারা যাতে আরও ভালোভাবে শিক্ষালাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এইভাবেই নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।[১০১] জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, বর্তমানে গ্রামের স্কুলের ও পাঠশালার দরজা সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের জন্যই খোলা রয়েছে, যদিও হাড়ী, ডোম ও চণ্ডালদের সঙ্গে পড়বার ব্যাপারে কিছু ভ্রান্তসংস্কার রয়েছে। কিন্তু মোট ছাত্রসংখ্যার খুবই অল্প অংশ হাড়ী, ডোম ও চণ্ডাল সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি আরও বলেন ঃ বর্তমানে এই দেশে নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা গ্রহনে আগ্রহ নেই। অবস্থাপন্ন ও বুদ্ধিমান উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই এই আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।[১০২] জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী ও ধনী কৃষকেরা ভার্ণাকুলার ও অ্যাংলো-ভার্ণাকুলার স্কুল প্রতিষ্টার ব্যাপারে তাঁদের যথাসাধ্য করছেন। তাঁরা মনে করেন, আধুনিক পাঠশালাগুলো বাংলাভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা বিতরণের পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং কর বসিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে বাংলাভাষায় শিক্ষা প্রসারের কোনই প্রয়োজন নেই। 'ক্রমান্বয়ে শিক্ষা বিস্তারের' তত্ত্বে বিশ্বাসী জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সরকারকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেন এবং তার সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে বলেন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা শিক্ষার অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক হবে। তিনি মনে করেন, জমিদারেরা কখনই স্বেচ্ছায় স্থায়ী বাড়তি শিক্ষাকর দিতে নিজেদের ও তাঁদের উত্তরাধিকারদের বাধ্য করতে সম্মত হবেন না। উপরন্তু তিনি একথাও বলেন, শিক্ষার

উন্নতি ও প্রসারণ হলে তার সুবিধা যখন সকলেই পাবে, তখন সকলের পক্ষেই সমানভাবে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা সঙ্গত হবে। যে ব্যবস্থার ফলে সমগ্র দেশ উপকৃত হবে তারজন্য জমিদারেরা করের বোঝা বহন করতে বাধ্য নয়। তাই জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বেশ জোর দিয়েই বলেন, জমিদারেরা বা অন্যান্যরা ভার্ণাকুলার এডুকেশনের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের জন্য স্বেচ্ছায় 'স্টেট ট্যাক্স' দিতে রাজী হবেন না এবং আইন করে এই ধরণের ট্যাক্স চাপানো অযৌক্তিক ও অন্যায় কাজ হবে।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিল মানিকতলার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সরকারের নিকট প্রেরিত এক দীর্ঘ নোটে রেভারেণ্ড জেমস লঙের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি লেখেন, যতদিন পর্যন্ত জাতিভেদ প্রথার (Caste system) প্রভাব সমাজজীবনে থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই আশা করা নিতান্তই ব্যর্থ প্রয়াস হবে যে নিম্নশ্রেনীর লোকেরা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করবে। বেশীরভাগ কৃষকেরাই দরিদ্র এবং তারা তাদের সন্তানদের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পাঠানোর পরিবর্তে চাষের কাজে নিযুক্ত করাই বেশী লাভজনক মনে করবে। আরও অনেক দিন পর্যন্ত নিম্নশ্রেণীর অধিবাসী সহ শ্রমজীবী জনসাধারণকে শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হবে না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, অজনপ্রিয় স্থায়ী কর সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মনে এমন বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করবে যে তাঁরা স্বেচ্ছায় শিক্ষার প্রয়োজনে অর্থদান করা বন্ধ করবেন। তাছাড়া পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় দেশেরপ্রয়োজন ভার্ণাকুলার এডুকেশনের দ্বারা মেটানো যাবে না। সুতরাং বিজিত জাতির প্রজাদের শাসকদের ভাষা আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন। প্রধানতঃ তার ওপরেই রাষ্ট্রের মঙ্গল নির্ভরশীল এবং তা ছাড়া শাসক ও শাসিতের মধ্যে সমবেদনার মনোভাব টিকে থাকতে পারে না। এমনকি শাসকের সদিচ্ছা সম্পর্কে শাসিতের মনে ভুল ধারণা থেকে যায়, আর শাসন ব্যবস্থাও ত্রুটিযুক্ত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র

একথাও বলেন, সরকার জমিদারদের নিকট হতে শতকরা দুইভাগ হারে কর আদায়ের পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু বেশীরভাগ জমিদার ধনী নন। স্বভাবতই তাঁরা বাধ্যতামূলক স্থায়ী কর দিতে অস্বীকার করবেন।[১০৪]

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়শনের অনারেরি সেক্রেটারী যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরও এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ নভেম্বর সরকারের নিকট একটি পত্রে তিনি লেখেন, জনশিক্ষা প্রসারের ও রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক নতুন কর বসানোর প্রস্তাব আলোচনার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ভূম্যধিকারীদের একটি সভা আহ্বান করে। এই সভার সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, বর্তমানে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত অর্থদানে ও সরকারী সাহায্যে শিক্ষার অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে এবং রেভারেণ্ড লঙ প্রস্তাবিত বাধ্যতামূলক শিক্ষাকর বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে কোন উন্নত ব্যবস্থা নয়। তাই তাঁরা লঙের প্রস্তাব গ্রহণ করতে অপারগ।[১০৫]

সুতরাং বাংলাদেশের সমস্ত ভূম্যধিকারীরা মাতৃভাষার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারেরবিষয়ে রেভারেণ্ড লঙের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁরা এই প্রস্তাবকে প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে কোন উন্নত ব্যবস্থা মনে করেননি। সুতরাং মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যাপক ভিত্তি গড়ে না ওঠায় উচ্চ শ্রেণী থেকে নিম্নের দিকে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারিত হয়নি। তার ফলে কতিপয় ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে বৃহৎ সংখ্যক দরিদ্র অশিক্ষিত জনসাধারণের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিভিন্ন জেলায় লোকসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে যে পরিবর্তন ঘটে তার ফলে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধানের সমস্যা সাম্প্রদায়িক ও জাতিভেদ সংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

(গ) **মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চা**— উপরে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হল তা আরও বিশদভাবে আলোচনা করতে হলে অ্যাংলিসিষ্ট-ওরিয়েন্টালিষ্ট বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভার্ণাকুলার স্কুল ও শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাব বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতেই ডেভিড হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব প্রচলিত ভার্ণাকুলার স্কুলগুলোর উন্নতির চেষ্টা করেন। ইংরেজি ভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেও তাঁরা বাংলাভাষায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশে ভার্ণাকুলার এডুকেশনের প্রসারের জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টা হেয়ার ও রাধাকান্তের আমলেও অব্যাহত থাকে। বস্তুতঃ প্রথম দিকে হেয়ার ভার্ণাকুলার এডুকেশনের প্রসারে সহায়তা করেন।[১০৬] কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারী নীতির ফলে ইংরেজি ভাষা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। ভারতীয়দের ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও আর্ট বিষয়ে শিক্ষাদান ও তাদের নৈতিক মান উন্নত করবার অভিপ্রায়ে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল আমহার্ষ্ট 'পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কমিটি' গঠন করেন।[১০৭] কিছু দিনের মধ্যেই পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কমিটিতে দুটো গ্রুপের আবির্ভাব হয়। একটি গ্রুপ সংস্কৃত ও আরবি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সমর্থক ছিল। তাদেরই ওরিয়েন্টালিষ্ট নামে অভিহিত করা হয়। আর একটি গ্রুপ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে দেশবাসীকে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিল। তারাই এ্যাংলিসিষ্ট নামে পরিচিত। বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিতর্কে লিপ্ত হয়। রামমোহন রায় অ্যাংলিসিষ্টদের সমর্থক ছিলেন এবং এই মর্মে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ড আমহার্ষ্টকে তিনি একটি পত্র দেন। লক্ষণীয় এই যে, যখন অ্যাংলিসিষ্ট ও ওরিয়েন্টালিষ্টদের মধ্যে বাদবিতণ্ডা চলে তখন কোন গ্রুপই সাধারণ মানুষের কথা যেমন মনে রাখেনি, তেমনি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষার প্রতিও কোন গুরুত্ব আরোপ করেনি।[১০৮] অবশেষে

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মার্চ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক লর্ড মেকলের Minute (শিক্ষাবিষয়ক মতামত) গ্রহণ করেন এবং সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করেন। তাছাড়া সরকার কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, শিক্ষাখাতে নির্দিষ্ট অর্থ ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হবে।[১০৭]

এইভাবে ভার্ণাকুলার এডুকেশন অবহেলিত হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই ও ২৩ ডিসেম্বর এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ এপ্রিল উইলিয়াম অ্যাডাম তিন খণ্ডে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করেন। কিন্তু অ্যাডামের এডুকেশন রিপোর্ট প্রকাশের পরেও বিদ্বৎ-সমাজ সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে উৎসাহিত হননি। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের প্রশ্নটি তাঁদের মনে বিশেষ কোন আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। অথচ সুদূর স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী অ্যাডাম উপলব্ধি করেন, বাংলাদেশের পাঠশালাসমূহের শিক্ষা "জনগণের জীবনযাপন প্রণালী অনুসারী" এবং এই পাঠশালাকে "যদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংস্কৃত করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারে ইহাই আশু ফলপ্রদ হইবে।" তাই অ্যাডাম প্রচলিত জনশিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই জাতীয় শিক্ষাসৌধ গড়ে তুলবার প্রস্তাব করেন।

খুব সংক্ষেপে অ্যাডামের পরিকল্পনাটি এখানে উল্লেখ করা হল ঃ (১) অ্যাডাম গ্রামকে মূল ইউনিট ধরে শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। অর্থাৎ গ্রামের পাঠশালা জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি হবে। যেমন গ্রাম হতে থানা, থানা হতে মহকুমা, মহকুমা হতে জেলা, জেলা হতে বিভাগ, বিভাগ হতে প্রদেশ, তেমনি শিক্ষাও উচ্চ হতে উচ্চতর হবে। (২) প্রথমতঃ পাঠশালায় মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হবে। পাঠশালায় চারটি শ্রেণী থাকবে এবং চার রকমের পাঠ্যপুস্তক থাকবে। পাঠ্য বিষয়ে পল্লীজীবনের উপযোগী সাধারণ ও ব্যবহারিক জ্ঞান থাকবে, যথা—বর্ণ পরিচয়, শুভঙ্কর ও উগ্র বলরামের গণিত,

ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, বাংলা শুদ্ধ লিখন, দলিলপত্র, দেশীয় আইন, স্থানীয় শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান, এ সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়। (৩) অ্যাডাম ধর্ম-শিক্ষাকে পাঠ্যতালিকায় রাখলেও, কোন বিশেষ ধর্মের আচার-আচরণ সম্বন্ধে শিক্ষাদানের পরিবর্তে ধর্মের মূল সত্য, যার সঙ্গে সকল ধর্মেরই মিল রয়েছে, তাকেই ধর্ম-শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। (৪) যাতে শিক্ষকেরা নির্ঝঞ্ঝাটে শিক্ষাদান-কার্যে ব্রতী থাকতে পারেন সেজন্য অ্যাডাম সর্বাগ্রে শিক্ষকদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেবার কথা বলেন। (৫) অ্যাডাম বলেন, জনশিক্ষার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। যদি অন্য কোন সূত্র থেকে অর্থ সংগৃহীত না হয়, তাহলে সরকারকেই তা দিতে হবে।[১১০]

অ্যাডাম লেখেন, পাঠশালার শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন করে পাঠশালার উৎকৃষ্ট ছাত্রদের ক্রমান্বয়ে থানা, মহকুমা ও জেলার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়সমূহে পাঠাতে হবে। জেলার বিদ্যালয়ে যারা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে তারা রাজধানীর মহাবিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পাবে। তাঁর মতে, এই ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন দরিদ্রতম অধিবাসীরাও সাধারণ শিক্ষার আস্বাদ পাবে, তেমনি অন্যদিকে উৎকৃষ্ট ছাত্ররাও উচ্চতম শিক্ষালাভ করে দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ পূর্বক নিজেদের উন্নত করতে পারবে।[১১১]

উল্লেখযোগ্য এই যে, দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা অনুসন্ধান করে গভর্ণমেণ্টকে রিপোর্ট দেবার জন্য অ্যাডামকে কমিশনার করার ছয় সপ্তাহের মধ্যেই ভারত গবর্ণমেণ্ট ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহন করে। সেই সময়ে মেকলে প্রমুখ শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যে 'filtration theory' প্রচার করেন তার প্রধান প্রতিবাদ্য বিষয় এই ছিল, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরা শিক্ষালাভ করলে তা ক্রমান্বয়ে সমাজের নিম্নস্তরে অজ্ঞ ও দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হবে। এই নীতি অবলম্বন করার মূলে অর্থনৈতিক কারণও

ছিল। ভদ্র সঙ্গতিপন্ন পরিবারের ছেলেদের শিক্ষার জন্য সরকারের কোষাগার হতে অল্প অর্থ ব্যয় করলেই চলবে, কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হবে। গবর্ণমেণ্ট এই দায়িত্ব পরিহার করতে চেষ্টা করে। সুতরাং ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করে সুলভে সরকারী কর্মচারী সংগ্রহ করা ও নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির চিন্তাও এই নতুন তত্ত্বে প্রতিফলিত হয়।[১১২] অবশ্য অ্যাডামের প্রস্তাব ছিল এই তত্ত্বের বিপরীত। অ্যাডাম জনশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের নিকটে ইংরেজ শাসনকে প্রীতিপদ করার কথা চিন্তা করেন। ইংরেজিকে যখন শিক্ষার বাহন করা হয় তখন বাংলাভাষার কথা যেমন কারও মনে আসেনি, তেমনি দেশীয় পাঠশালাগুলোকে উন্নত করে তাকেই ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও কেউ উপলব্ধি করেনি। তাই অ্যাডামের রিপোর্ট সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়নি। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বর বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড যে শিক্ষাবিষয়ক বিখ্যাত 'মিনিট' রচনা করেন তাতেও তিনি অ্যাডামের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দেন।[১১৩] এইভাবে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি যে পাঠশালা তা অনাদৃত হয় এবং বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা হয়নি। অবশ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে বাংলা রচনা শিক্ষার সামান্য ব্যবস্থা বাংলাভাষা ও সাহিত্য-চর্চার কিছুটা সুযোগ করে দেয়।[১১৪]

ভার্ণাকুলার এডুকেশনের সম্ভাবনা নষ্ট হলেও উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন হিন্দু নেতাসহ কয়েকজন খ্রীষ্টান মিশনারী ও সরকারী কর্মচারী এই বিষয়ে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাও লক্ষণীয়। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গপ্রদেশে (বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা) ১০১টি বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জনশিক্ষার জন্য সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করে তিনি ভারতবাসীর চিত্ত জয় করতে চেষ্টা করেন। এইসব বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে সকল বিষয় পড়ানো হত। এই বিদ্যালয়গুলোকে 'বঙ্গ বিদ্যালয়' বা 'হার্ডিঞ্জ স্কুল' নামে উল্লেখ করা

হয়। অবশ্য এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাসিক বেতন দিতে এবং নিজ ব্যয়ে পুস্তক ক্রয় করতে হত। কিন্তু তিন-চার বৎসরের মধ্যেই "উপযুক্ত পরিচালক, পরিদর্শক ও পাঠ্যপুস্তকের অভাবে" এবং "বাংলা শিক্ষার প্রতি কর্তৃপক্ষের একান্ত ঔদাসীন্যে"র ফলে এই বিদ্যালয়গুলো দুর্দশায় পতিত হয়। বলা বাহুল্য, সরকারের সমস্ত স্নেহই বর্ষিত হয় ইংরেজি বিদ্যালয়ের ওপর।[১১৫]

পরবর্তীকালে স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাংলা শিক্ষা ও বাংলা পাঠশালার দ্রুত উন্নতি কিভাবে করা যায়, এই বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চান। বিদ্যাসাগর তাঁর অভিমত একটি পরিকল্পনার আকারে লিখে হ্যালিডের নিকট প্রেরণ করেন। হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনাকে বাংলা শিক্ষা তথা বাংলা পাঠশালার উন্নতির সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বলে গ্রহণ করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে হ্যালিডে ছোটলাট রূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নির্দেশে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের নিকট বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনানুযায়ী কার্যারম্ভের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু এই আবেদনের পূর্বেই ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুলাই বিখ্যাত শিক্ষা-বিষয়ক ডেস্‌প্যাচ ইংলণ্ড থেকে এদেশে এসে পৌঁছয়। এই ডেসপ্যাচে ইংরেজ-অধিকৃত "প্রদেশের উচ্চ মধ্য নিম্ন ব্যবহারিক সাধারণ সকলপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও নির্দেশ এবং সরকারী শিক্ষা বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাব ছিল।" সুতরাং এক ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতে গেলে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনারও কিছু অদল-বদল হয়তো প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পানুযায়ী কাজ সুরু করতে অনুমতি দান করে।[১১৬]

এইসময়ে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনাকে ভিত্তি করেই জনশিক্ষা-কল্পে গবর্ণমেণ্টের কার্যকর প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। বিদ্যাসাগর শিক্ষণীয় বিষয়গুলি চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য

যেসব গ্রন্থকে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করেন তার মধ্যে তাঁর নিজের, অক্ষয়কুমার দত্তের ও অন্যান্য খ্যাতনামা গ্রন্থকারের শিশুপাঠ্য গ্রন্থসমূহ ছিল। আর বর্ণপরিচয় থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রনীতি, শারীরতত্ত্ব ইত্যাদি পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া শিক্ষকেরা যাতে নিয়মিত বেতন পান তাও বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেন। প্রথমে তিনি হুগলি, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই চারটি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে পঁচিশটি আদর্শ বিদ্যালয় এমন জায়গায় স্থাপনের প্রস্তাব করেন যেখানে এইসব স্কুলের নিকটে কোন ইংরেজি স্কুল বা কলেজ থাকবে না। তাঁর ধারণা ছিল, "ইংরেজি কলেজ ও স্কুলের আশেপাশে বাংলা শিক্ষা ঠিকভাবে আদৃত হয় না।" তিনি এইসব বিদ্যালয় যথারীতি তত্ত্বাবধানের জন্যও কয়েকটি প্রস্তাব করেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, বিদ্যাসাগর আদর্শ বাংলা বিদ্যালয় সম্পর্কে প্রধানতঃ এসকল ব্যবস্থার প্রস্তাব করলেও প্রচলিত দেশীয় পাঠশালাগুলোর কথাও ভুলে যাননি।[১১৭] এইসময়ে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এডুকেশন ডেসপ্যাচ অনুযায়ী শিক্ষাবিভাগের সংস্কার করে বাংলাদেশ সরকার ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের ওপর শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ভার অর্পণ করে। তা সত্ত্বেও ছোটলাট হ্যালিডের পরামর্শে বাংলা শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়।[১১৮] তবুও মনে রাখা প্রয়োজন, বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা জনশিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে সহায়ক হলেও একে পুরোপুরি জনশিক্ষা বলা যায় না। কারণ তিনি ইংরেজি স্কুল-কলেজগুলোকে অটুট রেখেই দেশীয় পাঠশালাগুলোর কথা মনে রেখে আদর্শ বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারের কথা চিন্তা করেন। ঠিক অ্যাডামের মত ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় এই পরিকল্পনায় পাওয়া যায় না। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মার্চ ইংরেজি সম্পর্কে যে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাকে সম্পূর্ণ বজায় রেখেই বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের যে পরিকল্পনা বিদ্যাসাগর করেন তাতে জনশিক্ষার

পথ মোটেই প্রশস্ত হয়নি। আর তা সম্ভবও ছিল না। কারণ সরকারী নীতি, বিশেষ করে filtration theory, বৃহত্তর জনসমষ্টিকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখে। শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর সহায়তায় নিজেদের শাসনকে সংহত করার দিক থেকে এই তত্ত্বই ছিল সবচেয়ে বেশী উপযোগী। এই অবস্থায় বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর আরও কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি উন্নতধরণের পাঠশালা স্থাপন করে বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। হিন্দু কলেজ পাঠশালার আদর্শে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন করেন। কলকাতাতে অনেক স্কুল-পাঠশালা ছিল। তাই ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল 'তত্ত্ববোধিণী পাঠশালা'টিকে বাঁশবেড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২৭ জন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কার ঠাকুর কোম্পানী ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কারবার বন্ধ করে দেওয়ায় আর্থিক সাহায্য দিয়ে এই পাঠশালাটি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং পাঠশালাটি উঠে যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরে একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপিত হয়। নদীয়া জেলার সুখসাগরেও একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে এইসব বে-সরকারী প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয় হলেও শেষ পর্যন্ত তা জনশিক্ষা প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়নি।[১১২] যে অবস্থায় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা পাঠশালায় নতুন নিয়ম চালু হয় তাও লক্ষণীয়। কলকাতায় জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ঝোঁক অনেকদিন আগে থেকেই ছিল। এই সময়ে বাংলা পাঠশালায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের কথা উঠলে ছাত্রদের অভিভাবকদের নিকট হতে মতামত গ্রহণ করা হয়। তাতে দেখা যায়, শতকরা নব্বই জন অভিভাবক পাঠশালায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের অনুকূলে মত দেন। তারপরেই পাঠশালায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন

হয়। অবশ্য ইংরেজি শিক্ষার জন্য কম সময় থাকত। বাংলা শিক্ষার জন্যই বেশী সময় দেওয়া হত। তার ফলে ইংরেজি বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে আর ছাত্র ভর্তির প্রয়োজন ছিল না। বাংলার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয় আয়ত্ত হওয়ায়, ইংরেজি কম জানলেও, তা পূরণ করা কষ্টকর হত না। সুতরাং এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা যেভাবে গঠন করা হয়, অনেকটা তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পাঠশালায় ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হয়। তাতে জনগণের জীবনযাপন প্রণালী অনুসারী স্বদেশীয় পাঠশালাগুলো ক্রমান্বয়ে বিলীন হয় এবং বাংলাভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রসারও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[১২০]

টোল-চতুষ্পাঠী-মাদ্রাসা-মক্তব ছিল হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির নিজস্ব ধারা সংরক্ষণের কেন্দ্র, আর তা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু পাঠশালা ছিল সাধারণের শিক্ষাক্ষেত্র। উনবিংশ শতাব্দীর সুরু হতে এই পাঠশালাগুলোকে সংস্কার করে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা নতুন ধরনের পাঠশালা স্থাপনে অগ্রসর হন। আর ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরাও পাঠশালাকে আশ্রয় করে নব্যশিক্ষা প্রচারে যত্নবান হন। প্রসঙ্গতঃ চুঁচুড়ার পাদ্রী রবার্ট মে-র পাঠশালা (১৮১৪ খ্রী), বর্ধমানে চার্চ মিশনারী সোসাইটির সহায়তায় ক্যাপটেন জেমস স্টুয়ার্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা (১৮১৭ খ্রী), শ্রীরামপুরের মিশনারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮ খ্রী) কর্তৃক পরিচালিত পাঠশালা, কলকাতার অবৈতনিক বিদ্যালয়, মফস্বলে বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে।[১২১] ডিরোজিওর শিষ্য উদয়চন্দ্র আঢ্য বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচলনের একজন প্রবক্তা ছিলেন।[১২২] ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাও বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম ও আইন-আদালতের ভাষা করার কথা বলে। ১৮৩৫

খ্রীষ্টাব্দে 'জ্ঞানান্বেষণ' কাগজে লেখা হয়ঃ "আদালত জজ সাহেবদের আরামের জায়গা নয়, কিন্তু জনসাধারণের সুবিধার জন্য। আদালত ন্যায় বিচারের মন্দির বলিয়া ধরা হয় কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার কলেজ বলিয়া নয়। সুতরাং বাংলাদেশের জনসাধারণ এখানে নিজেদের ভাষা ব্যবহার করিবে।"[১২৩] ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দেও ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব।[১২৪] মোট কথা, তাঁরা অনুভব করেন কেবলমাত্র ইংরেজিকে অবলম্বন করাই উচিত হবে না, মাতৃভাষারও প্রসার প্রয়োজন। লক্ষণীয় এই যে, যে ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় অ্যাংলিসিষ্ট মতের সমর্থক ছিলেন এবং মেকলের বিখ্যাত মিনিট (১৮৩৫ খ্রী) রচনার সহায়ক হন, তাঁরা মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও, জনশিক্ষা কেন কার্যকরী হচ্ছে না তার কোন সঙ্গত ও বিস্তৃত আলোচনা তাঁদের রচনায় পাওয়া কষ্টকর।[১২৫]

কিন্তু এতসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ্ডীর বাইরে বিশেষ প্রসারিত হয়নি। আর জনশিক্ষার উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেন জনশিক্ষা ব্যর্থ হল, তার কয়েকটি কারণ এখানে উল্লেখ করা হলঃ (ক) জনশিক্ষার প্রতি সরকারের কোন সমর্থন ছিল না। হ্যালিডের পরে (১৮৬২ খ্রী) একজনও প্রভাবশালী সরকারী অফিসার জনশিক্ষা সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখাননি। বস্তুতঃ শিক্ষাবিভাগের দায়িত্বশীল অফিসারেরা জনশিক্ষার প্রসার চাননি। তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থাকে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের শাসনের উপযোগী করে পরিচালনা করেন। (খ) সরকারী নীতির ফলে বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে কোন চাকরি পাওয়া কষ্টকর ছিল। স্বভাবতই বাঙালী ভদ্রলোকেরা বাংলা বিদ্যালয়গুলোর প্রতি বিমুখ ছিলেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বাংলাভাষায় শিক্ষিত হয়ে তাঁদের চাকরির ভাগীদার হবে তা তাঁরা মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই বাংলা-

ভাষায় শিক্ষার প্রসার না হওয়াতে ও জনশিক্ষা বৃদ্ধি না পাওয়ায় বাঙালী ভদ্রলোকেরা খুশীই হন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিষয়টি অনেকের নিকটেই অবাস্তব মনে হয়। তাই দেখি, বিদ্যা-সাগরের মত মহান ব্যক্তি, যিনি বাংলাভাষায় বিদ্যা বিকিরণের পথ সুগম করে দেন, তিনিও মনে করেন ঃ "উচ্চশিক্ষা বাদ দিয়ে জন-সাধারণের শিক্ষার চেষ্টা উচিত নয়। কোন দেশেই গণশিক্ষা সম্ভব হয়নি, এদেশে তা অসম্ভব।" ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর এই মত ব্যক্ত করেন।[১২৬] সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর ভদ্রলোকের শ্রেণীগত দোষগুণের উর্দ্ধে ওঠা বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব হয়নি। অথচ নিম্নশ্রেণীর মানুষ ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি তাঁর দরদের অভাব ছিল একথা তো কেউ বলতে পারবেন না।[১২৭] একই উক্তি উনবিংশ শতাব্দীর অনেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভার্ণাকুলার এডুকেশন অবহেলিত হওয়ায় বাঙালী জাতির পক্ষে তা কল্যাণকর হয়নি। বাংলাভাষার প্রতি শিক্ষিতদের আগ্রহের এতটা অভাব ছিল যে, তাঁরা বিভিন্ন আলোচনা সভায় সাধারণতঃ ইংরেজি ভাষাতেই ভাষণ দিতেন বা রচনা পাঠ করতেন। প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ অক্ষয়কুমার দত্তই সর্বপ্রথম প্রচলিত প্রথা অগ্রাহ্য করে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থে অনুষ্ঠিত জনসভায় বাংলা ভাষায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন।[১২৮] এইসময় থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। অবশ্য বাংলা ভাষা নিয়ে চর্চা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন সাধন করেনি। ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন এই সমস্যার প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের নিকট এক অনবদ্য ভাষণে বলেন, লক্ষ লক্ষ বাঙালী ইংরেজি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন তা কখনই সম্ভব নয়। অনেকদিন পূর্বে ইংলণ্ডে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার যে ধরণের মর্যাদা ছিল, ইংরেজি ভাষাকে বাংলাদেশে

সেই ধরণের মর্যাদা দেওয়া উচিত। ইংরেজির মাধ্যমে ছাত্ররা যে নতুন চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসবেন তা তাঁদের নিজস্ব ভাষাতে স্বদেশবাসীর নিকট পৌঁছে দিতে হবে। তাহলেই বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে ও জনসাধারণের মধ্যে নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ হবে।[১২৯] এই বেথুন সাহেবই মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাংলায় লিখতে উৎসাহিত করেন।[১৩০] ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর লেখেন : "বাঙলা দেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সমৃদ্ধ ও উন্নত বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।"[১৩১] ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের কর্মবহুল জীবন বিস্তৃত ছিল। আর এই সময়েই তাঁর রচনাবলীর ফলে বাংলাভাষা ও সাহিত্য উৎকর্ষতা লাভ করে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের সভায় বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন, তাতেও একই মত প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন : 'আমরা বাঙালীরা ভুলে গেছিযে, বাংলাভাষার মাধ্যমেই জনসাধারণকে গতিশীল করা যায়। আমরা ইংরেজিতে প্রচার করি, ইংরেজিতে জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা করি এবং ইংরেজিতে লিখি। আমরা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাই যে, বৃহত্তর জনসমষ্টিকে সমাজ সংস্কারের সমর্থনে সমবেত করা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের ইংরেজি ভাষা তাদের কর্ণে কখনই প্রবেশ করবে না। আমার মনে হয়, যদি একটি মস্ত বড় চিন্তাও জনসাধারণের ভাষায় তাদের নিকট পৌঁছে দেওয়া যায় এবং সেই ভাষাতে প্রচার করা যায় যা তাদের অন্তরকে স্পর্শ করে, তার যা সুফল পাওয়া যাবে তা আমাদের সমস্ত ইংরেজি ভাষণ ও প্রচার দ্বারা কখনই লাভ করা সম্ভব হবে না।' এই দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য সাহিত্যের গুরুত্ব উল্লেখ করেন।[১৩২]

বঙ্কিমচন্দ্র খুব সঠিকভাবেই সমস্যাটি তুলে ধরেন এবং সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু এই ভাষণের কোথাও তিনি বলেননি যে, এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে বাংলাভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের

মধ্যে শিক্ষা প্রসার করা বিশেষ প্রয়োজন এবং ইংরেজি ভাষাকে ভিত্তি করে যে শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করা হয়েছে তাও পরিবর্তিত করা উচিত। তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের মত তিনিও সাহসের সঙ্গে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেননি ঃ বাংলাভাষায় জনসাধারণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা না করে তাদের কি করে গতিশীল করা যায়? শিক্ষিত বাঙালীরা গুরুত্ব সহকারে জনশিক্ষার বিষয়টি গ্রহণ করেননি এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে সমগ্র বাঙালী সমাজের ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়েও কোন সুচিন্তিত আলোচনা তাঁরা করেননি। তাঁদের স্বার্থ নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্টই ছিলেন। বাংলাদেশে শিক্ষা বিভাগের অফিসার ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ প্রচলিত ভার্ণাকুলার এডুকেশন তাঁর নিকট অনেকটা ঋণী। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত সরকারী নীতিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়নি। তাছাড়া উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে জন-শিক্ষার প্রতি যে ঔদাসীন্য ছিল তাও তিনি দূর করতে সক্ষম হননি। উনবিংশ শতাব্দীর গ্রাম বাংলায় যে এক নতুন বিত্তবান শ্রেণীর আবির্ভাব হয় তাদের সম্পার্কে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হাণ্টার যে মন্তব্য করেন তা উল্লেখযোগ্য। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের মন্বন্তরের সঙ্গে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মন্বন্তরের পার্থক্য আলোচনা প্রসঙ্গে হাণ্টার লেখেন, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের বর্তমান মন্বন্তরের সময়ে দেখা যায় গ্রামে একটি ধনিক শ্রেনী আছে এবং মন্বন্তর তাদের একেবারেই স্পর্শ করতে পারেনি। গ্রামের জমিদার, মহাজন, বিত্তবান দোকানদার ও ধণী কৃষক ইত্যাদি শ্রেণীর সন্তানেরা যথারীতি স্কুলে পড়াশুনা করছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় লেখেন, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মন্বন্তরের সময়ে যখন দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত তখন গ্রামের এই বিত্তবান শ্রেণী তাদের সন্তানদের আরও ভালোভাবে শিক্ষাদানের জন্য খুবই ব্যগ্র হয়। এই

শ্রেণীর অধ্যয়নরত ছাত্রদের বিদ্যালয়সমূহের উন্নতিও যথেষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষের ফলে এই বিত্তবান শ্রেণীর কোনও ক্ষতি হয়নি, তারা লাভবানই হয়। হাণ্টার ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়ে গ্রামের ধনী ও গরীব শ্রেণীর অবস্থার এক বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। এই বিত্তবান শ্রেণী যে জনশিক্ষার প্রতি মোটেই আগ্রহশীল ছিল না তা এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১৩৩]

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' 'বাঙ্গালা ভাষা ও নিম্নশ্রেণীর প্রজা' নামক প্রবন্ধে বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে যে প্রস্তাব করে তাও লক্ষণীয়। এই প্রবন্ধে লেখা হয়ঃ "যদি কেহ বাঙ্গালার উন্নতি করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে অগ্রে ঐ ভাষায় শিক্ষিতদিগের উন্নতির উপায় করা কর্ত্তব্য। পরে নর্ম্যাল স্কুলে সংস্কৃতের উচ্চশিক্ষা এবং সংস্কৃত কলেজে, সংস্কৃত ও ইংরাজী অধ্যাপনার উৎকর্ষ সাধন করুন, তাহা হইলে বাঙ্গালা আপনা আপনি উন্নত হইবে। অন্যথা ভস্মে আহুতি প্রদান সার হইবে। গোটাকতক বাঙ্গালার বাঁধি বোল শিক্ষা দিলে, নিম্নশ্রেণীর লোকের শতবর্ষেও উন্নতি হইবে না। যাহাতে তাহারা বাঙ্গালা পাঠশালার প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া শিল্পালয় ও নর্ম্যাল স্কুলে প্রবেশ করিতে পারে তাহার সুবিধা করা কর্ত্তব্য। নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রেরা কেবল শিক্ষক না হইয়া, উকীলও হইতে পারে, এরূপ নিয়মও অত্যাবশ্যক। যাঁহার অধিক শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হইবে, তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবেন। বস্তুতঃ ভাষা শিক্ষা সহকারে শিল্প ও কৃষি প্রভৃতি জীবন্ত ব্যবসায় শিক্ষা প্রদান না করিলে, এদেশের নিম্নশ্রেণীস্থ নিরন্ন প্রজাদিগের উন্নতি দূরে থাকুক কোন উপকারই দর্শিবে না। বরং অপকারই হইবে।" এই প্রবন্ধে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' লেখে যে, আদালতে বাংলাভাষার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই ভাষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহও হ্রাস

পায়। আর যে নর্মাল স্কুলের ছাত্ররা বাংলাভাষার প্রকৃত সেবক তাঁদেরও কোন শুভ সংবাদ পাওয়া যায় না।[১৩৪] বলা বাহুল্য, 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র এই প্রস্তাব সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। সরকার জনশিক্ষার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়নি। আর বে-সরকারী প্রচেষ্টায় তা করা কখনই সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ ভার্ণাকুলার এডুকেশনের প্রসারণ না করে গণতান্ত্রিক-উদারনৈতিক ভাবধারায় সাধারণ মানুষের মনকে সিঞ্চিত করা সম্ভব হয়নি বলেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা সাহিত্যের যে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ঘটে তার রসাস্বাদন থেকে তাঁরা বঞ্চিত থাকেন। ফলে গোটা জাতির মনকে তা আন্দোলিত করতে পারেনি।

(ঘ) হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন—উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ধর্ম ও সমাজ জীবনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ও পুনরুজ্জীবনের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অনেকেই জাতীয়তাবাদ বলতে হিন্দু জাতীয়তাবাদই মনে করেন। হিন্দুয়ানি ও জাতীয়তা প্রায় সমার্থক হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, এই মনোভাব শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করে। এই হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রধান মুখপাত্র ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন তা থেকেই Hindu Revivalist আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। শিক্ষিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ যখন একটি স্বতন্ত্র পথে মুসলমানদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন তখন কোন কোন হিন্দু নেতার মনে তা কি ধরণের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা আলোচনা করলেই দুই সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যবোধের ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু লেখেন, মুসলমানেরা যখন ন্যাশন্যাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশনে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন, তখন হিন্দুদেরও 'মহাহিন্দু সমিতি' গঠন করা উচিত। তিনি আরও বলেন ঃ "মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য

বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত জমি কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেইরূপ হিন্দু সমাজই আমাদের কার্যের ক্ষেত্র হইবে।"[১৩৫] ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু লিখিত 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' প্রকাশিত হয়। তাতেও তিনি হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের উপায় নির্দেশ করেন। তিনি এই পুস্তিকায় 'মহাহিন্দু সমিতি'র উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লেখেন ঃ "হিন্দুদিগের ধর্ম বিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয়ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দু জাতির উন্নতি সাধন করা।" তিনি বলেন, গ্রামে ও শহরে 'মহাহিন্দু সমিতি'র শাখা-প্রশাখা গঠন করা প্রয়োজন। তাঁর ধারণা ছিল, যদি হিন্দুরা তাঁদের প্রাচীন গৌরব ও ধর্ম সম্পর্কে সজাগ হন তা হলে সামাজিক বৈষম্য সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে একতার মনোভাব জাগ্রত হবে। এই উদ্দেশ্যেই সংস্কৃত ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও রাজনারায়ণ বসু হিন্দীভাষাকে হিন্দুদের সাধারণ ভাষা করার কথা বলেন।[১৩৬]

এই সময়ে আরও কয়েকজন হিন্দু নেতা হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের সপক্ষে আন্দোলন সুরু করেন। তাঁরা নারীমুক্তির বিরোধিতা করেন এবং বাল্যবিবাহের ও জাতিভেদ প্রথার সমর্থনে প্রচার করেন। যাঁরা বাল্যবিবাহের সমর্থক ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয় কুমার সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিষ্ণুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জয়গোবিন্দ সোম, মনোমোহন বসু, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে শোভাবাজার রাজবাড়িতে বাল্যবিবাহের সমর্থনে জনসভা করেন।[১৩৭] রাজনারায়ণ বসু বলেন, জাতিভেদ প্রথা তুলে দিলে দেশের অমঙ্গল হবে। গিরীশ চন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল বসুর রচনাতেও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের উপকরণ পাওয়া যায়।[১৩৮] এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকাও লক্ষণীয়।[১৩৯]

এইভাবে বাংলার নবজাগরণে যেমন শিক্ষিত হিন্দুরা যুক্তিশীল

মননের অধিকারী হন, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেন, তেমনি নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতাও তাঁদের মনের অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে।

(১০) হিন্দু-মুসলিম যৌথ প্রয়াসের পথে অন্তরায় ঃ

কি অবস্থায় হিন্দু-মুসলিম নেতৃত্ব পরস্পর দূরত্ব বজায় রেখে স্বতন্ত্র পথে চলেন তা আলোচনা করা হল। আমরা দেখতে পেলাম, বিচ্ছিন্নতাবাদের উপকরণসমূহ এক সুস্থ সবল বাঙালী জাতি গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়। তবুও দীর্ঘকাল ধরে একই ভৌগোলিক সীমানায় ও জলবায়ুতে বসবাস করায়, একই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে থাকায়, একই ভাষায় মনের আদান-প্রদান হওয়ায় এবং একই সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে একই মনস্তাত্ত্বিক গড়নের প্রতিফলন হওয়ায়, ধীরে ধীরে আধুনিক বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটে। আবার এই বাঙালী সত্তা সর্বভারতীয় জাতীয় সত্তার মহান সঙ্গমে প্রবহমান হয়। ধর্মের প্রাচীর উভয়ের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেও জাতি গঠনের উপাদানসমূহ ক্রিয়াশীল থাকে। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও গ্রাম বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় এই ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তার পরেও তা অব্যাহত থাকে।[১৪০] অষ্টাদশ শতাব্দীর বাউল, জিকির প্রভৃতি সাধক মণ্ডলীর ও হিন্দু সমাজেরকয়েকটি ধর্মীয় গ্রুপের প্রচারের ফলে উদারনৈতিক ভাবধারা প্রকাশিত হয়। হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ইত্যাদি মতের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়।[১৪১] ফরাজী-ওয়াহাবি মতবাদের ও মৌলবী-মওলানাদের প্রচেষ্টায় মুসলমানীকরণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হলেও এই উদারনৈতিক ভাবধারা ও বাঙালী জাতীয় সত্তার পক্ষে সহায়ক উপকরণ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি।

তাই দেখি তখনও গ্রাম বাংলায় বাউলদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় : "আমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।"[১৪২] একই সময়ে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির কণ্ঠে সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়গত স্বার্থের উর্দ্ধে উদার চেতনার বিকাশ ঘটে। এই সময়েই মীর মশাররফ হোসেন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রাখার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।[১৪৩] ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' কাগজে 'ঢাকা ও পূর্ববাঙলা' নামক প্রবন্ধে লেখা হয়ঃ "এখানকার হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে জাতিভেদ অপেক্ষাকৃত অল্প; এমনকি অনেক হিন্দু মুসলমানদের হুঁকাতে তামাক খায়, এবং এক আসনে বসে। তদ্ভিন্ন এক হুঁকাতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং অন্যান্য জাতিকেও তামাক খাইতে দেখা যায়।"[১৪৪] এমনি অনেক তথ্য গ্রামবাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে হিন্দু-মুসলিম যৌথ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজি বাংলা ইত্যাদি ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করবার উদ্দেশ্যে যে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি গঠিত হয় তাতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে মৌলবী করম হোসেন, মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ ও মৌলবী মহম্মদ আমিনুল্লাহও যুক্ত ছিলেন। এই সোসাইটি বাংলা ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, শিশুশিক্ষা সম্পর্কীয় গ্রন্থ রচনা করে। আর ইংরেজি ও আরবি সাহিত্য থেকে নীতিকথা অনুবাদ করে। এই সোসাইটির রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কি গভীর অধ্যবসায় সহকারে এই সোসাইটির কর্মকর্তারা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভিত সুদৃঢ় করেন এবং জাতীয় চেতনার পথ প্রশস্ত করেন।[১৪৫] তাছাড়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে যে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয় তার ম্যানেজিং কমিটিতেও চারজন মুসলমান ছিলেন। অবশ্য তাঁরা কেউ ইংরেজি জানতেন না।[১৪৬] শিক্ষার প্রসারে এই স্কুল সোসাইটির অবদান অনস্বীকার্য। এই সোসাইটির উদ্যোগে যেসব পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়

তাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রই একসঙ্গে অধ্যয়ন করত। তবে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যাই বেশী ছিল।[১৪৭] তেমনি শাসনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে ও অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে যৌথ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুর ও মুসলমানের স্বার্থের কথা ভেবে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাধাকান্ত দেব ইণ্ডিয়া বোর্ডের নিকট একটি আবেদনপত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিল সার্ভিসে মনোনয়নের ব্যাপারে যে মনোভাব ব্যক্ত করেন তা উল্লেখযোগ্য।[১৪৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অসংখ্য কৃষক ও উপজাতীয় বিদ্রোহ ও আন্দোলন গ্রাম বাংলাকে প্লাবিত করে। অবশ্য এইসব আন্দোলন এক পশ্চাৎপদ সামাজিক স্তরে সজ্ঘটিত হওয়ায় অনেক দুর্বলতা ও ত্রুটি প্রকটিত হয়। তাছাড়া যাঁরা এইসব আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাঁদের চেতনার মান অনুন্নত ছিল, আর সাংগঠনিক দক্ষতাও কম ছিল। তা সত্ত্বেও এইসব আন্দোলন মূলতঃ ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে যুক্ত সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়। সুতরাং এইসব আন্দোলনের উপনিবেশ বিরোধী ও সামন্ত প্রথা বিরোধী চরিত্র উল্লেখযোগ্য।[১৪৯] অনুন্নত ভারতের সামগ্রিক রূপটি যদি আমাদের চোখের সামনে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাবো তিনটি ধারায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের জাতীয় চেতনার মান ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং এই জাতীয় চেতনা অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নানা পথ বেয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান ধারায় প্রবাহিত হয়। এই তিনটি ধারা হল: (ক) কৃষক ও উপজাতীয় বিদ্রোহের ধারা, (খ) রামমোহন থেকে আরম্ভ করে শিক্ষিত হিন্দু-ব্রাহ্ম মধ্যবিত্ত পরিচালিত ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের এবং উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা, (গ) মুসলিম সমাজের উন্নয়নের জন্য ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের এবং আবদুল লতিফ থেকে

আরম্ভ করে শিক্ষিত মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের ধারা। এই তিনটি ধারার মধ্যে কোন কোন ধারায় অগ্রসর পাশ্চাত্যের ও আরবি-ইরাণী-তুর্কী সংস্কৃতির প্রভাব যেমন পড়ে, তেমনি ভারতের নিজস্ব জীবনধারার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। সামন্ততান্ত্রিক-ঔপনিবেশিক পরিবেশে এই তিনটি ধারার সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনসমূহে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদানের এক জটিল সংমিশ্রণ ঘটায় এই তিনটি ধারার মিলিত প্রবাহের পথে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সক্ষম এমন কোন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের উদ্ভব তখন হয়নি। অবশ্য এই তিনটি ধারা পরস্পর মিলিত হয়ে প্রবাহিত হলে যে বেগের সঞ্চার করত তার ফলে হয়তো সহজ-স্বাভাবিক বলিষ্ঠতা নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনন বিকশিত হত। আর তখনই সত্যিকারের বাঙালী রেনেসাঁর পরিচয় আমরা পেতাম। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই তা সম্ভবপর হয়নি। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যেসব কৃষক ও উপজাতীয় বিদ্রোহ গ্রাম বাংলাকে প্লাবিত করে তার সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন আত্মিক সম্বন্ধ ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের ফলে সৃষ্ট ও একান্তভাবে ব্রিটিশ শাসনের ওপর নির্ভরশীল এই শ্রেণীর পক্ষে কৃষক বিদ্রোহগুলির নেতৃত্ব দেওয়া অথবা তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা সম্ভব ছিল না। ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকায় এই শ্রেণীর পক্ষে ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দাবি করাও সম্ভব হয়নি।[১০০] প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণী এইসব ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কারণ তাতে দেশের 'শান্তি' ও 'প্রগতি' বিঘ্নিত হয়ে তাঁদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করবে। দেশের ভাগ্য কারা নির্ধারণ করবে ?—এই প্রশ্নের চেয়ে তাঁদের নিকট বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল দেশের 'শান্তি' ও 'প্রগতি' বজায় রাখা। আর এই উদ্দেশ্য সাধনে ইংরেজ শাসনকেই তাঁরা একমাত্র সহায়ক মনে করেন। তাঁরা ইংরেজের সহযোগিতায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাব-

ধারাকে বিকশিত করতে চান। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক কারণে গ্রাম ও শহরের দূরত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদেশী শাসকদের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে যুক্ত করায়, গ্রাম বাংলায় এইসব অগণিত বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ নতুন শাসনের ভিত্‌কে বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হয়নি। এই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যাঁদের দূরদৃষ্টি ছিল এবং কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের দুরবস্থা দূরীকরণে জনমত জাগ্রত করতে গিয়ে তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দিলেও, ভূমি ব্যবস্থার গড়নের ফলে ও নতুন শাসনতন্ত্রের ফলে উদ্ভূত সমস্যার জন্য উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের একাত্মতা গড়ে ওঠেনি।[১৫১] কেবলমাত্র নীল বিদ্রোহের (১৮৫৯-১৮৬০ খ্রী) সময় দেখা যায়, এই তিনটি ধারা এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে। এই কারণেই নীল বিদ্রোহ বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনাকে এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করে। যেহেতু নীলবিদ্রোহের সময় জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল এবং ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারে তাঁদের স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হয়, সেজন্য তাঁদের পক্ষে নীলচাষীদের পক্ষ নেওয়া অনেক সহজ হয়।[১৫২]

কিন্তু নীল বিদ্রোহের উত্তাপ প্রশমিত হবার পরে এই তিনটি ধারা পুনরায় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পাবনার কৃষক বিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণে কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় আইনের ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি উল্লেখ করলেও তারা কৃষি সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনে জমিদারী প্রথার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী কৃষকের দুরবস্থা সম্পর্কে যে বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন না তার পরিচয় লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের কার্যবিবরণীতেপাওয়াযায়।[১৫৩] স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত আইনসমূহ (১৮৮৫-১৮৮৭ খ্রী) গ্রামীণ

পরিবেশকে পরিবর্তিত করে। নবগঠিত লোকাল বোর্ডে জমিদারেরাই ক্ষমতাশালী হন, আর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে আইনজীবীদের সঙ্গে জমিদারেরা কর্তৃত্ব করেন। এই বোর্ডগুলো ছিল সদস্যদের ক্ষমতা ও সম্মান প্রদর্শন করার প্রধান কেন্দ্র। স্বভাবতই এই বোর্ডগুলোকে ভিত্তি করেই গ্রাম্য জীবনের জটিলতা বৃদ্ধি পায়।[১৫৪] এই সময়েই শিক্ষিত মুসলমানেরা একটি সুস্পষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হন। ইসলামের নামে ও অন্যান্য আশার বাণী শুনিয়ে তাঁরা সাধারণ মুসলমানদের ওপর নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে তৎপর হন। তখন থেকে প্রভাবশালী অগ্রসর উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু শ্রেণীর সঙ্গে অনগ্রসর বৃহৎসংখ্যক মুসলমান কৃষকের ও শ্রমজীবী মানুষের ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। যেহেতু সমাজে, অর্থনীতিতে ও রাজনীতিতে শিক্ষিত হিন্দু ও শিক্ষিত মুসলমানেরাই ছিলেন প্রভাবশালী এবং যেহেতু তাঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, সেজন্য বাঙালী জীবনে যৌথ প্রয়াসের ধারাটি অনেকটা যেন ক্ষীণকায়া তটিনীর মত প্রবহমান ছিল। বিপুল স্রোতস্বিনী নদীর মত দুকুল ছাপিয়ে পলিমাটি ফেলতে ফেলতে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবার মত গতিবেগ তখনও সে সঞ্চার করতে পারেনি। তাই এই ধারাটি বিচ্ছিন্নতাবাদের শক্তি হ্রাস করে বাঙালী জাতির ইতিহাসকে ভিন্নপথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়নি।

সূত্র নির্দেশ

১. এই বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দ্রষ্টব্য: (১) পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক (কলিকাতা, মে, ১৯৭২); (২) A Separate Homeland for the Muslims of India, Published in the Quarterly Review of Historical Studies, vol. xi. No. 3, 1971-72; (৩) New Light on the Lahore Resolution, Ibid, vol. xii, No. 2, 1972-73.

২, Zafarul Islam and Raymond L. Jensen, Indian Muslims and the Public Service 1871-1915, Published in the Journal of the Asiatic Society of Pakistan, vol. ix, No 1, Dacca, June, 1964, p.85, 145 (Henceforth abbreviated as J. A. S. P.) ; আমার গ্রন্থ 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক' দ্রষ্টব্য।

৩. Baboo Kissory Chand Mitra, On the Progress of Education in Bengal (a paper read on 24 July, 1867), in Transactions of the Bengal Social Science Association, First Session, July, 1867, vol. I, Part I, Calcutta, 1867, p. 55 (Henceforth abbreviated as Transactions) ; Moulvie Abdool Luteef Khan Bahadoor, Mahomedan Education in Bengal (a paper read on 30 January, 1868), in Transactions, vol. II, Part I, Calcutta, 1868, p. 45 ; A. R. Mallick, British Policy and the Muslims of Bengal 1757-1856, Dacca, 1961, Chapter vii.

৪. Amiya Kumar Bagchi, Private Investment in India 1900-1939, Cambridge University Press, 1972, p. 3.

৫. The Fifth Report From the Select Committee on the Affairs of the East India Company, vol. I, Bengal Presidency, Madras, 1883, pp. 674, 699 ; N. K. Sinha, The Economic History of Bengal, vol. I, Calcutta, 1961, pp. 2-5 ; N. K. Sinha, The Economic History of Bengal, vol. II, Calcutta, 1962, Chapters I, VIII ; Nirmal Kumar Bose, Calcutta : 1964 A Social Survey, Bombay, 1968, pp. 30-31 ; আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮), কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮।

৬. AbdoolLuteef, Mahomedan Education, in Transactions, vol. II, Part I, 1868, pp. 49-50 ; Maulavi Obaidullah

Alobaidi, Muhammadan Education in Bengal, in The Bengal Magazine, February, 1873, pp. 308-310.

৭. Anil Seal, The Emergence of Indian Nationalism, Cambridge University Press, 1968, p. 302 (see footnote).

৮. J. A. S. P., vol. ix, No. 1, 1964, pp. 87, 93.

৯. Rev. J. Long, The Social Condition of the Muhammadans of Bengal and the Remedies (a paper read on 21 January, 1869), in Transactions, vol. III, Part I, p. 13 ; The Bengal Magazine, February, 1873, pp. 310-311 ; Moulvie Abdool Luteef, A Minute on the Hooghly Mudrassah, Calcutta : December, 1861, Reprinted in Enamul Haque's 'Nawab Bahadur Abdul Latif His Writings and Related Documents,' Dacca, 1968, pp. 20-27.

১০. Abdool Luteef, Mahomedan Education, in Transactions, vol. II, Part I, 1868, pp. 45-64 ; E. Haque, op. cit., pp. 20-42.

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল লতিফ ক্যালকাটা মাদ্রাসার ইংরেজি-আরবি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখনই মুসলমানদের অবস্থার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চব্বিশ পরগণার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিল অব এডুকেশন মুসলমান যুবকদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য উদ্যোগী হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আবদুল লতিফ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করেন (Vide E. Haque, op. cit., P. 193).

১১. Rev. J. Long, Social Condition of the Muhammadans, in Transactions, vol. III, Part I, 1869, p. 5.

১২. Transactions of the Bengal Social Science Association, in two volumes (1867 to 1871), Calcutta. এই এসোসিয়েশনের শাখা বোম্বে, বিহার ও ওড়িষ্যাতেও ছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২৪৭ জন। তার মধ্যে ৯ জন মুসলমান ছিলেন

(একজন কলকাতা থেকে, আর আটজন বিহার ও ওড়িষ্যা থেকে)। কলকাতা থেকে আবদুল লতিফ একমাত্র মুসলমান সভ্য ছিলেন। এই এসোসিয়েশনে হিন্দু ও ইউরোপীয়ান সভ্যদের সংখ্যাই বেশী ছিল।

১৩. Abdool Luteef, A Minute on the Hooghly Mudrassah, See E. Haque, op. cit., P. 24. আবদুল লতিফ রচিত হুগলি মাদ্রাসা সম্পর্কীয় পুস্তিকা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হয় (Ibid, pp. 194-95.)

১৪. Ibid, pp. 24-25.

১৫. Ibid, p. 23.

১৬. Abdool Luteef, Mahomedan Education, in Transactions, vol. II, Part 1, 1868, pp. 45-64.

১৭. Ibid, pp. 49-54 ; E. Haque, op. cit., p. 60.

১৮. E. Haque, op. cit., p. 73.

১৯. Ibid.

২০. James Wise, Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, London, 1883, p. 36 ; Rev. G. H. Rouse, Islam O Ingraji School, Calcutta, 1888. ডাঃ জেমস ওয়াইজ ঢাকাতে দশ বৎসর সিভিল সার্জেন ছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে রুগী দেখতে গিয়ে তিনি ঢাকা ও তার নিকটবর্তী গ্রামের ও অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতালাভ করেন এবং জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে (Caste system) অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ডাঃ ওয়াইজ তেরো বৎসর পূর্ববঙ্গে ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জুলাই ডাঃ ওয়াইজ হঠাৎ মারা যান। তখন তাঁর স্ত্রী ডাঃ ওয়াইজ কর্তৃক সংগৃহীত প্রচুর তথ্য রিজলীকে দেন। রিজলী এইসব তথ্য প্রকাশ করেন। (Vide H.H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal, Ethnographic Glossary, Vol. 1., Calcutta : Printed at the Bengal Secretariat Press, 1892, pp. XIII-XV.) ডাঃ ওয়াইজ এই গ্রন্থে (Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal) শিক্ষিত মুসলমানদের মনোভাব

আলোচনা করেন। মুসলমানেরা তাঁদের সন্তানদের কেন ইংরেজি স্কুলে পাঠাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তার কারণ আলোচনা করেন। ডাঃ ওয়াইজ এই গ্রন্থে লেখেন, শিক্ষিত মুসলমানেরা আরবি ও ফারসি ক্লাসিক্স ছাড়া অন্য কিছু পড়া প্রয়োজনীয় মনে করেন না। বিজ্ঞান বা আধুনিক সাহিত্যের প্রতি কোন আগ্রহই তাঁদের নেই। ইংরেজি ও বাংলাভাষা তাঁদের নিকট বিদেশী ভাষারূপে পরিচিত। তাঁরা নিয়মিত ধর্মীয় আচরণ-বিধি অনুসরণ করেন। আধুনিক সভ্যতা যে পরিবর্তনের সূচনা করেছে তার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর পরিবর্তে তাঁরা অজ্ঞ ফকিরের কথা শুনতে অথবা গোঁড়া মৌলবীদের নিকট হতে রাজদ্রোহের কথা শুনতেই বেশী আগ্রহশীল, এবং তাঁরা সেইদিনগুলোর কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন যখন মুসলমান সম্রাটেরা এই দেশ শাসন করতেন। এই শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানেরাই ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব থেকে সন্তানদের মুক্ত রাখতে চান। (J. Wise, op. cit., op. 35-36)

২১. Abdool Luteef, Mahomedan Education, in Transactions, vol. II, Part I, 1868, p. 57.

২২. Ibid, p. 60.

২৩. Ibid, p. 61.

২৪. E. Haque, op. cit., pp. 166-167.

২৫. Ibid, p. 180.

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের এক রূপান্তর ঘটে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন হিন্দু কলেজের কলেজ-বিভাগ প্রেসিডেন্সী কলেজে (সিনিয়র বিভাগ) পরিণত হয় এবং স্কুল-বিভাগ হিন্দু স্কুল (জুনিয়র বিভাগ) নাম ধারণ করে। আর বাংলা পাঠশালা সংস্কৃত কলেজের অন্তর্ভুক্ত হয়। যোগেশচন্দ্র বাগল লেখেন, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজের "মূল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক স্থাপন করেন" এবং এই ভবনের নির্মাণ কার্য শেষ হবার পরে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ "ছোটলাট স্যার জর্জ ক্যামবেল নূতন ভবনের দ্বার উন্মোচন করেন"। এপ্রিল মাসেই কলেজের সমস্ত বিভাগ এখানে উঠে আসে (দ্রঃ যোগেশ

চন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, পৃষ্ঠা : ৬১ ; যোগেশ চন্দ্র বাগল, কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র, কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩৬৬, পৃষ্ঠা : ৩১, ১২৪-১২৫।)

২৬. বদরুদ্দীন উমর, সংস্কৃতির সংকট, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নবেম্বর, ১৯৭০, পৃষ্ঠা : ৫৯-৬০

২৭. Maulavi Obaidullah Alobaidi, Muhammedan Education, in The Bengal Magazine, February, 1873, p. 310.

২৮. Rev. J. Long, Social Condition of the Muhammadans, in Transactions, vol. III, Part I, 1869, pp. 1-5.

২৯. Ibid, pp. 8-12.

৩০. Ibid, p. 14.

৩১. Ibid. pp. 13-14.

৩২. Ibid, p. I4 ; vide also Letter of Rev. J. Long published in The Calcutta Christian Observer, vol. xxi Series—vol. XIII New Series, Calcutta, 1852, pp. 279-280, 335-336.

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার কাগজে 'Musalman-Bengali Literature' এই শিরোনামায় দুটো মূল্যবান পত্র প্রকাশিত হয়। একটি পত্রের লেখক ছিলেন রেভারেণ্ড লঙ। তাতে তিনি 'মুসলমানী বাংলা' ভাষায় রচিত গ্রন্থের এক বিস্তৃত তালিকা প্রকাশ করেন। এই 'মুসলমানী বাংলা'র প্রভাব আলোচনা না করে বাঙালী মুসলিম-মানস বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থাকবে।

৩৩. Rev. J. Long, Social Condition of the Muhammadans, in Transactions, vol. III, Part I, 1869, p. 14.

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আবদুল লতিফ ম্যাহোমেডান লিটারেরি সোসাইটি অব ক্যালকাটা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই সোসাইটির সভ্যরা প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার আবদুল লতিফের ১৬ তালতলা লেনের (কলকাতা) বাসভবনে মিলিত হতেন (Vide E. Haque, op. cit., P. 79).

৩৪. Rev. J. Long, Social Condition of the Muhammadans, in Transactions, vol. III, Part I, 1869, p. 14.
সোশ্যাল সায়েন্স কার্যবিবরণীতে রেভারেণ্ড লঙের আরও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুটো প্রবন্ধের কথা এখানে উল্লেখ করা হল: On the Social Condition of the Muhammadans in Bengal এবং On the Population of India (Vide Transactions, Vol. IV, 1870). আবদুল লতিফ ও রেভারেণ্ড লঙ ছাড়া আর যাঁরা সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের সভায় মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাঁরা হলেন: আবদুল হাকিম, এইচ. বেভেরলি, চন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ চক্রবর্তী (পুরো নাম উল্লেখ করা হয়নি), মুহম্মদ আবদুর রউফ, জে. বি. ফিয়ার, শ্যামাচরণ সরকার প্রভৃতি (Vide Transactions, 1867-1871). রেভারেণ্ড লঙ কলকাতা ও বোম্বের সামাজিক অবস্থা তুলনা করে এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারী এই এসোসিয়েশনের সভায় পাঠ করেন। প্রবন্ধটির নাম হল: Calcutta and Bombay in their Social Aspects (Vide Transactions, Vol. IV, 1870, pp. 9-83). ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলমানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনায় এই কার্যবিবরণী একান্ত অপরিহার্য।

৩৫. The Zemindary Settlement of Bengal, 2 vols., Calcutta, 1879 ; W. H. Thompson, Census of India, 1921, vol. v, Bengal, Part I, Report, Calcutta, 1923, pp. 413-414 ; N. K. Sinha, op. cit., vol. II, Chapters VII-VIII ; Abdul Karim, Murshid Quli Khan And His Times, Dacca, 1963.

৩৬. B.H. Baden-Powell, The Land-Systems of British India, vol. I, Johnson Reprint Corporation, New York-London, 1972, p. 439 ; S. G. Panandikar, The Wealth and Welfare of the Bengal Delta Comprising the Dis-

tricts of Mymensingh, Dacca, Bogra, Pabna, Faridpur, Bakarganj, Tippera and Noakhali, Calcutta University Press, 1926, pp. 123-124 ; Radhakamal Mukerjee, The Changing Face of Bengal (A Study of Riverine Economy), University of Calcutta, 1938.

৩৭. Panandikar, op. cit., pp. 125-127.

৩৮. Ibid, pp. 126-127 ; N. K. Sinha, op. cit., vol. II, Chapter VII.

৩৯. C. D. Field, Landholding and the Relation of Landlord and Tenant, Calcutta, 1883, pp. 819-820 ; N. K. Sinha, op. cit., vol. II, p. 209.

৪০. Ibid, Chapters xxii-xxiii, xxviii ; The Fifth Report, op, cit., pp. 648-651 ; The Permanent Settlement Imperilled ; Or Act of 1859 in its true Colours, By a Lover of Justice (year ?) ; N. K. Sinha, op. cit., Chapters vii-viii.

৪১. A voice from a Zemindary Kutchery on the Rent Law, and the Relation between the Landlord and Tenant in Bengal, Calcutta, 1877 ; Baden-Powell, op. cit., pp. 649-661 ; Panandikar, op. cit., pp. 97-108 ; Report of the Land Revenue Commission Bengal, vol. I, with Minutes of Dissent, Calcutta, 1940, pp. 20-30 ; Pradip Sinha, Nineteenth Century Bengal Aspects of Social History, Calcutta, 1961, Chapter I ; Benoy K. Chowdhuri, Agrarian Relations in Bengal (1859-1885), in The History of Bengal (1757-1905), University of Calcutta, 1967, pp. 237-336 ; মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃষ্ঠা : ৩৬.

৪২. A.E. Porter, Census of India, 1931, vol. V, Bengal &

Sikkim, Part I, Report, Calcutta, 1933, pp 477-542 ; নির্মল কুমার বসু, হিন্দু সমাজের গড়ন, কলিকাতা ১৩৫৬, পৃষ্ঠা : ১৪০-১৪২

৪৩. Proceedings of the Judicial Department, 29 May, 1843, O. C. Nos. 21-25 and 7 April, 1847, O. C. Nos. 99-100 ; W. W. Hunter, The Indian Musalmans ; A.R. Mallick, op. cit., Chapters III-IV ; M. A. Khan, op. cit. ; J. N. Sarkar, op. cit.

৪৪. K. A. Nizami, Socio-Religious Movements in Indian Islam (1763-1898), in India And Contemporary Islam, Edited by S. T. Lokhandwalla, Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1971, pp. 107-108.

৪৫. Ibid, p. 108.

৪৬. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, পৃষ্ঠা : ১২৫, ১২৮ ; W. C. Smith, Modern Islam in India A Social Analysis, Lahore, 1969, pp. 7-8 (See footnote) ; The Cambridge History of Islam, Vol. 2, Cambridge At the University Press, 1970, P. 81.

৪৭. J. N. Sarkar, op. cit., pp. 71-75.

৪৮. Hunter, op. cit., Chapter IV.

৪৯. এই বিষয়ে আমার গ্রন্থে আলোচনা করেছি, দ্রষ্টব্য : পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, পৃষ্ঠা : ১৬৪-১৬৬

৫০. E. A. Gait, Census of India, 1901, vol. VI, The Lower Provinces of Bengal and their feudatories, Part I, The Report, Calcutta, 1902, pp. 165-181. For Beverley's Comment see p. 165.

৫১. J. Wise, op. cit., pp. 1-6.

৫২. The Muhammadans of Eastern Bengal, Communicated by Mr. Risley from Dr. Wise's papers to the Journal

of the Asiatic Society of Bengal, 1894, Part III ; Sir Herbert Risley, The People of India, Second Edition Edited by W. Crooke, Delhi, January, 1969, p. 144.

৫৩. E. A. Gait, Census of India, 1901, vol. VI, Part I, Report, Bengal, pp. 168-169.

৫৪. Khondkar Fuzli Rubbee, The Origin of the Muhammadans of Bengal, Messrs Thacker, Spink & Co., Calcutta, 1895 (English Translation). ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক এই গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন (দ্রঃ বাংলার মুসলমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৬৮)। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে নৌসের আলী খান ইসাফজী 'বঙ্গীয় মুসলমান' (কলিকাতা, ১৮৯১) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু এই গ্রন্থখানি গবেষক বা শাসনকর্তাদের দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করতে পারেনি। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কাজী আবদুল ওদুদ মুসলমানদের পরিচয় সম্পর্কে খন্দকার ফজলে রাব্বির মতামত বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, ফজলে রাব্বির "মতের বিপক্ষেই যুক্তি প্রবল"। (দ্রষ্টব্য : কাজী আবদুল ওদুদ, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত নিজাম বক্তৃতা, ১৯৩৫, কলিকাতা, মাঘ, ১৩৪২, পৃষ্ঠা : ১২-১৭)। সম্প্রতি একখানি গ্রন্থে কে. এস. লাল এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন (Vide K. S. Lal, Growth of Muslim Population in Medieval India (A. D. 1000-1800), Delhi, 1973, Chapter XIV.]

৫৫. Khondkar Fuzli Rubbee, op. cit.

৫৬. Census of India, 1931, Vol. V, Part I, P. 423 ; বদরুদ্দীন উমর, সংস্কৃতির সংকট, পৃষ্ঠা : ৩৫-৩৯.

পরলোকগত কবি সৈয়দা মোতাহেরা বানু (নভেম্বর, ১৯০৬—২২ মার্চ, ১৯৭৩ খ্রী) মুসলিম সমাজের এই বিশেষ দিক আলোচনায় আমাকে সাহায্য করেন।

৫৭. Francis Buahanan, An Account of the District of

Purnea in 1809-10, Patna, 1928, Part II, Chapter IV ; Francis Buchanan, An Account of the Districts of Bihar and Patna in 1811-1812, vol. I, Patna (year ?), pp. 305-312 ; E. A. Gait, Census of India, vol. VI, Part I, Report, Bengal, pp. 172, 439-451 ; L. S. S. O'Malley, Census of India, 1911, vol. V, Bengal, Part II, Tables, Calcutta, 1913, Appendix to Table XII—Part B, Musalmans, pp. 191-202 ; A. K. Nazmul Karim, Muslim Social Classes of East Pakistan, in Changing Society in India and Pakistan, University of of Dacca (Oxford University Press, Pakistan, 1956), pp. 120-130, 138-143 ; মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাঙলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা : ৩০৬ ; কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃষ্ঠা : ৮২-৮৫ ; বদরুদ্দিন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, তৃতীয় প্রকাশ, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ ; বদরুদ্দিন, উমর, সংস্কৃতির সংকট, পৃষ্ঠা : ৫৪-৭৫ ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৬৯, পৃষ্ঠা : ২৯-৩২ ; আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা : ৪৫, ১৬২।

ফ্রান্সিস বুকাননের মূল্যবান বিবরণ থেকে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদ সম্পর্কেও তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। বুকানন বলেন, উচ্চশ্রেণীর সৈয়দ, মুগল ও পাঠান বংশের মধ্যেও হিন্দু মহিলাদের বিবাহ করার ফলে হিন্দু রক্তের সংমিশ্রন ঘটে। সুতরাং বুকাননের রিপোর্ট থেকে উচ্চশ্রেনীর মুসলমানদের রক্তের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না।

বাঙালী মুসলমানদের সামাজিক বিভাগ সম্পর্কে আবদুল মওদুদ তাঁর গ্রন্থে লেখেন যে, মুসলমান সমাজে দুটো বৃহৎ স্তর ছিল, যথা— "আশরাফ ও আতরাফ বা শরীফ ও রযীল।" তাঁর মতে, আশ-রাফ ও আতরাফ বা শরীফ উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত মুসলমান, আর

রষীল হল নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান। কিন্তু ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে মুসলিম সমাজে তিনটি জাতির (caste) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী আতরাফ মুসলমানদের শরীফ মুসলমান বলা যায় না। মুসলিম সমাজে যে জটিল জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল তা সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায়।

কি কারণে অন্য ধর্মের লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তার অনেক দৃষ্টান্ত ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে পাওয়া যায়। এই তথ্য থেকে জানা যায়, হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ প্রথার ফলে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরিতদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও ছিলেন। তাঁরা প্রায় স্বেচ্ছায় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। এইসব ধর্মান্তকরণে বলপ্রয়োগ মোটেই মূখ্য কারণ ছিল না। (Vide Census of India, 1901, Appendix II—Extracts From District Reports Regarding Causes of Conversion to Muhammadanism, pp. x-xix).

১৮৭২ ও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বাংলা-দেশের আদিম অধিবাসী ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইসলাম ধর্মে ঘোষণা করা হয়, ঈশ্বরের চোখে সকল মানুষই সমান। স্বভাবতই এই বাণী পতিত জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে। তাই পূর্ববঙ্গের পোদ ও চণ্ডাল এবং উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও কোচ প্রভৃতি নিম্নবর্ণের লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তার ফলে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের সমকক্ষ হতে না পারলেও, হিন্দু সমাজের কঠোর জাতিভেদ প্রথার নিগড় থেকে তাঁরা মুক্ত হন। তাঁরা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে পারেন, মোল্লার সাহায্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারেন এবং মৃত্যুর পরে তাঁদের দেহ মুসলিম কবরখানায় সুন্দরভাবে সমাহিত করার ব্যবস্থা হয়। জাতিভেদ প্রথার ফলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হিন্দুসমাজে প্রাধান্য ছিল। সুতরাং তাঁদের ইসলাম ধর্ম প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। একই কারণে খ্রীষ্টান মিশনারীরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেননি। উল্লেখযোগ্য এই যে, মুসলিম সমাজে জাতিভেদ প্রথা থাকলেও তা মোটেই হিন্দু

সমাজের মত কঠোর ছিল না। আর মুসলিম সমাজের জাতিভেদ প্রথা কখনই হিন্দু সমাজের মত প্রতিপদে ব্যক্তির আত্মমর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। (Vide Report on the Census of Bengal, 1872, pp. 132-134 ; Census of India, 1901, Vol. VI, Part I, Report, Bengal, pp. 169-170).

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে মুসলমান সমাজের বিভিন্ন জাতির (Caste) একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট আছে। তাতে দেখা যায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতি নিয়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ৮০ প্রকার জাতি ছিল। এখানে তা উদ্ধৃত করা হল :

Table XIII—Caste. Part B—Musalmans.

(১) আবদাল, (২) আজলাফ, (৩) আখুঞ্জি, (৪) বেদিয়া, (৫) বেহারা, (৬) বেলদার, (৭) ভাট, (৮) ভাটিয়া, (৯) চাটুয়া, (১০) চুরিহর, (১১) দফাদার, (১২) দাই, (১৩) দর্জি, (১৪) দেওয়ান, (১৫) ধাওয়া, (১৬) ধোবি, (১৭) ধুনিয়া বা ধুনকার, (১৮) ফকির, (১৯) গাইন, (২০) হাজ্জাম, (২১) জোলা, (২২) কাগজি, (২৩) কালাল, (২৪) কান, (২৫) কাম্‌বি, (২৬) কসাই, (২৭) কাজি, (২৮) খাঁ, (২৯) খোন্দকার, (৩০) কলু, (৩১) কুমার, (৩২) কুঁজরা, (৩৩) লালবেগী, (৩৪) মাহি-ফেরুশ, (৩৫) মাহিমল, (৩৬) মাল্লাহ, (৩৭) মল্লিক, (৩৮) মসাল্‌চি, (৩৯) মেহ্‌তর, (৪০) মীর, (৪১) মীর্জা, (৪২) মুচি, (৪৩) মোগল, (৪৪) নগর্চি, (৪৫) নলিয়া বা নলুয়া, (৪৬) নাস্যা, (৪৭) নাট, (৪৮) নিকারী, (৪৯) পাঠান, (৫০) পাওয়ারিয়া, (৫১) পীর কোদালী, (৫২) রাস্থয়া, (৫৩) সৈয়দ, (৫৪) শেখ, (৫৫) সোনার, (৫৬) অন্যান্য।

Minor Castes. Appendix to Table XIII—Part B—Musalmans

(১) আফগান, (২) আশরাফ, (৩) বাকলি, (৪) বাখো, (৫) বাড়ি, (৬) ভূঁইয়া, (৭) চৌধুরী, (৮) চুনারী, (৯) দফালি, (১০) গাড্ডি, (১১) গোলাম, (১২) হালালখোর, (১৩) হিজরা, (১৪) হোসেনী গোয়ালা, (১৫) থরাদি, (১৬) কোরেশী, (১৭) লাহেরী, (১৮) মাংটা, (১৯) মেহানা, (২০) মীরদা, (২১) মিরিয়াসিন, (২২) মিঞা, (২৩) নও

মোসলেম, (২৪) পাটোয়া, (২৫) সুন্নি।
(Vide Census of India, 1911, pp. 191-202)

৫৮. J. A. Bourdillon, Bengal Census, 1881, Report, Calcutta, vol. I, p. 78 and vol. III ; Report on the Census of British India, Taken on 17 February, 1881, vol. I, London, 1883, p. 374 ; C. J. O' Donnell, Census of India, 1891, vol. III, Report, Calcutta, 1893, p. 147 ; যীনেন্দ্রনাথ বসু, বাঙালীর পরিচয়, কলিকাতা ১৩৫২, পৃষ্ঠা : ৫৭-৫৮

৫৯. Letter of Syed Ameer Ali, dated 15 March, 1927, Published in the Forward (a daily paper founded by C. R. Das and published from Calcutta), Saturday, 23 April, 1927, p. 6.
'মাসিক মোহাম্মদী' কাগজে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়, সৈয়দ আমির আলি কর্তৃক সেণ্ট্রাল ন্যাশন্যাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় (দ্রষ্টব্য : মাসিক মোহাম্মদী, সম্পাদক : মুহম্মদ আকরম খাঁ, কলিকাতা, ভাদ্র ১৩৩৫, পৃষ্ঠা : ৬৯৭-৭০৩)। এস. এ. এ. রিজভি লেখেন : "The National Mahommedan Association, established in Calcutta in 1856, with Nawab Amir Ali (1817-79) as president..." (vide The Cambridge History of Islam, vol. 2, 1970, p. 81). কিন্তু রিজভি তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে কোন তথ্য নির্দেশ করেননি। কাজী আবদুল ওদুদ লেখেন, এই এসোসিয়েশন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তা জানা যায়নি (দ্রঃ বাংলার জাগরণ, পৃষ্ঠা : ১২৭)। কাজী আবদুল মান্নান লেখেন, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মে সেণ্ট্রাল ন্যাশন্যাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশন কলকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হয় (দ্রঃ কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা : ৫২৪)। যখন মিণ্টো ভাইসরয় এবং গবর্ণর জেনারেল হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন সেণ্ট্রাল ন্যাশন্যাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশনের সভ্যরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী

যে মুদ্রিত পত্র পাঠ করেন তাতে বলা হয়, এই এসোসিয়েশন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় (vide The Bengalee, Editor : Surendra Nath Banerjea, a daily paper published from Calcutta, Wednesday, 17 January, 1906, p. 3).

৬০. Letter of Syed Ameer Ali, dated 15 March, 1927, in Forward, 23 April, 1927, p. 6.

৬১. Ibid.

৬২. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, পৃষ্ঠা : ১২২-১২৪

৬৩. Articles by Rev. Long, op. cit. ; The Bengalee, 17 January, 1906, p. 3 ; Forward, 23 April, 1927, p. 6 ; কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ ; E. Haque, op. cit.; J. A. S. P., June, 1964.

৬৪. E. Haque, op. cit., p. 79.

৬৫. Ibid, p. 225.

৬৬. বদরুদ্দীন উমর, সংস্কৃতির সংকট, পৃষ্ঠা : ৬০-৬৬

৬৭. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, পৃষ্ঠা : ১২৭-১৩০

৬৮. কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃষ্ঠা : ২১০-২১৩

৬৯. J. Wise, op. cit., p. 36.

ডাঃ জেমস ওয়াইজ লেখেন, পূর্বে মুসলমান কৃষকেরা ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করত এবং হিন্দুদের পাল-পার্বণে যোগদান করত। কিন্তু তা নিষিদ্ধ হয়েছে। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান অথবা অর্থদান করতে ফরাজী মৌলবীরা নিষেধ করেন (vide Ibid, pp. 36-37)

৭০. কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃষ্ঠা : ১৬৯-১৭২

৭১. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৮২-১৮৪

শেখ আবদুর রহিম রচিত গ্রন্থখানি মুসলমানেরা খুবই আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন এবং এই গ্রন্থের কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। লেখক বলেন, মহম্মদ তরবারীর সাহায্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেননি।

৭২. সেখ আবদোস সোবহান, হিন্দু মোসলমান, কলিকাতা. ১৮ এপ্রিল, ১৮৮৮। এই গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা হতে প্রকাশিত হয়। লেখক পরিষ্কার করেই বলেন যে, এই গ্রন্থে কংগ্রেস ও হিন্দুদের সমালোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু কাজী আবদুল মান্নান তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেন (দ্রঃ কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃষ্ঠা : ১৮৪-২০৩)

৭৩. কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃষ্ঠা : ২১৩-২১৪

৭৪. ঐ, পৃষ্ঠা : ২১৫-২১৬

৭৫. ঐ, পৃষ্ঠা : ২১৬-২১৯

৭৬. মীর মশাররফ হোসেন, গোজীবন. ২৫ ফাল্গুন, ১২৯৫ বাংলা সন ; কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, পৃষ্ঠা : ১২৯-১৩০ ; কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃষ্ঠা : ২১৭-২২০

৭৭. কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃষ্ঠা : ২২১-২২২

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে ধীরে ধীরে মফস্বল শহরে ও বাংলাদেশের বাইরে কয়েকটি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ গড়ে ওঠে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরার' নামক কাগজে একটি প্রবন্ধে লেখা হয়, চুয়ান্নটি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছে, যথা—(১) কলিকাতা ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী, (২) বহুবাজার, (৩) যোড়াসাঁকো (দৈনিক সমাজ), (৪) সিন্দুরিয়াপটী, (৫) পটলডাঙ্গা, (৬) শ্যামবাজার, (৭) ভবানীপুর, (৮) বেহালা, (৯) মুদিয়ালী, (১০) হাবড়া, (১১) সাঁতরাগাছি, (১২) বোলুহাটী, (১৩) কোন্নগর, (১৪) বৈদ্যবাটী, (১৫) শ্রীরামপুর, (১৬) চন্দননগর, (১৭) চুঁচড়া, (১৮) ভাস্তাড়া, (১৯) বৰ্দ্ধমান, (২০) বহরমপুর, (২১) ভাগলপুর, (২২) নিবাধই, (২৩) দত্তপুকুর, (২৪) টাকী, (২৫) বাগআঁচড়া, (২৬) কৃষ্ণনগর, (২৭) শান্তিপুর, (২৮) নড়াইল, (২৯) গৌরনগর, (৩০) গোবিন্দপুর, (৩১) অমৃত-বাজার, (৩২) কুষ্টিয়া, (৩৩) কুমারখালি, (২৪) বোয়ালিয়া, (৩৫) বগুড়া,

(৩৬) ফরিদপুর, (৩৭) গোবিন্দপুর, (৩৮) ঢাকা, তদন্তর্ব্বর্ত্তী, (৩৯) বাঙ্গালাবাজার, (৪০) লালবাগ, (৪১) ত্রিপুরা, (৪২) ত্রিপুরা শাখা সমাজ, (৪৩) ব্রাহ্মণবেড়িয়া, (৪৪) ময়মনসিংহ, (৪৫) সেরপুর, (৪৬) বরিশাল, (৪৭) চট্টগ্রাম, (৪৮) মেদিনীপুর, (৪৯) বালেশ্বর, (৫০) কটক, (৫১) এলাহাবাদ, (৫২) বেরিলি, (৫৩) লাহোর, (৫৪) মাদ্রাজ। এইসব সমাজের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল : কৃষ্ণনগর, ঢাকা ও মেদিনীপুরের সমাজ। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মসমাজ এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা ও মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেসব স্থানে ব্রাহ্মদের স্বতন্ত্র সমাজগৃহ ছিল, তা হল : কলিকাতা, ভবানীপুর, বেহালা, চন্দননগর, চুঁচড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ফরিদপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও বরিশাল। কলিকাতা, বহুবাজার, কৃষ্ণনগর, নিবাধই, বগুড়া, ঢাকা, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মবিদ্যালয় ছিল। ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক কলিকাতায় একটি কলেজ, আর চন্দননগর, ভাস্তাড়া, গৌরনগর ও কোন্নগরে বালক ও বালিকা বিদ্যালয় ; লাহোর, বর্দ্ধমান, বেহালা, বেরিলি ও নিবাধইয়ে বালক বিদ্যালয় এবং বরিশালে বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার সাহায্য দেয়।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় : (ক) তত্ত্ববোধিনী, (খ) ধর্ম্মতত্ত্ব, (গ) সত্যান্বেষণ (বহুবাজার সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত), (ঘ) সত্যজ্ঞান প্রদায়িনী (যোড়াসাঁকো প্রাত্যহিক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত), (ঙ) ধর্ম্মপ্রচারিণী (বেহালা সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত), (চ) ইণ্ডিয়ান মিরার, (ছ) ন্যাশন্যাল পেপার, (জ) ঢাকা প্রকাশ (ঢাকা সমাজ কর্তৃক সম্পাদিত), (ঝ) বিজ্ঞাপনী (ঢাকা সমাজ কর্তৃক সম্পাদিত)। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্যে আটজন ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কলকাতায় তিনজন, কলকাতার নিকটবর্তী স্থানে একজন, মেদিনীপুরে একজন, পূর্ববঙ্গে দুইজন, রাজসাহী ও যশোহরে একজন নিযুক্ত ছিলেন। তখন কডালরবাসী একজন যুবক মাদ্রাজে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য শিক্ষালাভ করেন। পূর্ববঙ্গে যখন ব্রাহ্মদের কার্যাবলী সুরু হয় তখনও মুসলমানেরা সঙ্ঘবদ্ধ হননি

এবং ইসলামের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি। তাছাড়া ব্রাহ্মসমাজের সংগঠনও অনেকটা শিথিল ছিল। আর ব্রাহ্মরা এক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজকে সংহত করার ব্যাপারে কেশবচন্দ্র সেনের অবদান অসামান্য। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করার পরেই ব্রাহ্মসমাজকে সুসংগঠিত করার জন্য যত্নবান হন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র সেন পূর্ববঙ্গে যাত্রা করেন। তিনি প্রথমে ফরিদপুরে যান (২৭ অক্টোবর), সেখান থেকে ৩০ অক্টোবর রওনা হয়ে ৩ নভেম্বর ঢাকা নগরে উপস্থিত হন। তার পরে তিনি ময়মনসিংহে যান। এই সমস্ত জায়গায় তিনি ব্রাহ্মধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং ব্রাহ্মমণ্ডলী যাতে নিয়মিত সামাজিক উপাসনা করেন তার ব্যবস্থা করেন। তাঁর আগমনের পূর্বে ব্রাহ্মসমাজে অনেক লোকের সমাগম হলেও তখনও ব্রাহ্মমণ্ডলী ততটা সংগঠিত ছিল না। কেশবচন্দ্র সেনের প্রচারের ফলে পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মরা অনেকটা সংগঠিত হন। বিভিন্ন স্থানে তাঁর ভাষণ শুনতে অনেক লোকের সমাগম হয়। কেশবচন্দ্র কলকাতায় ফিরে যাবার পরে ঢাকার হিন্দু নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মধর্মের সমা-লোচনার ও হিন্দু ধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি সভা স্থাপন করেন ও একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মার্চ কেশবচন্দ্র সেন কলকাতা থেকে রওনা হয়ে ৮ মার্চ দ্বিতীয়বার ঢাকায় উপস্থিত হন এবং সেখানে অবস্থান করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি ঢাকায় এক 'সঙ্গতসভা' স্থাপন করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১ মার্চ কেশবচন্দ্র ঢাকায় ব্রহ্মোৎসব করেন। এই প্রথম ঢাকায় ব্রহ্মোৎসব হয়। ১৮ মার্চ (১৮৬৯ খ্রী) সন্ধ্যার পর নবাব আবদুল গণির নূতন প্রাসাদে কেশবচন্দ্র 'Brahmo Samaj is a power' এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা শুনতে অনেক লোক সমবেত হন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কয়েকজন ইউরোপীয় ছিলেন। এই বার কেশবচন্দ্র অনেকদিন ঢাকায় থেকে ধর্ম-শিক্ষা দান করেন। ৩১ মার্চ (১৮৬৯ খ্রী) তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন।

'পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে' কেশবচন্দ্র ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর ঢাকায় উপস্থিত হন। এই তৃতীয়বার যাত্রাই তাঁর পূর্ববঙ্গে শেষ প্রচার যাত্রা। ৫ ডিসেম্বর ঢাকায় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা হয় এবং হুদিন ধরে উৎসব চলে। এই উৎসবে ঢাকার নবাব, কয়েকজন ইংরেজ ও অনেক দেশীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এইভাবে কেশবচন্দ্র পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মদের সুসংগঠিত করেন এবং প্রায় চার বৎসর পূর্বে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ যে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয় তা থেকে তাদের উদ্ধার করেন। এই সময়ে "একজন উৎসাহপূর্ণ সরল হৃদয় মুসলমান যুবা" ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত হন। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য ব্রাহ্মরা "জাতি-নির্বিশেষে উদারভাবে ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ" হন। ৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় ঢাকায় একটি সভায় কেশবচন্দ্র 'প্রকৃত জীবন' বিষয়ে ইংরেজিতে যে ভাষণ দেন তাতে ইংরেজ, বাঙালী মুসলমান প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় ৩৬ জন ব্যক্তি প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এইভাবে কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম আরও প্রচারিত ও প্রসারিত হয়। (দ্রঃ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য্য কেশবচন্দ্র, শতবার্ষিকী সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩৮ খ্রী, ১৮৬০ শক, পৃষ্ঠা : ২৮৪-২৯৭, ৫২৬-৫২৭)। যদিও ব্রাহ্মসমাজের কার্যাবলী প্রধানতঃ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তবুও পূর্ববঙ্গের কয়েকটি মফস্বল শহরে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় গোঁড়া ও রক্ষণশীল মুসলমানেরা উদ্বিগ্ন হন এবং তাঁরা এই ধর্মের প্রভাব হ্রাস করতে তৎপর হন। মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় এই মনোভাবই ব্যক্ত হয়।

৭৮. কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃষ্ঠা : ২২১-২৪০।

৮৭. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, পৃষ্ঠা : ১২৬ ; S.T. Lokhandwalla (Ed.), op. cit., pp. 114, 145-146, 241 327.

৮০. J. A. S. P., vol. IX, No. 1, 1964, pp. 92-95, 101-118.

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ ও বোম্বে, এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুর, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, দিল্লি, লাহোর, অমৃতসর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে অনেক ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণসমূহ এইসব অঞ্চলের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে এক নতুন ধর্মীয় আবেগের সৃষ্টি করে। এইভাবে কেশবচন্দ্র যে পটভূমি রচনা করেন তার ফলে পরবর্তীকালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে একই রাজনৈতিক মনোভাব জাগ্রত করা অনেকটা সহজ হয়। কিন্তু কেশবচন্দ্র কর্তৃক সৃষ্ট এই ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে মুসলিম জনসমষ্টির যেমন কোনই সংযোগ ছিল না, তেমনি সুরেন্দ্র-নাথের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গেও মুসলমানেরা যুক্ত হননি। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি (দ্রঃ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য্য কেশবচন্দ্র, ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা: ২১১-২২৬, ৩৪৮-৩৭১)

৮১. কাজী আবদুল ওদুদ, হিন্দু মুসলমানের বিরোধ, পৃষ্ঠা: ২৪-৪২; বাংলার জাগরণ, পৃষ্ঠা: ১২৫-১২৬

৮২. রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তা সম্পর্কে আমার প্রবন্ধ, দ্রষ্টব্য: ইতিহাস, নবপর্যায়, সপ্তম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৭৯, পৃষ্ঠা: ২১৮-২৩৫

৮৩, 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার ফাইল; বিনয় ঘোষ, সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সামাজিক ভূমিকা, ইতিহাস, নবম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৬৬; Benoy Ghose, Bengali Intelligentsia and the Revolt, in 'Rebellion 1857 A Symposium', Edited by P. C. Joshi, New Delhi, 1957, pp. 103-118.

৮৪. A. C. Gupta (Edited), Studies in the Bengal Renaissance, Jadavpur, 1958, pp. 16-32; Gautam Chattopadhyay (Edited), Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century (Selected Documents), vol. 1, Calcutta, 1965, See introduction and other papers.

৮৫. অক্ষয় কুমার দত্ত, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ, ১৭৭২ শকাব্দ (১৮৫০ খ্রী)

৮৬. Files of the Hindoo Patriot.

৮৭. Transactions (1867-1871), The Bengal Magazine (1872-1882), বঙ্গদর্শন, সোমপ্রকাশ, সাধারণী ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা।

৮৮. অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৩ অক্টোবর, ১৮৭৩ ; যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাচীন অমৃতবাজার পত্রিকা ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, প্রবাসী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪।

৮৯. Sanjib Chandra Chatterjee, Bengal Ryots ; Their Rights and Liabilities, Calcutta, 1864,

৯০. ইতিহাস, নবপর্যায়, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৯, পৃষ্ঠা : ২২৭

৯১. ঐ

৯২. Abhoy Charan Das, Indian Raiyat, Land Tax, Permanent Settlement and the Famine, Calcutta, 1881 ; Tarini Das Banerjee, Zemindar aud Raiyat of Bengal, Calcutta, 1883.

৯৩. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ, চুঁচুড়া, ১৩১০ সাল, পৃষ্ঠা : ২৬, ৩৪, ৫৬

৯৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের কৃষক, কলিকাতা, ১৯৫৭, (পুনর্মুদ্রিত, সম্পাদনা : সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা বিমলচন্দ্র সিংহ), পৃষ্ঠা : ৪-৫

৯৫. ঐ, পৃষ্ঠা : ৮৫

৯৬. ঐ, পৃষ্ঠা : ৮৪-৮৫

৯৭. ঐ

৯৮. Note from Rev. J. Long to Sir John Lawrence, Governor-General of India, dated Simla, the 24th August, 1867, in The Calcutta Gazette, Supplement, July-December, 1870 (20 July, 1870).

৯৯. Idid.

১০০. Ibid.

১০১ Note from Baboo Joykissen Mookerjea, Zemindar, to Rev. R. V. Cockerell, Magistrate and Collector of

Hooghly, dated Oterparah, the 22nd March, 1866, in The Calcutta Gazette, 20 July, 1870.

১০২. Ibid.

১০৩. Ibid.

১০৪. Note from Baboo Rajendra Lal Mitra, to A. Smith, Magistrate of the 24 Pergunnahs, Alipore, dated Maniktola, the 29th April, 1868, in The Calcutta Gazette, 20 July, 1870.

১০৫. Note from Baboo Joteendra Mohun Tagore, Honorary Secretary, British Indian Association to H.L. Dampier, Officiating Secretary to the Government of Bengal, dated Calcutta, the 9th November, 1868, in The Calcutta Gazette, 20 July, 1870.

১০৬. Rev. J. Long, Brief View of the Past and Present State of Vernacular Education in Bengal (Dated 30 July, 1868), in William Adam, Reports On the State of Education in Bengal, Appendix A, P. 476.

১০৭. মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর, পৃষ্ঠা : ১১

১০৮. William Adam, op. cit., P. 479 ; Jogendra Chandra Ghose (Edited), The English Works of Raja Rammohun Roy, Vol. I, Calcutta, 1885, pp. 469-473 ; ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা : ১৩-১৫ ; যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, পৃষ্ঠা : ৫১-৫৩ ; R. C. Majumdar, Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century, Calcutta, 1960, pp. 21-51 ; A. F. Salahuddin Ahmed, Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835, Leiden, 1965, pp. 137-168.

রেভারেণ্ড লঙ লেখেন, অ্যাংলিসিষ্ট-ওরিয়েন্টালিষ্ট বিতর্কের সময় জনসাধারণের স্বার্থের কথা কোন গ্রুপই ভাবেনি। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর রামমোহন যে পত্রখানি আমহার্স্টকে পাঠান তা যোগেন্দ্র

চন্দ্র ঘোষের গ্রন্থে আছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় অ্যাংলিসিষ্ট-ওরিয়েণ্টালিষ্ট বিতর্ক তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেন। তিনি লেখেন, অকল্যাণ্ডের এডুকেশন মিনিট (১৮৩৯ খ্রী) ও রেভিনিউ বোর্ডের পত্র (১৮৩৭ খ্রী) থেকে জানা যায়, সরকার ইংরেজি জানে এমন ব্যক্তিদের সরকারী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আনুকূল্য প্রদর্শন করে। তখন থেকেই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে যোগেশচন্দ্র বাগলও এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। সম্প্রতি রমেশচন্দ্র মজুমদার ও এ.এফ. সালাউদ্দিন আহমেদ বিশদভাবে এই বিতর্কের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করেন।

১০৯. মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর, পৃষ্ঠা: ১৩-১৪.

১১০. W. Adam, op. cit.; যোগেশ চন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, পৃষ্ঠা: ৪৭-৫০

১১১. W. Adam, op. cit.; যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, পৃষ্ঠা: ৬৭

১১২. যোগেশ চন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, পৃষ্ঠা: ৫১-৫৩

১১৩. ঐ, পৃষ্ঠা: ৫৩

১১৪. ঐ, পৃষ্ঠা: ৬৭

১১৫. W. Adam, op. cit., p. 483.

১১৬. যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, পৃষ্ঠা: ৭৩-৭৪

১১৭. ঐ, পৃষ্ঠা: ৭৪-৭৫

১১৮. ঐ, পৃষ্ঠা: ৭৬

১১৯. ঐ, পৃষ্ঠা: ৬৩-৬৬

১২০. ঐ, পৃষ্ঠা: ৬২-৬৩

১২১. ঐ, পৃষ্ঠা: ৩-৪৫

১২২. Gautam Chattopadhyay (Edited), op. cit., Appendix I.

১২৩. Rev. J. Long, Selections From the Records of the Bengal Government, No. XXXII Returns Relating to Publications in the Bengali language, in 1857, Calcutta, 1859, P. XLI. Rev. Long quoted this passage from the Gyananneshan (1835).

১২৪. বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ৯ আগস্ট, ১৮৪২

১২৫. ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের রচনাসমূহ দ্রষ্টব্য।

১২৬. গোপাল হালদার (প্রধান সম্পাদক), বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭২, ভূমিকা, পৃষ্ঠা : ১৭-১৯

১২৭. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৮-১৯ ; চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৩৭৬ বাংলা সন, পৃষ্ঠা : ৪২৬-৪২৮, ৪৬৮-৪৬৯। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থে দরিদ্র মুসলমানদের ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি বিদ্যাসাগরের গভীর ভালবাসার ও সহানুভূতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর দরিদ্র শিশু সন্তানদের খুবই আদর করতেন। এমনকি কৃশ ও রুগ্ন মুসলমান শিশু সন্তানেরাও তাঁর ক্রোড়ে আশ্রয় পেত। তিনি যখন বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে যেতেন তখন ওখানকার মুসলমানেরা বিদ্যাসাগরকে দেখে খুবই খুশি হতেন। কলকাতাতে অখিলদ্দিন নামে এক অন্ধ ও খঞ্জ ফকির নিয়মিত তাঁকে গান শোনাতেন। তাঁর গান শুনে বিদ্যাসাগর ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন এবং তাঁকে পয়সা দিতেন।

১২৮. অক্ষয় কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা, কলিকাতা, ১৮৪৫, পৃষ্ঠা : ১-৮ ; যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, কলিকাতা, ১৮৯৩, পৃষ্ঠা : ১৬০-১৬৩

১২৯. যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন, পৃষ্ঠা : ১৩৭

১৩০. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৩৫-১৩৬

১৩১. গোপাল হালদার (প্রধান সম্পাদক), বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৪৯

১৩২. Bankim Chandra Chatterjee, A Popular Literature of Bengal, in Transactions, Vol, IV, 1870, pp. 38-39.

১৩৩. W. Adam, op. cit., pp. 518, 527 ; B.M. Bhatia, Famines in India A Study in Some Aspects of the Economic History of India (1860-1945), Bombay, 1963, p. 30, see foot-note.

১৩৪. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১২৭৯ সাল জ্যৈষ্ঠ, ১ম সপ্তাহ, ইং ১৮৭২ মে।

১৩৫. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, পৃষ্ঠা : ১২৭ (এই গ্রন্থে উদ্ধৃত) ; আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা : ৮১

১৩৬. রাজনারায়ণ বসু, বিবিধ-প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১২৮৯ ; কমল কুমার ঘটক, রাজনারায়ণ বসু ও হিন্দু নবজাগরণ, ইতিহাস, নবপর্যায়, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৮, পৃষ্ঠা : ৩১১-৩১৬

১৩৭, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বিবাহ সংস্কার (সামাজিক প্রবন্ধ), কলিকাতা, ১২৯১ বাংলা সন, পৃষ্ঠা : ৬৮

১৩৮. রাজনারায়ণ বসু, বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড, সমাজ সংস্কার দ্বিতীয় প্রস্তাব, পৃষ্ঠা : ১১৫-১১৭ ; ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত অমৃতলাল বসুর রচনা ; গিরীশচন্দ্র ঘোষ, বড়দিনের বখ্‌শিশ্ (পঞ্চরং), কলিকাতা, ১৮৯৩, পৃষ্ঠা : ৩৩-৩৫

১৩৯. Amales Tripathi, The Extremist Challenge India between 1890 and 1910, Calcutta, 1967, Chapters 1-2.

১৪০. F. Buchanan, An Account of the District of Purnea, Part II, Chapter IV ; F. Buchanan, An Account of the Districts of Bihar and Patna pp. 305-312 ; যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি, শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থমালা-৬, কলিকাতা, ১৩৫৬ ; প্রমথ চৌধুরী, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান, কলিকাতা ১৩৬০ ; E. Huq, Muslim Vangala-Sahitya, Dacca, 1957 ; Abdul Karim, Social History of the Muslims in Bengal (Down to A. D. 1538), Dacca, 1959 ; Munshi Abdul Karim and Ahmed Sharif, A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts in Munshi Abdul Karim's Collections, English edition with an Introduction by Syed Sajjad Hussain, Dacca, 1960 (বাংলাভাষা হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা ছিল—এই বিষয়ে অনেক তথ্য এই গ্রন্থে পাওয়া যায়) ; A. Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Vol. I, Karachi, 1963; M.R.Tarafdar, Husain Shahi Bengal (1494-1538), Dacca, 1965 ; Sir J. N. Sarkar (Ed.), The History of

Bengal, Vol. II, University of Dacca, Second Impression, July, 1972 ; ওয়াকিল আহমদ, সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, মাঘ ১৩৭৪। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে অনেক তথ্য বুকাননের রিপোর্টে ও এইসব গ্রন্থে আছে।

১৪১. অক্ষয় কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, পৃষ্ঠা : ১৯৬, ১৫১-১৮৬; ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা ; ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা, কলিকাতা, ১৩৫৬ ; মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (সংগৃহীত ও সম্পাদিত), হারামণি লোকসঙ্গীত সংগ্রহ ; কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, পৃষ্ঠা : ১২৯-১৩০

১৪২. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, পৃষ্ঠা : ১২৯-১৩০

১৪৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, কলিকাতা, ১৩৫৫ ; মুনীর চৌধুরী, মীর-মানস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮ ; কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা।

১৪৪. বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭ বাংলা সন, পৃষ্ঠা : ৩৭৭

১৪৫. Government Gazette, Vol. 3, 5 June, 1817 ; Rev. J. Long, Early Bengali Literature and Newspapers, in The Calcutta Review, Vol. 13, 1850, pp. 124—161 ; Reports of the Calcutta School Book Society, 1818—1820.

১৪৬. Radharaman Mitra, David Hare, P. 5.

১৪৭. যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, পৃষ্ঠা : ২১-২২

১৪৮. ইতিহাস, নব পর্যায়, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৮, পৃষ্ঠা : ৩১৫-৩১৬ ; ইতিহাস, নব পর্যায়, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮০, পৃষ্ঠা : ৩৬-৩৯

১৪৯. L. Natarajan, Peasant Uprisings in India 1850—1900, Bombay, 1953 ; S. B. Chaudhuri, Civil Disturbances during the British Rule in India ; নরহরি কবিরাজ, স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, কলিকাতা, ১৯৫৭; মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল,

কৃষক সভার ইতিহাস ; সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথম খণ্ড ; Narahari Kaviraj, A Peasant Uprising in Bengal 1783, New Delhi, 1972, pp. 89—91 ; Papers by Binoy Bhusan Chaudhuri and Kalyan Kumar Sen Gupta (See Nineteenth Century Studies, No. 3 Indian Peasants, Calcutta , July 1973).

১৫০. S. N. Mukherjee, Class, Caste and Politics in Calcutta, 1815—38, in Elites in South Asia, Edited by Edmund Leach and S. N. Mukherjee, Cambridge University Press, 1970, Chapter 3 ; বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎসমাজ, এপ্রিল, ১৯৭৩। অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে যে নতুন শহুরে শ্রেণীর উন্মেষ হয় তাঁদের ভূমিকা আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধ ও গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৫১. 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র ফাইল (১৮৭২-১৮৭৪ খ্রী); Nirmal Kumar Bose, Modern Beangal, Calcutta, 1959, pp. 67-69 ; E. Leach and S. N. Mukherjee, op. cit., pp. 76-78; বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎসমাজ। কলকাতার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার এই বছরের সংখ্যাগুলো রক্ষিত আছে। এই পত্রিকা কৃষকের সপক্ষে বক্তব্য প্রকাশ করে। তখনকার দিনে যেসব কাগজ জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করে তাদের মধ্যে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' অন্যতম ছিল। জমিদারী প্রথার ও কৃষক সমস্যার প্রতি জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা বিশ্লেষণে এই পত্রিকার মতামত খুবই প্রয়োজনীয়। বাংলা ১২৭০ সালের ১ বৈশাখ হরিনাথ মজুমদার 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামক একখানি কাগজ নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রাম থেকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। প্রথমে এই কাগজ মাসিকপত্র ছিল, পরে পাক্ষিক এবং অবশেষে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। এই কাগজে জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের অত্যাচার ও প্রজার প্রতি সরকারের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ বাইশ বছর চলার পরে এই কাগজ

বন্ধ হয়ে যায়। সহস্র সহস্র লোক গ্রামবার্ত্তার পাঠক ছিলেন। (দ্রষ্টব্য : কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, হরিনাথ গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, প্রকাশক : জলধর সেন, কলিকাতা, ১৩০৮, পৃষ্ঠা : ৫ ; জলধর সেন, কাঙাল হরিনাথ, কলিকাতা, বৎসর উল্লেখ নেই।)

১৫২. Proceedings of the Judicial Department (Unpublished, 1843-1858 ; Published 1859-1900) ; Parliamentary Papers, 1861- Report of the Indigo Commission ; Calcutta Review, March-June, 1861 ; Lalit Chandra Mitra, History of the Indigo Disturbances in Bengal, Calcutta, 1903 ; প্রমোদ সেনগুপ্ত, নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, কলিকাতা, ১৫ আগস্ট, ১৯৬০ ; Blair B. Kling, The Blue Mutiny, The Indigo Disturbances in Bengal 1859-1862, Philadelphia : University of Pensylvania Press, 1966.

১৫৩. Proceedings of the Legislative Council, 1893-1906 ; Pradip Sinha, op. cit., pp. 22-23.

১৫৪. Bengal Administrative Reports, 1886-87, p. 71 and 1887-88, pp. 66-69 ; Rokeya Rahman Kabir, Administrative Policy of the Government of Bengal (1870-1890), Dacca, 1965, Part II, pp. 52-62.
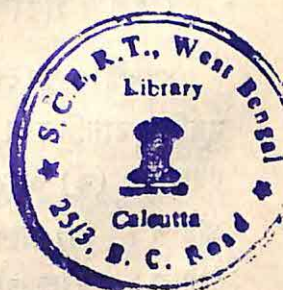
তৃতীয় অধ্যায়

বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ঃ একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা ঃ

উনবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদের উপকরণসমূহ বিংশ শতাব্দীতে আরও প্রসারিত হয়। বারে বারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঢেউ গ্রাম বাংলার সহজ-স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর রচনা করে। অথচ এই শতাব্দীর সুরু থেকে স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনার অগ্রগতিও যথেষ্ট হয়। কিন্তু কি কারণে বিংশ শতাব্দীতে জাতীয় চেতনার অগ্রগতির সাথে সাথে সাম্প্রদায়িকতাও পুষ্টিলাভ করে? এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পেতে হলে হিন্দু-মুসলিম মানসিকতা ও দ্বন্দ্বের মূল সূত্রগুলো বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

(১) বাঙালী মুসলিম মানস এবং স্বদেশী আন্দোলন ঃ

স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে (১৯০৫-১৯১১খ্রী) মুসলিম মানসিকতা বিশ্লেষণ করতে হলে দুটো স্তরের কথা মনে রাখা দরকার ঃ (ক) প্রাক্-স্বদেশী যুগ ঃ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৫ (জুন) খ্রীষ্টাব্দ। (খ) স্বদেশী যুগ ঃ ১৯০৫ (জুলাই) খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ। অবশ্য এই দুটো যুগ পরস্পরের সঙ্গে এতটা সম্পর্কিত যে একটা স্তরের কথা বাদ দিয়ে আর একটা স্তরের আলোচনা অনেকটা

অসম্পূর্ণ থাকে। এই দুটো স্তরেই উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পত্র-পত্রিকা মুসলিম মানস গঠনে প্রয়াসী হয়। কেন স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানেরা অংশ গ্রহণ করেননি তা মুসলিম মননের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করলেই অনুধাবন করা যায়।

(ক) **প্রাক্-স্বদেশী যুগে মুসলিম মানসিকতা**—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম পত্র-পত্রিকায় যে সব বিষয়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়, তা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল : (১) অনেক-কাল আগে থেকেই মধ্য প্রাচ্যের ঘটনাবলী বাঙালী মুসলমানের মনকে আকৃষ্ট করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'মুসলমানী বাংলা সাহিত্যের' সূচনা থেকে আরব, ইরাণ, তুরাণ, খোরাসান, সিরিয়া ও মিশর তাঁদের নিকট সুপরিচিত ছিল। দূরপ্রান্তের পয়গম্বরের, পীর-দরবেশের, খলিফার, সুলতানের ও ইসলামের বীরদের সাফল্যের কাহিনী বাঙালী মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করে। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কিম্বদন্তী অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানী বাংলা-সাহিত্যের মাধ্যমে বাঙালী মুসলমানকে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। মুসলিম দুনিয়ার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে বাঙালী মুসলমান গর্ব অনুভব করেন। নিয়মিত নামাজ ও অন্যান্য ধর্মীয় আচরণ-বিধি অনুকরণ এবং হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। তুরস্কের সুলতান ও অটোমান সাম্রাজ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বাঙালী মুসলমানেরা তাঁদের মনোভাব নির্ধারণ করেন। স্বদেশে ব্যর্থতার ফলে হতাশগ্রস্ত হওয়ায় মুসলিম মন বৃহত্তর মুসলিম দুনিয়ায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শান্তিলাভের চেষ্টা করে। এইভাবে তাঁরা প্যান-ইসলামীয় মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।[১] (২) বাঙালী মুসলমানেরা ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতি যে আনুগত্য প্রদর্শন করেন তা 'বুওর যুদ্ধে'র (১৮৯৯-১৯০২ খ্রী) সময়ে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩০৬ সাল, পৌষ) 'মিহির ও সুধাকর' লেখে, তারা এই যুদ্ধে ব্রিটিশ

পতাকার সাফল্য কামনা করে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১০ সাল, শ্রাবণ-ভাদ্র) 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আনন্দ প্রকাশ করা হয়। কারণ তাদের ধারণা, তার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা পেয়েছে। তা না হলে তাঁদের মারাঠা ও শিখদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত। অন্যদিকে মুসলমানেরা কংগ্রেসকে নিজেদের সংগঠনরূপে বরণ করতে পারেননি। প্রথম থেকেই কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁরা সন্দিহান ছিলেন। তাঁরা কংগ্রেসকে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান মনে করে তা থেকে দূরত্ব বজায় রাখেন। কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের সহানুভূতি ও আকর্ষণের অভাব কেন হয় তার দুটো কারণ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হাফেজ' পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়ঃ (ক) কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের নীতি সমালোচনা করে সরকারের বিরাগভাজন হচ্ছে। (খ) যদি কংগ্রেস কোন রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করে অথবা সরকারী চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে তাহলে হিন্দুরাই তার সুযোগ গ্রহণ করবে। কংগ্রেস সংগঠনের প্রতি যে মুসলমানেরা বিশেষ আকৃষ্ট হননি তার পরিচয় কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা আলোচনা করলেই বোঝা যায়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে ৭২ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন, তারমধ্যে দুজন মাত্র মুসলমান ছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে ৪৩১ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন, তার মধ্যে ৩৩ জন মুসলমান ছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের অধিবেশনে ১৮৮৯ জনপ্রতিনিধি যোগদান করেন, তার মধ্যে ২৫৮ জন মুসলমান ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যত প্রতিনিধি কংগ্রেস অধিবেশনসমূহে যোগদান করেন তার মধ্যে শতকরা দশভাগ প্রতিনিধি ছিলেন মুসলমান। আবার তার মধ্যে বাঙালী মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও লেখক-সাংবাদিক কংগ্রেসের প্রতি যে বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন তার ফলেই মুসলমানদের মনে

এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। যেসব মডারেটপন্থী মুসলমান নেতা ও লেখক প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলেন, তা কখনই প্রভাবশালী মুসলমান নেতা ও সাংবাদিকের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। উপরন্তু তাঁরা মুসলমানদের অনগ্রসরতা ও দুরবস্থার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়কে ও কংগ্রেসকে দোষারোপ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১০ সাল, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) 'ইসলাম প্রচারক' বলে, হিন্দুরা অকৃতজ্ঞ ও উদ্ধত। মুসলিম শাসনের আমলে তাঁরা মুসলমানের আনুকূল্য লাভ করেন, কিন্তু বর্তমানে তা তাঁরা ভুলে গেছেন। হিন্দুরা মুসলমানদের ঘৃণা করেন, এমন কি কংগ্রেস সভ্যরাও তা করেন। যখন হিন্দুরা অনুভব করবেন মুসলমানেরা তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাঁদের নিকটতম প্রতিবেশী, এবং বহুদিন তাঁরা মুসলমানের আনুকূল্য পেয়েছেন, তখনই তাঁদের মধ্যে মুসলমান বিদ্বেষ দূর হতে পারে। আর যখন হিন্দুরা অনুভব করবেন যে, ভারতের উন্নয়নের জন্য মুসলমানদের শক্তির ও উদ্যমের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন তখনই তাঁরা মুসলমানদের তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন। একই বছরে 'নবনূর' কাগজেও একই মনোভাব ব্যক্ত হয়। 'নবনূর' (বাংলা ১৩১০ সাল, পৌষ) লেখে, হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও নেতাদের কেবলমাত্র কথায় নয়, কাজেও প্রমাণ করতে হবে যে, তাঁরা মুসলমানদের উন্নতি চান। হিন্দুদের কপটতা পরিহার করতে হবে এবং মুসলমানদের ভাই হিসেবে আলিঙ্গন করতে হবে। তা না হলে কংগ্রেস ও সভা-সমিতি করা সবই ব্যর্থ প্রয়াস হবে।

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের জটিল বিষয় ছিল সরকারী কর্মে নিয়োগের সমস্যা। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩০৫ সাল, ভাদ্র) 'কোহিনূর' কাগজে লেখা হয়, সমস্ত সরকারী পদে হিন্দুরাই প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন এবং তাঁরা মুসলমানদের প্রমোশনে বাধা দেন। অবশ্য 'কোহিনূর' একথাও বলে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকের

প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১০ সাল, শ্রাবন) 'নবনূর' ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা এবং সরকারী পদে মুসলমানেরা হিন্দুদের তুলনায় কতটা পিছিয়ে আছেন তা উল্লেখ করে :

সরকারী পদ	মোটসংখ্যা	মুসলমান
হাইকোর্ট জজ	৩	১
ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ	১০	২
সাব-জজ	৬২	১
মুন্সেফ	৩৪৩	১৮
প্রভিন্সিয়াল জজ	৩	—
এডিশনাল জজ	৭	—
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর	৫২৯	৭৬
হাইকোর্টের আইনজীবী	২১৫	১১

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১০ সাল, অগ্রহায়ণ) 'নবনূর' কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অভিযোগ করা হয়, নিজেদের আধিপত্য নষ্ট হবে এই আশঙ্কায় হিন্দু অফিসারেরা মুসলমানদের সরকারী পদে নিয়োগের পথ বন্ধ করে দেন। অথচ বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে মুসলমান অফিসারেরা হিন্দু অফিসারদের চেয়ে কম যোগ্য নন।[২]

(৩) এই সময়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মুসলমান লেখকেরা হিন্দু লেখকদের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী 'মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি'র অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের প্রতি যে বিদ্বেষ প্রদর্শন করা হয় তার নিন্দা করেন। এই প্রস্তাবের ইংরেজি অনুলিপি মুদ্রিত করে 'হিন্দু সম্পাদকদের' নিকট রিভিউ করার জন্য প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁরা এই প্রস্তাবের প্রতি কোন

গুরুত্ব আরোপ করেননি। উপরন্তু 'ভারতী' পত্রিকা এই প্রস্তাব নিয়ে অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১০ সাল, অগ্রহায়ণ-পৌষ) 'ইসলাম প্রচারক' একটি প্রবন্ধে এই প্রস্তাবের উল্লেখ করে হিন্দু সম্পাদকদের আচরণের সমালোচনা করে। একই প্রবন্ধে লেখা হয়, ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন চন্দ্র সেন থেকে আরম্ভ করে 'তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্য' সকল লেখকই তাঁদের রচনায় মুসলমান জাতি ও তাঁদের গৌরবময় ইতিহাসকে নিন্দা করতে দ্বিধাবোধ করেন না। অভিযোগ করা হয়, মুসলিম অন্তঃপুরের পর্দা ছিন্ন করে মুসলমান মেয়েদের বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে এবং মুসলমান মেয়েরা হিন্দুদের প্রেমে পড়ছেন এমন চিত্র কল্পনা করে অঙ্কিত করা হয়েছে। আর যেভাবে 'যবন' শব্দের ব্যবহার করা হয় তাতে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষই প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে আরও বলা হয়, মুসলমানেরা চোখ খুললেই প্রতিটি হিন্দু লেখকের মধ্যে 'একজন দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র' অথবা 'দ্বিতীয় নবীনচন্দ্র' দেখতে পাবেন। তাঁরা প্রত্যেকেই 'যবনের শত্রু'। প্রবন্ধ লেখক ভেবেছিলেন, তাঁরা এই ত্রুটি সংশোধন করবেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছেন।[৩]

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১২ সাল, আশ্বিন) 'নবনূর' কলকাতার গ্রাণ্ড থিয়েটার হলে 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে লেখে, মুসলমানদের পক্ষে এই নাটকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। কারণ এই নাটকের মুসলমান চরিত্র কোন উচ্চ আদর্শ সামনে রেখে অঙ্কন করা হয়নি। একই বছরে (বাংলা ১৩১২ সাল, জ্যৈষ্ঠ) 'নবনূর' অভিযোগ করে, বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে ঐতিহাসিক মুসলমান চরিত্র বিকৃত করে চিত্রিত করেন। বাংলা সাহিত্যে হিন্দু লেখক কর্তৃক 'যবন' 'ম্লেচ্ছ', 'নেড়ে' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে মুসলমান লেখকেরা অপমানিত বোধ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩০৯ সাল, ভাদ্র) অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় 'বঙ্গদর্শন' কাগজে

একটি প্রবন্ধে 'যবন' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেন তাতে 'নবনূর' সন্তুষ্ট হতে পারেনি।[৪] ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১১ সাল, ফাল্গুন-চৈত্র) 'কোহিনূর' হিন্দু লেখকদের বিদ্রূপ করে মন্তব্য করে, যেভাবে 'যবন' শব্দ ব্যবহার করা হয় তাতে মনে হবে তরবারির পরিবর্তে কলমের সাহায্যেই মুসলমানদের বিতাড়িত করার চেষ্টা হচ্ছে। ইচ্ছাকৃতভাবেই হিন্দু লেখকেরা বিদ্বেষের বীজ বপন করছেন। হিন্দুরা যদি এর পরিণাম সম্পর্কে সচেতন না হন তা হলে উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি কখনই সম্ভব হবে না।[৫]

(৪) ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের ঔদাসীন্য আলোচনা করে অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩০৬ সাল, পৌষ) 'মিহির ও সুধাকর' সর্বপ্রথম এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এবং ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে মুসলমানদের উদাসীনতার কারণ উল্লেখ করে : (ক) ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ ধর্ম বিরোধী কাজ, (খ) অভিভাবকদের দূরদৃষ্টির অভাব, (গ) অর্থাভাব, (ঘ) ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্মের প্রতি আগ্রহের অভাব, (ঙ) হিন্দুদের শত্রুতা, (চ) সরকারী উৎসাহের অভাব, (ছ) মুসলমান জমিদার কর্তৃক বিলাস-ব্যসনে অর্থ অপব্যয়, (জ) কঠোর পরিশ্রমে অনাসক্তি, (ঝ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান অফিসারদের সংখ্যাল্পতা, (ঞ) সরকারী কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে হিন্দুদের অপ্রতিহত ক্ষমতা।[৬] ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩০৮ সাল, ফাল্গুন-চৈত্র) ও ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১১ সাল, অগ্রহায়ণ) 'ইসলাম প্রচারক' লেখে, ধর্মনাশের ভয়ে প্রবীণ ব্যক্তিরা তাঁদের সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষা দেবার বিরোধী। কিন্তু এই পত্রিকা মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে বলে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১১ সাল, আষাঢ়) 'কোহিনূর' প্রাচীনপন্থী গোঁড়া মুসলমান যাঁরা উর্দু ভাষায় কথা বলেন, ফারসিতে পত্রালাপ করেন, বাংলা ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করেন, তাঁদের

সমালোচনা করে। বাঙালী মুসলমানদের বাংলাভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে।[৭] ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ফলে যাতে নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে অশ্রদ্ধার ভাব মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে জাগ্রত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। ১৯০২-১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে এই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুগত থেকে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়, প্রভাবশালী হিন্দুরা মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে বাধা দেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১০ সাল, অগ্রহায়ণ) 'নবনূর' অভিযোগ করে, প্রকৃতপক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হল 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়'। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগেই হিন্দু প্রাধান্য বিদ্যমান। যখন সরকারী বৃত্তি বণ্টনের দায়িত্ব হিন্দুদের উপর অর্পিত হয় তখন তাঁরা প্রতিভাসম্পন্ন মুসলমান ছাত্রদের বঞ্চিত করে এইসব বৃত্তি হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে বণ্টন করেন। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপন মুসলমানদের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়।[৮]

(৫) অর্থনীতির ক্ষেত্রেও মুসলমানেরা হিন্দুদের তুলনায় অনেক পশ্চাৎপদ ছিলেন। মুসলমানেরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে কেন পিছিয়ে রইলেন তার দুটো প্রধান কারণ উল্লেখ করা হয়ঃ (ক) মুসলিম শাসনের অবসান ও ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। (খ) ইসলাম ধর্মের আচরণ-বিধি। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি হিন্দুরা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সহজেই নিজেদের খাপ-খাইয়ে নেন, কিন্তু মুসলমানেরা তা পারেননি। বেশীরভাগ জমিদার যেমন হিন্দু ছিলেন, তেমনি মহাজনী, ওকালতি, ডাক্তারী ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরাও হিন্দু ছিলেন। আর মুসলমানেরা প্রধানতঃ কৃষক ছিলেন। জমিদারী প্রথা ও সরকারী নীতির ফলে জমি-জমা সংক্রান্ত আইন খুবই জটিল-রূপ ধারণ করে। তাই কৃষককে নানা ধরনের মামলা-মোকদ্দমায়

জড়িয়ে পড়তে হয়। এই অবস্থায় মুসলমান কৃষককে হিন্দু আইন-জীবীদের দ্বারস্থ হতে হয়। তার ফলে কৃষকের দারিদ্র্য আরও প্রকট হয়। অন্যদিকে হিন্দু আইনজীবীদের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরে মুসলমানেরা কয়েকটি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হন। ইসলাম ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী মুসলমানদের সুদের কারবার করা নিষিদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজে যে ধর্ম-সমাজ সংস্কারের আন্দোলন চলে তাতে এই মনোভাব আরও বদ্ধমূল হয়। তাই মুসলমানেরা শিল্প-বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগে উৎসাহিত হননি। তাঁরা চিরাচরিত পথেই দিন যাপন করেন। কিন্তু এর পরিণাম মুসলমান জমিদারদের পক্ষে শুভ হয়নি। তাঁরা বিলাস-ব্যসনে অর্থ অপব্যয় করায় নিজেদের ও সম্প্রদায়ের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন। তাছাড়া জাতিভেদ প্রথা বাঙালী মুসলিম সমাজে প্রচলিত থাকায় কোন কোন ব্যবসা ও পেশাকে তাঁরা ঘৃণা করেন। সুতরাং সেই সব ব্যবসা ও পেশায় হিন্দুরাই কর্তৃত্ব করেন। এই অবস্থায় চিন্তাশীল মুসলমানেরা দুটো প্রশ্নের সম্মুখীন হন: (ক) কিভাবে ব্রিটিশ শাসনের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তিত অর্থনীতির সঙ্গে মুসলমানদের মানানো যায়? (খ) কিভাবে মুসলমান সমাজের গোঁড়া-রক্ষণশীল অংশকে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা যায়? এইভাবে অগ্রসর বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অর্থনৈতিক চিন্তার উন্মেষ হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুসলমানদের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার মূল বক্তব্য হল এই যে, মুসলমান সমাজের দুর্বলতার ফলে ইংরেজ সরকার ও হিন্দু আইনজীবীরা লাভ-বান হয়। মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ায় ও বিলাস-ব্যসনে অর্থ অপব্যয় করায় মুসলিম সমাজের অর্থ নিঃশেষিত হয়। এইভাবে মুসলিম সমাজের অর্থ ও সম্পদ ব্রিটিশ ট্রেজারী ও হিন্দুদের পকেটে চলে যাওয়ায় মুসলমানেরা দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হন। একেই মুসলমান লেখকেরা মুসলিম সমাজের দিক থেকে 'ইকনমিক ড্রেন' বলে উল্লেখ করেন।[২]

(খ) বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত—উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী মুসলিম মানস যখন সুনির্দিষ্টভাবে ইসলামধর্মীয়-প্যান ইসলামীয়, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য ও হিন্দু বিরোধী মনোভাব অবলম্বন করে স্বতন্ত্র পথে চলার চেষ্টা করে ঠিক তখনই বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা নিয়ে একটি প্রদেশ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে আর একটি প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় এবং ১৬ অক্টোবর বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করে এক নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়।[১০] ১৯ জুলাই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কথা ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বঙ্গব্যবচ্ছেদ বঙ্গসংস্কৃতিরও ব্যবচ্ছেদ করে। তার ফলে অগ্রসর হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজের এক অংশ প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ হন। কিন্তু অনগ্রসর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজের বৃহৎ অংশ এই শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় খুশিই হন। শিক্ষিত মুসলমানদের এক প্রভাবশালী অংশ একথাও মনে করেন, নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শাসনতন্ত্র হিন্দু প্রভাব মুক্ত হয়ে মুসলমানদের উন্নতির সহায়ক হবে। তাই তাঁরা স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সুনজরে দেখেননি এবং এই আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী বলেই মনে করেন। এমনকি অধিকাংশ তপশীলী হিন্দুরাও এই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেননি। পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নমঃশূদ্র জাতি হিন্দু সমাজের কঠোর জাতিভেদ প্রথার ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাই এই আন্দোলনকে তপশীলী হিন্দুরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ব্যাপার মনে করে তা থেকে দূরে থাকেন। শুধু তাই নয়, নমঃশূদ্র জাতি ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থা উন্নয়নে উদ্যোগী হন এবং তারা ব্রিটিশ সরকারের স্থায়িত্বও কামনা করেন।[১১]

লক্ষণীয় এই যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পরে

পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন সংবাদপত্র এই সিদ্ধান্তকে সমর্থনও করে। তাদের বক্তব্য হল : পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বেশী হওয়ায় সমগ্র বাংলাদেশে মুসলমানেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে পৃথক শাসনব্যবস্থা হলে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে এই মনোভাবাপন্ন সংবাদপত্রের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল।[১২] তাছাড়া "মারোয়াড়ীরা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বা স্বদেশী আন্দোলনে বাঙ্গালীর বিশেষ শত্রুতা" করেন। এমন কি কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি অংশ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিষয়টিকে প্রাদেশিক ব্যাপার বলে কাশীর কংগ্রেস অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি। পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় প্রকাশ্যেই বলেন : "বাঙ্গলার অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে, ইহাতে ভারতের অন্য প্রদেশের লোকের মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই।" শেষ পর্যন্ত কাশী কংগ্রেসের সভাপতি গোখেলের চেষ্টায় বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৩] উল্লেখযোগ্য এই যে, স্বদেশী আন্দোলনের অর্থনৈতিক প্রোগ্রামে বাংলাদেশের অর্থ বাঙালীর ঘরে রাখার ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। ইংরেজ ব্যবসায়ী ও বোম্বের মিল মালিকেরা যাতে বাংলাদেশ হতে অর্থ নিয়ে যেতে না পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। বোম্বাই ও আহমেদাবাদের মিলওয়ালারা তাদের মিলে প্রস্তুত বস্ত্র বাংলাদেশে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করে। মারোয়াড়ীরাই বাংলাদেশে প্রধান বস্ত্র বিক্রেতা ও বিলাতী বস্ত্রের আমদানীকারক ছিলেন। বিলাতী বস্ত্র বয়কট করার আন্দোলনে মারোয়াড়ীরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেননি। তাই মারোয়াড়ী দোকান হতে যাতে বিলাতী বস্ত্র বিক্রি না হয় সেজন্য যুবকেরা বড়বাজারে তাঁদের দোকানে পিকেটিং করেন। অবশ্য মারোয়াড়ীদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও বয়কট আন্দোলন প্রসারিত হয়। এই সময়ে মারোয়াড়ীদের ভূমিকা আলোচনা করে কৃষ্ণ কুমার মিত্র লেখেন : "বোম্বাই ও আহমেদাবাদের মিলওয়ালারা বাঙ্গলা দেশকে শোষণ করিয়া লক্ষপতি

হইয়াছিল। তাহাদের এই দৌরাত্ম্য দমনের জন্য বাঙ্গলা দেশে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল প্রথম সংস্থাপিত হয়।"[১৪] মারোয়াড়ীরা এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব না করায় বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দ যে ক্ষুব্ধ ছিলেন তা কৃষ্ণকুমার মিত্রের রচনাতে প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর (বাংলা ৩০ আশ্বিন) যে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয় তাতে কলকাতায় অনেক মারোয়াড়ী ও মুসলমান দোকানদারেরা দোকান বন্ধ রাখতে সম্মত হননি।[১৫]

(গ) বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময়ে অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানের ভূমিকা—স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে মুসলমান জমিদার ও অন্যান্য অংশের মুসলমানেরা অংশ গ্রহণ করলেও সমগ্র বাঙালী মুসলমান জনসংখ্যার তুলনায় তা ছিল খুবই নগণ্য। তাঁদের বিশেষ প্রভাব না থাকায় ও উপরে উল্লিখিত মুসলিম মানসিকতার ফলে তাঁরা মুসলমান সমাজকে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে সমর্থ হননি। তখন মুসলমান সমাজে প্রভাবশালী ছিলেন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, ধনবাড়ীর (ময়মনসিংহ) নবাব আলি চৌধুরী ও কলকাতার নবাব সৈয়দ আমির হোসেন। এই তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা শহরের ও গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। সেন্ট্রাল ন্যাশন্যাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশন, ফরাজী, ওয়াহাবি, তাঐউনি ইত্যাদি ধর্মীয় গ্রুপ স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময়ে ফরাজী নেতা মৌলবী কফিল আল-দিন ও খান বাহাদুর সৈয়দ আল-দিন বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ও স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নবাব সলিমুল্লাহর সঙ্গে হাত মেলান। এই দুইজন ফরাজী নেতা ফরিদপুরের বিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলনের নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদারের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। উপরন্তু ওয়াহাবি ও তাঐউনি গ্রুপের সমর্থকেরাও স্বদেশী আন্দোলনের

বিরোধী ছিলেন।[১৬] মৌলবী, মোল্লা, মুন্সী, ক্ষুদ্র সরকারী কর্মচারী, মোক্তার, সম্পন্ন কৃষক ইত্যাদি শ্রেণীর সাথে গ্রাম বাংলার সাধারণ মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তাঁরাই দরিদ্র মুসলমানদের অর্থনৈতিক ক্ষোভকে ধর্মীয় অস্ত্রের সাহায্যে হিন্দু জমিদার, মহাজন, আইনজীবী প্রভৃতির বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন। সুতরাং এই অবস্থায় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের পক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সমবেত করা অনেকটা সহজ হয়।

বলা বাহুল্য, স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলিম পত্র-পত্রিকা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বাংলাভাষায় প্রকাশিত বেশীরভাগ পত্র-পত্রিকায় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও রক্ষণশীল মনোভাব প্রবল থাকায় কোন বিশেষ গ্রুপে ভাগ করে এইসব পত্র-পত্রিকার ভূমিকা আলোচনা করা কষ্টকর। তবুও আলোচনার সুবিধার জন্য মোটামুটি এই কয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) ইসলাম ধর্মের ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে—'আহমদী' (১৮৮৬-১৮৮৯ খ্রী, পাক্ষিক, দেলদুয়ার, ময়মনসিংহ), 'হিন্দ-মুসলমান সম্মিলনী' (১৮৮৭ খ্রী, মাসিক, মাগুড়া, যশোহর), 'বালক' (১৯০১ খ্রী, সাপ্তাহিক, বরিশাল), 'ভারত-সুহৃদ' (১৯০১ খ্রী, মাসিক, বরিশাল), 'প্রচারক' (১৮৯৯-১৯০২ খ্রী, মাসিক, কলকাতা), 'সুলতান' (১৯০২-১৯১০ খ্রী, সাপ্তাহিক, কলকাতা), 'কোহিনূর' (১৮৯৮ খ্রী, মাসিক, কুমারখালি ; ১৯০৩-১৯০৭ খ্রী, পাঙ্গসা, ফরিদপুর ; ১৯১১-১৯১৬ খ্রী, কলকাতা)। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বদেশী আন্দোলনের নেতা গজনভী ও রসুল 'মুসলমান' নামক ইংরেজি পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। (২) ধর্মীয়, স্বাতন্ত্র্যবোধ-রক্ষণশীলতা অথবা অসাম্প্রদায়িকতা অথবা উভয়ের সংমিশ্রণ—'বাসনা' (১৯০৮-১৯০৯ খ্রী, মাসিক, রংপুর), 'হিতকরী' (১৮৯০-১৮৯২ খ্রী, পাক্ষিক কুষ্টিয়া), 'নবনূর' (১৯০৩-১৯০৬ খ্রী, মাসিক, কলকাতা), 'সুধাকর' (১৮৮৯-১৮৯১ খ্রী, সাপ্তাহিক, কলকাতা) প্রভৃতি। (৩) ধর্মীয়,

স্বাতন্ত্র্যবোধ-রক্ষণশীলতা অথবা হিন্দু ও কংগ্রেস বিরোধিতা অথবা উভয়ের সংমিশ্রণ—'আখবারে এসলামিয়া' (১৮৮৪-১৮৯৫ খ্রী, মাসিক, করটীয়া, ময়মনসিংহ), 'হাফেজ' (১৮৯৭ খ্রী, মাসিক, কলকাতা), 'হানিফি' (১৯০৩-১৯০৫ খ্রী, মাসিক, ময়মনসিংহ), 'ইসলাম' (১৯০০-১৯০১ খ্রী, মাসিক, কলকাতা), 'ইসলাম-প্রচারক' (১৮৯১-১৯১০ খ্রী, মাসিক, কলকাতা), 'নূর-আল-ইমান' (১৯০০-১৯০১ খ্রী, মাসিক, কলকাতা), 'মিহির' (১৮৯২-১৮৯৩ খ্রী, মাসিক, কলকাতা, এই কাগজ ও 'সুধাকর' মিলিত হওয়ায় 'মিহির ও সুধাকর' নামকরণ হয়), 'মিহির ও সুধাকর' (১৮৯৫-১৯১০ খ্রী, সাপ্তাহিক, কলকাতা) 'মোসলেম হিতৈষী' (১৯১১-১৯২১ খ্রী, সাপ্তাহিক, কলকাতা) ইত্যাদি।[১১]

প্রথম গ্রুপের পত্র-পত্রিকা হিন্দু বিদ্বেষ বা অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করেনি। বরং তারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক দুখানি কাগজ প্রকাশ করেন। 'বালক' পত্রিকার সম্পাদক তিনি নিজেই ছিলেন। আর 'ভারত সুহৃদ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি ও নিবারণ চন্দ্র দাস। আরও কয়েকখানি কাগজ হিন্দু-মুসলিম যৌথ পরিচালনায় চলে। 'মুসলমান' (১৮৮৪ খ্রী, সাপ্তাহিক, কলকাতা) কাগজের সম্পাদক ছিলেন মুসলমান, আর পরিচালক ছিলেন হিন্দু। 'নূরল ইসলাম' (১৯০১ খ্রী, বাৎসরিক, যশোহর) কাগজের মালিক ছিলেন হিন্দু, সম্পাদক ছিলেন মুসলমান। 'কোহিনূর' ও 'নবনূর' কাগজের লেখকদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ছিলেন। যেসব পত্র-পত্রিকা সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর আদর্শকে সামনে রেখে পরিচালিত হয় তাদের মধ্যে কয়েকটি খুবই ক্ষণস্থায়ী ছিল, আর যে দু-তিনটি কাগজ টিকে ছিল তাদের প্রভাবও বিশেষ ছিল না। এই যুগে উদারনৈতিক-জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও রক্ষণশীলতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ

ঘটে 'সুলতান' নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকায়। এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্মের সংহতি ও মুসলমান স্বার্থ রক্ষা করা হলেও সমগ্র দেশের মঙ্গলের কথাও এই পত্রিকা চিন্তা করে। এই পত্রিকায় মোল্লাদের আধিপত্য থাকলেও ধর্ম-সমাজের ক্ষেত্রে এই পত্রিকা উদারনৈতিক মনোভাব অবলম্বন করে। তাছাড়া এই কাগজ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ও কংগ্রেসের নীতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যখন 'সুলতান' পত্রিকা 'ছোলতান' নামে পুনরায় প্রকাশিত হয় তখন এই পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়, "স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে রাজনৈতিক হত্যার সূত্রপাত হয় এবং 'একদল ভদ্র দস্যুর' আবির্ভাব ঘটে। সৌভাগ্যবশতঃ তরুণ মুসলমানেরা এই দস্যুতা, নরহত্যা, ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।" সুতরাং 'সুলতান' পত্রিকার মত পরিবর্তন লক্ষণীয়।[১৮] দ্বিতীয় গ্রুপের পত্র-পত্রিকায় ইসলাম ধর্মের সংহতি ও স্বার্থ রক্ষা করার বিষয় আলোচিত হলেও, একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এবং বাংলাভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখ করে। 'বাসনা' পত্রিকা ঘোষণা করে, বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা হল বাংলা এবং বাঙালী মুসলমানদের জন্য জনশিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। 'হিতকরী' তাঁদের বাংলাভাষা চর্চা করতে উপদেশ দেয়। 'কোহিনূর' কাগজও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সমর্থক ছিল। এই সময়ে 'সুধাকর' অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েকজন মুসলমান জমিদারের আর্থিক সাহায্যে এই কাগজ চলে। হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ 'সুধাকর' পত্রিকার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এই সব পত্র-পত্রিকা বড়ই ক্ষণস্থায়ী ছিল। কেবলমাত্র 'নবনূর' কাগজই চার বৎসর চালু ছিল। 'নবনূর' এবং প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপে উল্লিখিত কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কোন

কোন সমস্যা উদার-জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করা হলেও মুসলমান সমাজের উন্নতির কামনায় যেভাবে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মভাব জাগ্রত করার বিষয় ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আলোচিত হয় তাতে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধই প্রকট হয়ে ওঠে এবং চিন্তার স্বচ্ছতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। যে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদের উপকরণ ক্রমবর্ধমান হয় তার সম্পর্কে লেখকেরা কোন সুচিন্তিত বক্তব্য রাখতে ব্যর্থ হন।[১১]

অন্যদিকে তৃতীয় গ্রুপের কোন কোন পত্র-পত্রিকা অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে ও খ্রীষ্টান-ব্রাহ্ম ইত্যাদি ধর্মের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে, অথবা কোন কোন পত্র-পত্রিকা কেবলমাত্র মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে হিন্দু ও কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করে। 'আখবারে এসলামিয়া', 'ইসলাম প্রচারক', 'হাফেজ', 'হানিফি' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা ইসলাম ধর্মের প্রচার করে ও ইসলামের গৌরবান্বিত ইতিহাসের দ্বারা মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হানিফি' মাসিক পত্রে ময়মনসিংহ জেলার হানাফি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের মনোভাব ব্যক্ত হয়। এইসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'ইসলাম-প্রচারক' এবং 'মিহির ও সুধাকর' প্রভাবশালী স্বদেশী আন্দোলন বিরোধী পত্রিকা ছিল। কুমিল্লা জেলার পশ্চিমগাঁও গ্রামের জমিদার ফয়েজুন্নেসা চৌধুরানী নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দিয়ে 'ইসলাম-প্রচারক' চালু রাখেন। আর 'মিহির ও সুধাকর' নবাব আলি চৌধুরী ও নবাব সলিমুল্লাহ থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার করা এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে এই পত্রিকা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান ফকির, খ্রীষ্টান মিশনারী ও ব্রাহ্মদের সমালোচনা করে। তাছাড়া এই পত্রিকা মুসলিম দুনিয়া সম্পর্কেও মুসলমানদের সচেতন করে। এই পত্রিকা মুসলমানদের বাংলাভাষা

চর্চা ও পশ্চিমী শিক্ষা গ্রহণ করতে বলে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই পত্রিকা প্রচণ্ডভাবে কংগ্রেসের বিরোধীতা করে এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। সরকার সমর্থক মুসলমান জমিদারদের মুখপত্র 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকাও প্রায় একই নীতি অনুসরণ করে। স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক 'মুসলমান' (ইংরেজি) ও 'সুলতান' থেকে 'ইসলাম-প্রচারক' এবং 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার প্রভাব অনেক বেশী ছিল।[২০]

বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা ও বাংলাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করা বাঙালী মুসলিম সমাজের অগ্রগতির পরিচায়ক এবং বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতির প্রবাহকে বেগবান করার পক্ষে সহায়ক হয়। উপরন্তু আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের প্রচেষ্টাও তাঁদের অনগ্রসরতা দূরীকরণে সহায়ক হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অভিজাত মুসলমান নেতৃবৃন্দ, মোল্লা-মৌলবী-মুন্সী ও সদ্য শিক্ষিত মুসলমানদের একটি অংশ এমনভাবে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের সমস্যাসমূহকে ব্যবহার করেন যার ফলে বাঙালীর তথা ভারতের নিজস্ব জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে মুসলমানদের অনগ্রসরতা দূরীকরণের আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। নিজেদের ধর্ম ও সম্প্রদায়কে ঘিরেই তাঁদের চিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল। তখনও শিক্ষিত মুসলমানেরা নিজেদের ভারতীয় বা বাঙালী হিসেবে ভাববে কিনা, না প্যান ইসলামী মনোভাব থেকে দূর প্রান্তের আরব-ইরাণ-তুর্কীকেই বেশী গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের ভাবনা নির্ধারণ করবে, এইসব প্রশ্নের কোনই মীমাংসা তাঁরা করতে পারেননি। শুধু তাঁদের মনে নানা প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি মারে। তেমনি বাংলা না উর্দু, এই বিতর্কে বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা বাঙালী সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে নিজেদের বাঙালীভাবে আবিষ্কার করার পথকে প্রশস্ত করলেও, প্রধানতঃ বাংলা ভাষাকে ইসলাম ধর্ম ও প্যানইসলামীয় মতবাদ প্রচারেই ব্যবহার করতে যত্নবান হন।[২১] আর এই ভাষাতেই তাঁরা

ইংরেজ শাসনকে তাঁদের উন্নতির সহায়ক মনে করে সমস্ত সমালোচনা কেন্দ্রীভূত করেন 'অগ্রসর হিন্দু সমাজের' ওপর। তাঁরা উভয় সম্প্রদায়ের অসমান বিকাশের প্রশ্নটিকে সমগ্র জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে ও ইংরেজের বিভেদ নীতির পরিণতি সম্পর্কে কোন দূরদৃষ্টি না রেখে হিন্দুদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন।

এই সময়ে মুসলিম লীগের আবির্ভাবও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকা শহরে সারা ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে মুসলমানদের বক্তব্য এই রাজনৈতিক সংগঠনের সাহায্যে আরও জোরালোভাবে প্রকাশ করা হয়। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ 'হিন্দু কংগ্রেসের' বিরুদ্ধে 'মুসলিম স্বার্থ' রক্ষায় অগ্রসর হন। স্বদেশী আন্দোলনে তার প্রতিফলন হয়। ১৯০৬-১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি স্থানে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনকে জটিল করে তোলে। যে বাঙালী জাতীয়তাবোধ ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মনোভাব সামনে রেখে স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জাতীয় ঐক্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল ও আরও অনেকে যেসব উচ্চ ভাবনা ও পরিকল্পনা প্রকাশ করেন তা অধিকাংশ মুসলমান ও তপশীলী জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি।[২২] উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে বিভেদের প্রাচীর এতটা সুদৃঢ় হয় যে, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১৩ সাল, ফাল্গুন) 'ইসলাম প্রচারক' একটি প্রবন্ধে 'বিপথগামী হিন্দু স্বদেশী আন্দোলনের' ব্যর্থতা উল্লেখ করে আনন্দ প্রকাশ করে। তাতে লেখা হয়ঃ 'স্বদেশী তাঁতের শব্দ স্তব্ধ হয়েছে। বিলাতী দ্রব্যে দেশ ভরে গেছে। কেবলমাত্র খবরের কাগজের প্রপাগাণ্ডায় ও নেতাদের শুষ্ক বক্তৃতায় স্বদেশী আন্দোলন টিকে আছে। অলীক হিন্দু স্বদেশী আন্দোলন তাঁদের দেবতার মতই দেখতে। বাইরে

চাকচিক্য রয়েছে, কিন্তু ভেতরটা নির্জীব।' ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১৪ সাল, জ্যৈষ্ঠ) আর একটি প্রবন্ধে 'ইসলাম প্রচারক' লেখে: 'বাঙালী হিন্দুরা স্বদেশী আন্দোলনের নামে দরিদ্র ও সরল মুসলমানদের নিপীড়ন করেন। তাঁরা বিলাতী বস্ত্র, চিনি ও লবণ নষ্ট করে ফেলায় মুসলমানদের অনেক বেশী দামে এইসব জিনিষ কিনতে হয়। বাধ্য হয়েই এই কষ্ট তাঁদের স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আর কতকাল মুসলমানেরা এই দুর্ভোগ ভুগবেন? জোর করে 'হিন্দু লাইন' অনুসরণ করতে বাধ্য করার ফলেই কুমিল্লা, ত্রিপুরার মগরা ও ছাতিয়ারা, ময়মনসিংহের জামালপুর, দেওয়ানগঞ্জ ও বখসিগঞ্জ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে।' ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১৪ সাল, মাঘ) 'ইসলাম প্রচারক' লেখে: 'ন্যায়পথভ্রষ্ট হিন্দু স্বদেশী আন্দোলন ইসলামের বিরোধী। ইসলাম ধর্ম কি এই নির্দেশ দেয় যে বিদেশী দ্রব্য আমদানীতে বা বৈদেশিক বাণিজ্যে বাধা দাও? না, কখনই নয়। এই ধরনের অস্বাভাবিক নির্দেশ ইসলাম ধর্মের পক্ষে দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। বরঞ্চ এই ধরনের আচরণ ইসলাম ধর্মের নিকট পাপ বলেই গণ্য।' ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১৪ সাল, মাঘ) 'ইসলাম প্রচারক' ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের সুরাট কংগ্রেসের বিরোধের কথা উল্লেখ করে আনন্দ প্রকাশ করে: 'তেইশ বছরে পদার্পণ করার মুখেই কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে। সৌভাগ্যবশতঃ দুএকজন বিপথগামী মুসলমান স্বদেশী দালাল ছাড়া কোন বিখ্যাত মুসলমানই কংগ্রেসের শবদেহের পাশে নেই।'[২৩] মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত যেসব পত্র-পত্রিকা জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা প্রচার করে তাদেরও তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা হয়। প্রধানতঃ ইংরেজি সাপ্তাহিক 'মুসলমান' ও বাংলা সাপ্তাহিক 'সুলতান' এই সমালোচনার লক্ষ্যস্থল হয়। এই দুটো কাগজকে 'কংগ্রেসের মুখপত্র' বলা হয় এবং মুসলমানদের এই দুটো কাগজ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়।[২৪] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই যে, এই দুটো কাগজ বাদ দিলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যেসব

পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার সব কয়টিই হিন্দু ও ব্রাহ্মদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যথা—'বেঙ্গলী', 'সঞ্জীবনী', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'বন্দেমাতরম', 'হিতবাদী' ইত্যাদি।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যখন বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তখন প্রধানতঃ তিনটি কারণে মুসলিম পত্র-পত্রিকা তার বিরোধিতা করে ঃ (ক) সরকারের সমর্থক এইসব পত্র-পত্রিকা সরকার বিরোধী আন্দোলনের বিরোধী ছিল। (খ) তারা সরকার বিরোধী কার্যাবলী মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে। (গ) তারা মনে করে, বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ধর্মীয় দিক উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদেরই প্রকাশ। মুসলমান লেখকেরা বলেন, তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধব হিন্দু জাতীয়তাবাদের যে ব্যাখ্যা করেন তা উগ্রভাবে ইসলাম-বিরোধী। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১৪ সাল, জ্যৈষ্ঠ) 'ইসলাম প্রচারক' শিক্ষিত মুসলমানদের 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের' সঙ্গে যোগ দিতে অথবা তাঁদের দ্বারা প্ররোচিত হতে নিষেধ করে। একই সংখ্যায় 'ইসলাম প্রচারক' পাঞ্জাবে মুসলিম সংগঠনগুলো পাঞ্জাবী হিন্দু সন্ত্রাসবাদী, বিশেষ করে আর্য সমাজে কংগ্রেসের সমর্থকদের কার্যাবলীর নিন্দা করে যে সব সভাসমিতি হয় তাও প্রকাশ করে। এই সময়ে মুসলমানেরা সরকারের প্রতি অনুগত থাকায় 'ইসলাম প্রচারক' আনন্দ প্রকাশ করে।[২৫]

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে মূল বিরোধ ছিল বাঙালীর জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে ইংরেজ শাসক-শিল্পপতিদের বিরোধ। তাহলেও এর সঙ্গে কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিরোধও সংযুক্ত হয়, যথা—বাঙালী স্বার্থের সঙ্গে অবাঙালী-মারোয়াড়ী স্বার্থের বিরোধ, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সাথে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বিরোধ এবং হিন্দুর সাথে মুসলমানের বিরোধ। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, মূল বিরোধকে কেন্দ্র করে আন্দোলন জোরালো হবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের ক্ষেত্রটি আরও প্রসারিত হয়। একদিকে জাতীয়-বৈপ্লবিক চেতনার

প্রকাশ হয়, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ব্যাহত হয়। এইভাবে এক অভিনব জটিল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অথচ স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে কলকাতা ও মফস্বলে কয়েকজন মুসলমান জমিদার ও অন্যান্য অংশের কিছুসংখ্যক মুসলমান অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মনোভাব পরিস্ফুট হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় লেখা হয়, এই আন্দোলনের ফলে সর্বত্র তাঁত শিল্প গড়ে ওঠায় তাঁতীরা নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে পারছে। প্রচুর পরিমাণে তন্তুবয়নের মাকু তৈরি হচ্ছে। তার ফলে মুসলমান তাঁতী ও কারিগরেরা লাভবান হচ্ছে। তা সত্ত্বেও কোন কোন ব্যক্তি মিহি কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চীৎকার শুরু করেছেন। কিন্তু দরিদ্র মুসলমান কৃষকেরা মোটা ধুতি পরিধান করতে অভ্যস্ত। সুতরাং মিহি কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকের কোনই অসুবিধা হয়নি। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত মুসলমানেরাও কোন অভিযোগ করেন না। কারণ তাঁরা জানেন, স্বদেশী দ্রব্য দ্রুত তৈরি হলে জিনিষের মূল্য হ্রাস পাবে। তাছাড়া মুসলমান দর্জি ও জুতো কারবারিরাও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে লাভবান হচ্ছে। এমনকি মুসলমান জারি গায়কদের ওপরও এই আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। বরিশাল জেলার তিনজন 'বায়াতি' (সকলেই মুসলমান) জারি গান করার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে তাঁরাও সুন্দর জারি গান রচনা করে মুসলমানদের মধ্যে গেয়ে বেড়ান। তাঁদের গান শুনে মুসলমানেরা খুবই অনুপ্রাণিত হন। এইসব তথ্য উল্লেখ করে 'বেঙ্গলী' কাগজ প্রমাণ করার চেষ্টা করে মুসলমানেরাও স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।[২৬]

কিন্তু এই সাফল্য খুবই ক্ষণস্থায়ী ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের আর্থিক অসুবিধা হয়। অন্যদিকে "চরকা ও তাঁতের দ্বারা

বিলাতী বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করা এবং বাঙ্গালীর বস্ত্রের অভাব দূর করা" সম্ভব হয়নি। তাছাড়া দেখা যায়, "চরকায় সূতা কাটিয়া কেহ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না।" সুতরাং লোকসান দিয়ে চরকা প্রচলন করা সম্ভব হয়নি।[২৭] উপরন্তু এই আন্দোলনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে সুদৃঢ় না করে স্বাতন্ত্র্যবোধকেই প্রকট করে। এই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে হিন্দুরা উদ্যোগী হন এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় অনেক স্বদেশী শিল্প গড়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ কর্তৃক এই দেশ শোষণের যে চিত্র তুলে ধরেন তার ফলেই শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের অর্থনৈতিক চিন্তা আরও বিকশিত হয়। এই চিন্তার ফলেই তাঁরা হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক মুসলিম সম্প্রদায় শোষণের বিষয়ে সচেতন হন এবং কেবলমাত্র মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার ও মুসলিম সমাজের আর্থিক অগ্রগতির জন্য শিক্ষিত মুসলমানেরা 'স্ব-সম্প্রদায় আন্দোলন' সুরু করেন। বিদেশী দ্রব্য বয়কট আন্দোলন ভারতের শিল্প বিকাশে সহায়ক হয়। স্বভাবতই মুসলমানেরাও এই সুযোগ গ্রহণ করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে কয়েকজন মুসলমান ব্যবসায়ী চট্টগ্রাম-রেঙ্গুন রুটে জলপথে যাতায়াতের জন্য একটি স্টীমার কোম্পানী খোলেন। এই সময়ে ঢাকার কেরানীগঞ্জ নামক স্থানে যে 'ইসলামিক কনফারেন্স' হয় তাতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার ফলে কেরানীগঞ্জ, জিঞ্জিরা ও পার্শ্ববর্তী জেলার মুসলমানেরা হিন্দু দোকান থেকে মিষ্টি কেনা বন্ধ করেন এবং অনেক জায়গায় নিজেরাই মুদি দোকান খুলে ব্যবসা আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই মুসলমানেরা শিল্পে, বাণিজ্যে ও কৃষিতে অংশ গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে উদ্যোগী হন। এমনকি 'ইসলাম প্রচারক' আধুনিক শিল্প, বিজ্ঞান ও কৃষি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের জন্য মুসলমান ছাত্রদের ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান দেশে প্রেরণের কথাও আলোচনা করে। এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনের অর্থনৈতিক

প্রোগ্রাম মুসলমানদের আর্থিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পথে চলতে উৎসাহিত করে।[২৮]

প্রসঙ্গতঃ ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ভূমিকাও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাহলে কি কারণে মুসলমানেরা এই আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেননি তা বোঝা সহজ হবে। স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রভাবশালী অংশ ছিলেন হিন্দু জমিদার শ্রেণী। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলিম প্রজা-প্রধান পূর্ববঙ্গের জমিদারী প্রথা বিলোপ হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় হিন্দু জমিদারেরা উদ্বিগ্ন হন। তাঁদের মনে এই ভয়ও ঢোকে যে, পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা ধর্মগতভাবে সংখ্যালঘু জনসমষ্টিতে পরিণত হওয়ায় তাঁদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তাঁরা ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা জমিদারী প্রথাকে অটুট রেখেই স্বদেশী শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নতুন ভাইসরয়কে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়, তা থেকে এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মনোভাব বোঝা যায়। এই অভিনন্দন পত্রে ব্রিটিশ শাসনের ন্যায়পরায়ণতার ওপর আস্থা স্থাপন করে বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। আশা করা হয়, সরকার ভারতীয় শিল্প বিকাশে এবং টেকনিকাল শিক্ষাসহ সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে সহায়তা করবে। একথাও বলা হয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশ এক সমৃদ্ধশালী প্রদেশে পরিণত হয়েছে।[২৯] এই মনোভাবের দ্বারা হিন্দু জমিদার শ্রেণী পরিচালিত হওয়ায় তাঁরা মুসলমান কৃষকের নিকটে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে পারেননি। স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রোগ্রাম ও প্রভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই আন্দোলনের ফলে জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ হলেও, কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বদেশী শিল্প গড়ে ওঠায় জাতীয় অর্থনীতি বিকশিত হলেও, ঔপনিবেশিক শাসন-

ব্যবস্থার মধ্যে জমিদারী প্রথা অটুট রেখে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পথ যেমন প্রশস্ত করা যায়নি, তেমনি শিক্ষিত হিন্দু সমাজের গণ্ডীর বাইরে স্বদেশী আন্দোলনের চেতনা বৃহত্তর মুসলিম ও তপশীলী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসারিত হয়ে সমগ্র বাঙালীর জাতীয় চেতনায় উন্নীত হয়নি। আর তাই স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ গ্রামবাংলার পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে। পূর্ববঙ্গ ও আসামে চাকরি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানেরা যে সুবিধা পান তা তাঁরা অবিভক্ত বাংলায় পেতেন না। এই কারণে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর দিল্লির দরবার হতে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার কথা ঘোষিত হওয়ায় মুসলমানেরা ক্ষুব্ধ হন।[৩০] এই ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ, দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বঙ্গপ্রদেশ এবং বিহার, ছোটনাগপুর ও ওড়িশাকে নিয়ে বিহার ও ওড়িশা প্রদেশ গঠিত হয়, আর আসামকে পুনরায় চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে পরিণত করা হয়। অবশ্য আসামের সঙ্গে বঙ্গভাষী এলাকা, যথা—সিলেট ও কাছাড় জেলা এবং আরও কয়েকটি এলাকা যুক্ত রাখা হয়। বিহার ও ওড়িশা প্রদেশের সঙ্গেও বঙ্গভাষী বড় এলাকা চলে যায়। এইসব সত্ত্বেও বিপুলসংখ্যক বঙ্গভাষী জনসমষ্টি নিয়ে নতুন বঙ্গপ্রদেশ গঠিত হয়। অবশ্য এই প্রদেশে মুসলমানেরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি। এই নতুন ব্যবস্থাতেও সাম্প্রদায়িক চেতনা ক্রমপ্রসারিত হয়। ইতিপূর্বে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মর্লি-মিণ্টো সংস্কার অনুযায়ী 'পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা' প্রবর্তিত হওয়ায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ বৃদ্ধি পায়।

(২) ভূমি-সমস্যার জটিলতা :

(ক) **নতুন শ্রেণীবিন্যাস**—১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে যে নতুন ভূমি-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তার ফলে কৃষক শ্রেণীর ওপর ধাপে ধাপে জমিদার, তালুকদার, গাঁতিদার, পত্তনিদার, দর-দর-

পত্তনিদার প্রভৃতি নানা খাজনা আদায়-সংক্রান্ত মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব হয়। জমিজমা ভাগবিলির আশ্রয়ে বিনা পরিশ্রমে ও বিনা মূলধনে জোতস্বত্ব ভোগ করে এমন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। সরকারের নিয়মিত খাজনা আদায়ের কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ভূমিস্বত্ব নানা অংশে বিভক্ত হওয়ায় এবং কৃষির ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন মধ্যবর্তীর সৃষ্টি হওয়ায় ভূমি ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে বাংলাদেশে এক নতুন প্রকার শ্রেণীবিন্যাস দেখা দেয়। তারফলে একদিকে যেমন কৃষির অবনতি হয়, তেমনি এক নতুন ধরণের জটিল সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট এই শ্রেণীবিভাগ ক্রমান্বয়ে জমিহীন আধিয়ার, ভাগীদার ও দিনমজুর শ্রেণীর সৃষ্টি করায় এবং জমির অবাধ লেন-দেনের ক্ষেত্রে মহাজনের আবির্ভাব ঘটায় গ্রাম বাংলায় আর্থিক ব্যবধান ভয়ানক বৃদ্ধি পায়।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রামের সংখ্যা ছিল ৮৪, ২১৩। ধর্ম অনুযায়ী গ্রামের অধিবাসীরা হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য এই তিন অংশে বিভক্ত ছিল। আর বৃত্তি অনুযায়ী তাদের নয়টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) জমিদার-জোতদার—এরা নিজেদের জমি অন্যকে চাষ করতে দেয় এবং কমপক্ষে ফসলের অর্ধাংশ গ্রহণ করে। (২) ধনী চাষী বা ধনী গৃহস্থ—এরা ক্ষেতমজুর দিয়ে নিজেদের জমি চাষ করায়। (৩) চাষী গৃহস্থ—এরা নিজেদের জমিতে নিজেরাই চাষ করে এবং জমির আয় থেকেই সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। (৪) আধিয়ার বা বর্গাদার—এরা সাধারণতঃ অন্যের জমিতে চাষ করে ফসলের অংশ নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা একজোড়া বলদ, একটি লাঙল ও ফসলের বীজের অধিকারী। ক্ষেত-মজুরদের এইসব কিছুই থাকে না। ক্ষেতমজুরেরা অর্থ বা ফসলের মাধ্যমে যে মজুরী পাবে তা আগেই নির্ধারিত হয়। কিন্তু আধিয়ার বা বর্গাদার প্রাপ্য জমিতে উৎপন্ন ফসলের ওপর নির্ভর করে। (৫) কিষাণ বা কিষাণ-মজুর—এদেরই ক্ষেতমজুর বলা হয়। কৃষিতে

কাজের বিনিময়ে তারা মজুরী পায়। (৬) কারিগর—তাঁতী, সূত্রধর, কামার, কুমোর প্রভৃতি যারা নিজেদের উৎপাদনের হাতিয়ার দিয়ে ও পরিশ্রমে জিনিষপত্র নিজেদের ভরণপোষণের জন্য প্রস্তুত করে। (৭) ব্যবসায়ী—ছোট দোকানদার, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি। (৮) কর্মচারী—স্থানীয় সরকারী অফিসে, জনপ্রতিষ্ঠানে অথবা বাড়িতে কর্মরত গৃহভৃত্য, চৌকিদার, বার্তাবাহক, ঝাড়ুদার প্রভৃতি। (৯) অন্যান্য —সম্পদশালী ব্যক্তিদের দানের ওপর নির্ভরশীল, খুবই নগন্য কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি প্রভৃতি। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রাম বাংলার দিকে তাকালে আমরা মোটামুটি এই শ্রেণী বিন্যাস দেখতে পাই। সাধারণতঃ রায়ত তাদেরই বলা হয় যারা নিজেরাই নিজেদের জমি চাষ করে। তারা কখনও প্রয়োজন হলে ক্ষেতমজুরদের নিয়োগ করে। অবশ্য ফসলের সমস্ত অংশই রায়তের প্রাপ্য।[৩১]

উপরে উল্লিখিত শ্রেণীসমূহকে আবার প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ প্রথম শ্রেণী—জমিদার, ধনীচাষী প্রভৃতি—সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ; দ্বিতীয় শ্রেণী – চাষী গৃহস্থ, কারিগর ও ব্যবসায়ী—এরা সকলেই স্বাবলম্বী। কারিগর ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরাও নিজেদের পেশা ছাড়াও আংশিকভাবে জমির ওপর নির্ভরশীল; তৃতীয় শ্রেণী—আধিয়ার বা বর্গাদার, ক্ষেতমজুর, কর্মচারী ও অন্যান্য অংশের মানুষ—তারা কাজের জন্য অন্যের ওপর অথবা অন্যের দানের ওপর নির্ভরশীল। গ্রাম্য অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। এর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ প্রধানতঃ অ-কৃষিমূলক পেশায় নিযুক্ত থাকলেও, কারিগর, ব্যবসায়ী ইত্যাদি হিসেবে ওতপ্রোতভাবে কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। কারণ তাদের জীবিকা কৃষকের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি কৃষকের প্রয়োজনও তারা মেটায়। তাছাড়া এক বৃহৎ সংখ্যক অ-কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থ কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যায় মোট পরিবারবর্গের শতকরা চারভাগ হওয়া সত্ত্বেও তারা খুবই স্বচ্ছল, দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যা ছিল প্রায়

অর্ধেক এবং তাদের আয় সাধারণ আয়ের চেয়ে একটু বেশী ছিল, আর তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশী হওয়া সত্ত্বেও তাদের আয় ছিল সাধারণ আয়েরও অনেক নিম্নে। ব্রিটিশ আমলে গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো এই ধরণের ছিল।[৩২]

(খ) জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের আয়—বাংলাদেশের জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা প্রতি বৎসর কৃষকদের নিকট হতে যে খাজনা আদায় করেন তার পরিমাণ ছিল প্রায় ১৬৷৷০ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৩৷৷০ কোটি টাকা তাঁরা সরকারকে রাজস্ব ও সেচ বাবদ দেন। তাঁরা জমিদারী পরিচালনার জন্য ব্যয় করেন ৩ কোটি টাকা। এইসব টাকা বাদ দিয়ে জমিদারের মোট লাভ হয় ১০ কোটি টাকা। কোন মূলধন না খাটিয়েই এই টাকাটা তাঁরা অর্জন করেন। বলা বাহুল্য, এই পরিমাণ টাকা তাঁরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই অর্জন করেন। বে-আইনীভাবে তাঁরা যে টাকা সংগ্রহ করেন তার পরিমানও ছিল অনেক।[৩৩]

বাংলাদেশে ছোট-বড় জমিদার, গাঁতিদার প্রভৃতি খাজনাভোগী পরিবারের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই আয় খুব সামান্য ছিল। ভবানী সেন কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, সমস্ত জমিদারীর এক-তৃতীয়াংশ নয়টি বিখ্যাত জমিদার পরিবারের দখলে ছিল, আর তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু, যথা—বর্ধমানের মহারাজা, কাশীমবাজারের মহারাজা, প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, ব্রজেন্দ্র কিশোর, নাটোরের জমিদার, ময়মনসিংহের মহারাজা, নসিপুর, দীঘাপাতিয়া, পুঠিয়া প্রভৃতি। এই নয়টি পরিবার সরকারকে যে টাকা দেন তার পরিমান ছিল এক কোটি টাকা। অর্থাৎ তাঁরা মোট রাজস্বের তিন ভাগের এক ভাগ দেন। তাঁদের মধ্যে বর্ধমানের মহারাজাই ছিলেন সবচেয়ে বড় জমিদার। এই জমিদারী থেকে তাঁর বাৎসরিক আয় ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। নাটোরের জমিদারের বাৎসরিক আয় ছিল ৪ লক্ষ টাকা। ময়মনসিংহের মহারাজার

বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। এই পরিবারের পোষ্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১২/১৪ জন অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭৫ হাজার টাকা।[৩৪] অথচ বাংলাদেশের একজন চাষীর গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ছিল মাত্র ৪৩ টাকা।[৩৫] ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টে কৃষি-পরিবারের আয়-ব্যয় হিসেব করে দেখানো হয়, প্রতিটি পরিবারের বাৎসরিক উদ্বৃত্ত থাকে মাত্র ৩০ টাকা, অর্থাৎ মাথা পিছু ৬ টাকা।[৩৬] সাধারণতঃ ৫ একর জমি থাকলে একটি কৃষক পরিবারের (৫ জন করে লোক ধরে) চলে যায়। কিন্তু ৪ একর বা তার থেকে কম জমি ছিল এমন কৃষক পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৬৬ থেকেও কিছু বেশী ছিল।[৩৭]

প্রশ্ন হল : যে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমিদারদের হাতে আসে তা কিভাবে ব্যয়িত হয়? এই টাকা কি তাঁরা শিল্পে নিয়োগ করেন, না ব্যক্তিগত বিলাসিতায় ব্যয় করেন? এক কথায় বলা চলে, এই টাকাটা তাঁরা কৃষির উন্নতিতেও ব্যয় করেননি, শিল্পেও খাটাননি, নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ও বিলাসিতায় ব্যয় করেন। তাই বাংলা দেশের শিল্প বিকাশে জমিদারদের দান মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। মাত্র একটি দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ময়মনসিংহের মহারাজার বাৎসরিক আয় ছিল ১০ লক্ষ টাকা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলাদেশে যে স্বদেশীর হাওয়া বইতে সুরু করে তাতে বিভিন্ন শিল্পে মূলধন নিয়োগ করে দেশীয় শিল্পকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যদি এই জমিদারীর আয়ের হিসেব করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, এই ৪০ বৎসরে এই জমিদারী থেকে খাজনা বাবদ আয় হয় ৪ কোটি টাকা। কিন্তু এই সময়ে ময়মনসিংহের মহারাজা বিভিন্ন শিল্পের শেয়ার কিনে যে টাকা খাটান তার পরিমান হল মাত্র ৫ লক্ষ টাকা। উল্লেখযোগ্য এই, ময়মনসিংহের

মহারাজা শশীকান্ত আচার্য নিজে বাংলাদেশের কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তাঁর মত ব্যক্তিও যখন আয়ের এক চতুর্থাংশও (অর্থাৎ এক কোটি টাকা) মূলধনরূপে নিয়োগ করেননি, তখন অন্যান্য জমিদারের ভূমিকা সহজেই অনুমান করা যায়।[৩৮]

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশে মোট প্রায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ একর চাষের জমি ছিল। গত দেড়শ বছর ধরে জমিদার-তালুকদার-জোতদার প্রভৃতি মাত্র ১৭ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেন, আর সরকারের পক্ষ থেকে এক লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়। তাই ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দেও ৩৭ লক্ষ একর পতিত জমি ছিল। যদি গত ৫০ বৎসর ধরে (১৮৯০/৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) জমিদারেরা তাঁদের আয়ের দশমাংশ জমিতে সেচের ও সারের ব্যবস্থার জন্য খরচ করতেন তাহলে বাংলাদেশে আর পতিত জমি দেখা যেত না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাজস্ব বাবদ সরকার প্রতি বৎসর ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা গ্রহণ করে, আর তার মধ্যে জল সেচনের বাবদ ব্যয় করে ৯ লক্ষ টাকা। যদি সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থা মিলিয়ে হিসেব করা যায়, তাহলে দেখা যাবে মাত্র শতকরা ৬ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রায় ৩০ বৎসর ধরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা শতকরা ২০ জন করে বৃদ্ধি পেলেও, আবাদী জমির পরিমান বৃদ্ধি পায় মাত্র শতকরা একভাগ। আর এই সময়ে এক বিঘা জমিতে ফসলের পরিমান বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি পায়নি।[৩৯]

ফ্লাউড কমিশনের তদন্ত থেকে (১৯৩৮-৪০ খ্রী) জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের সম্পদ বৃদ্ধি সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। খাজনার টাকা বাদেও, তাঁরা খাস জমি বর্গা দিয়ে ফসলের অর্ধেক গ্রহণ করেন। আবাদী জমির শতকরা ২১ ভাগ অর্থাৎ ৫ ভাগের এক ভাগ বর্গা প্রথায় চাষ হয়। ফ্লাউড কমিশনের তদন্তে জানা যায়, সাধারণতঃ বাংলাদেশে এক বছরে ১৪৩ কোটি

টাকার ফসল উৎপন্ন হয়। যেহেতু ৫ ভাগ আবাদী জমির ১ ভাগে বর্গা চাষ হয় এবং জমিদারেরা ফসলের অর্ধেক ভোগ করেন, তার ফলে দেখা যায়, মোট উৎপন্ন ফসলের দশভাগের একভাগ অর্থাৎ প্রায় ১৪½ কোটি টাকা জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে যায়। কি বিপুল পরিমান বিত্ত এই শ্রেণী আত্মসাৎ করে তা সহজেই বোঝা যায়।[৪০]

ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ফ্লাউড কমিশনের নিকটে যে বিবরণ দেন তাতে বলেন, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময়ে দেশের তিনভাগের দুভাগ জমি ছিল পতিত, আর বর্তমানে বারো ভাগের একভাগ মাত্র পতিত জমি। সুতরাং জমিদারেরা প্রচুর পতিত জমি আবাদ করেন। যদি পতিত জমি আবাদ করার অর্থ হয় মূলধন নিয়োগ করে সারের ব্যবস্থার মাধ্যমে অযোগ্য জমিকে চাষের যোগ্য করে তোলা, তাহলে আমরা দেখতে পাই ২ কোটি ৮৯ লক্ষ একর আবাদী জমির মধ্যে মাত্র ১৭ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ মাত্র সতেরো ভাগের একভাগে তাঁরা সেচের ব্যবস্থা করেন।[৪১]

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই চাষের জমি বৃদ্ধি পায়। কারণ গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও দেশীয় কারিগরেরা নিজেদের ব্যবসা হারিয়ে ফেলায় তারা ক্রমান্বয়ে জমির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তারা জমিদারদের সেলামী ও নজর দিয়ে চাষের জমি সংগ্রহ করে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেন্সাস রিপোর্টসমূহ বিশ্লেষণ করে নির্মল কুমার বসু দেখান, বিভিন্ন কারিগরদের মধ্যে কতজন অন্য পেশায় চলে যান অথবা নিজেদের পৈত্রিক পেশা থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষেতমজুর অথবা শিল্পমজুরে পরিণত হন।[৪২] বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কারিগরের সংখ্যা হ্রাস পায় ২ লক্ষ। অবশ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এর চেয়ে বেশী হ্রাস পায়। অন্যদিকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কৃষিজীবী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এক কোটি। ১৯২১

খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরও এক কোটি বৃদ্ধি পায়। এই কৃষিজীবী জনসমষ্টিই অনাবাদী জমি আবাদ করে। এর জন্য বাংলাদেশের জমিদারেরা কোন অর্থ খরচ করেননি, উপরন্তু তাঁদের আয়ের মাত্রা বৃদ্ধিই পায়। এইসব জমি আবাদ করতে গিয়ে কৃষিজীবীদের ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তে হয়। তাদের এই ঋণের বোঝা বাড়তেই থাকে। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টে জানা যায়, ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষকের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট একশত কোটি টাকা।[৪৩] ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে কৃষকদের ঋণের পরিমাণ ছিল ২১০ কোটি টাকা।[৪৪] কিন্তু ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় জমিদারী প্রথার সপক্ষে বক্তব্য রাখার সময়ে এই মূল বিষয়টি একেবারে এড়িয়ে যান।[৪৫] রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কৃষাণের সংখ্যা ১৮ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭ লক্ষ হয়। আবার এই সময়ের মধ্যে ভূম্যধিকারীদের সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬½ লক্ষ হয়। তিনি লেখেন, ভূমির শোষকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও, ভূমির পোষকের সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পায়। যারা ভূমির পোষক ছিল তাদের জোতস্বত্ব মহাজন ও মধ্যবিত্তের কবলে যায়। তাছাড়া ভূমিহীন কৃষকের গোটা বছরে কাজের ব্যবস্থা না থাকায় অবস্থা জটিলরূপ ধারণ করে।[৪৬]

বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিল্প গড়ে না ওঠায় এবং বহুসংখ্যক কারিগর নিজেদের পেশা হারিয়ে জীবিকার সন্ধানে জমির ওপর নির্ভরশীল হতে চেষ্টা করায়, স্বাভাবিক কারণেই Sub-infeudation এর পরিণতি হল নানা মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর আবির্ভাব। লক্ষণীয় এই যে, এই মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব সরকারী নীতির ফলেই সম্ভব হয় এবং কার্যতঃ সরকার পক্ষ থেকে তাকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। জমির সঙ্গে যুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করাই ছিল

সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে যে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের গোড়াপত্তন হয় তাদের প্রধান অংশ জমির সঙ্গেই যুক্ত ছিল।[৪৭] সমগ্র জনসমষ্টির কি বিরাট অংশ জমির ওপর নির্ভরশীল ছিল, তার পরিচয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে পাওয়া যায় :

অ-কৃষিজীবী জমির মালিক, যাঁরা
খাজনা গ্রহণ করেন, তাঁদের সংখ্যা হল— ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার
ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের এজেণ্ট
ও ম্যানেজারের সংখ্যা হল— ১ হাজার
খাজনা আদায়কারী, কেরানী
ইত্যাদির সংখ্যা হল— ৫১ হাজার

তাছাড়া তাঁদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যাও ছিল অনেক। বাংলাদেশে সমস্ত শ্রেণীর রায়তদের দখলে ছিল ২৮ মিলিয়ন একর জমি এবং তার মধ্য থেকে তারা অধীনস্থ রায়তদের ৩·১ মিলিয়ন একর জমি ইজারা (Sublet) দেয়। ভূমি রাজস্ব দেয় এমন এস্টেটের সংখ্যা ছিল এক লক্ষেরও বেশী এবং জোত-জমার (tenures) সংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ। জমিদার-জোতদার, খাজনা আদায়কারী রায়ত এবং তাঁদের ওপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ধরে সর্বমোট জনসংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশী ছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের সর্বমোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। ফ্লাউড কমিশনের নিকট সাক্ষ্যে জমিদারেরা এইসব তথ্য পরিবেশন করেন। তাঁরা Sub-infeudation এর সপক্ষে যুক্তির অবতারণা করে বলেন, জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অবদানের ফলেই আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে। সেন্সাস রিপোর্ট ও জমিদারদের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ভূমি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে হিন্দুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কতটা বৃদ্ধি পায়।[৪৮]

(গ) জমি হস্তান্তর—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটুটরি কমিশন

লক্ষ্য করে, বেশীর ভাগ কৃষকই মহাজনদের নিকট ঋণে আবদ্ধ। উত্তরোত্তর ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকের জমি মহাজন ও অ-কৃষিজীবী শ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত হয়। তার ফলে বর্গাদার ও অধীনস্থ রায়তের সংখ্যা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়ঃ "Free transferability has tended and must tend to facilitate the transfer of raiyati lands into the hands of mahajans and non-agriculturists, with the result that the number of rack-rented bargadars and under-raiyats is going up by leaps and bounds. It is clear that it is as great a danger to the stability of the existing raiyats as their opportunities for subletting".[৪৯] ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জমি বিক্রয় অথবা বন্ধক রাখবার জন্য যেসব দলিল রেজিস্ট্রি হয় তার একটি হিসেব বঙ্গীয় সরকারের তথ্য থেকে জানা যায়। এই সময়ে জমি বিক্রয় বৃদ্ধি পায়, বন্ধকীর সংখ্যা কমে যায়। অর্থনৈতিক সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকেরা মহাজনের নিকট জমি বন্ধক রাখার চেয়ে জমি বিক্রয় করাই বেশী লাভজনক মনে করে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের বছরে স্বাভাবিক কারণেই জমি হস্তান্তরের সংখ্যা অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে হার মানিয়ে দেয়। তাই এই বছর বাদ দিয়ে যদি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১২ বছরের হিসেব নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যায়, এই সময়ে জমি বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পায়।[৫০] বাংলাদেশে অঞ্চল বিশেষে খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষ প্রায়ই দেখা দেয়। এই ধরণের দুর্ভিক্ষ ১৯১৮-২১ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৩৪ ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দেও হয়। আর প্রতিবারই দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলের কৃষকেরা জমিচ্যুত হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জমি হস্তান্তরের সংখ্যা খুবই বেশী ছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময়েও অনেক জমি হস্তান্তর হয়।[৫১]

(ঘ) **পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ ও জমি হস্তান্তর**—১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত সময়কেই পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় বলে উল্লেখ করা হয়। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হঠাৎ হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে যে অর্থনৈতিক অবক্ষয় বাংলাদেশে দেখা দেয় এই দুর্ভিক্ষ হল তারই পরিণতি। এই দুর্ভিক্ষের পূর্বেই, অর্থাৎ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রকট হয়ে ওঠে। এই প্রাক্-দুর্ভিক্ষ যুগে (জানুয়ারী ১৯৩৯—জানুয়ারী ১৯৪৩ খ্রী) যারা নিজেদের অবস্থা উন্নত করে তাদের তুলনায় আর্থিক সঙ্কটে পীড়িত দুস্থদের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশী। কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে: প্রায় ৬·৮৪% পরিবার আর্থিক সঙ্কটে পতিত হয়, ৩·৩২% পরিবার আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে সক্ষম হয়, আর ১·০৭% পরিবারের অবস্থা ততটা স্বচ্ছভাবে জানা যায় না। এই তথ্য থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন, প্রাক্-দুর্ভিক্ষ যুগেই অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সূত্রপাত, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে তার চূড়ান্ত পরিণতি।[৫২]

একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের ৮৬টি সাবডিভিশনের পরিবারের সংখ্যা ছিল ১০২·৪ লক্ষ (১০·২ মিলিয়ন)। প্রতি পরিবারে গড়পড়তা ৫·৪ জন ব্যক্তি ধরে মোট জনসংখ্যা ছিল ৫৫২ লক্ষ (৫৫·২ মিলিয়ন)। ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পূর্বে গ্রামের মোট পরিবারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের কোন ধানী জমি (paddy land) ছিল না, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের দুইএকরেরও কম ছিল। সুতরাং প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পরিবারের হয় ধানী জমি ছিল না অথবা থাকলেও দুই একরের কম ছিল। কোনমতে জীবন-ধারণের জন্য গড়পড়তা প্রতি পরিবারের দুই একর ধানী জমি প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে গড়পড়তা গ্রামের প্রতি পরিবারের ১·৮ একর জমি ছিল। স্বভাবতই এই পরিমাণ জমি জীবনধারণের মানের নিম্নে ছিল অথবা একেবারে সীমান্ত রেখায় (border line)

ছিল।[৫৩] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে কয়েক বছর ধরে কিছু খাদ্যদ্রব্য আমদানী করতে হয়।[৫৪]

বাংলাদেশের বেশীর ভাগ সাবডিভিশনে (৪১টা সাবডিভিশনে সমীক্ষা চালানো হয়, তার মধ্যে ২৬টা সাবডিভিশনে) শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী পরিবারের পরিবার পিছু ২ একরের কম ধানী জমি ছিল। প্রতি পরিবারে গড়পড়তা জমির পরিমাণ ছিল ১·৫ থেকে ২ একরের মধ্যে। যেসব সাবডিভিশনে পরিবারসমূহের ধানী জমির পরিমাণ জীবনধারণের মানের নিম্নে ছিল তারাই দুর্ভিক্ষের কবলে সহজে পতিত হয়। এপ্রিল ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এপ্রিল ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৯·২ লক্ষ পরিবার তাদের ধানী জমির সবটা অথবা কিছুটা বিক্রি করে দেয়। তাদের মধ্যে ২·৬ লক্ষ পরিবার সমস্ত জমি বিক্রি করার ফলে জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন হারিয়ে ফেলে; ৬·৭ লক্ষ পরিবার তাদের ধানী জমি বন্ধক রাখে, আর ১·০৩ লক্ষ পরিবার ধানী জমির কিছু অংশ বিক্রি করে দেয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রায় ১৬ লক্ষ পরিবার (দুর্ভিক্ষের পূর্বে যাদের ধানী জমি ছিল তাদের সংখ্যা ধরলে প্রায় এক-চতুর্থাংশ হবে) হয় সব জমি বা কিছুটা বিক্রি করে দেয়, অথবা তাদের ধানী জমি বন্ধক রাখে।[৫৫]

দুর্ভিক্ষের সময়ে ধানী জমির অধিকারী এমন ৬৫ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ২·৬ লক্ষ পরিবার জমিতে তাদের সমস্ত অধিকার হারিয়ে ফেলে এবং পুরোপুরি দিনমজুরে পরিণত হয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে যে মোট ৭·১ লক্ষ একর ধানী জমি বিক্রি হয়, তার মধ্যে মাত্র ২·৯ লক্ষ একর পুনরায় গ্রামের লোকেরাই ক্রয় করে নেয়। সুতরাং প্রায় ৪·২ লক্ষ একর ধানী জমি গ্রামের বাইরের লোকের হাতে চলে যায়। সম্ভবতঃ তারা শহরের অ-কৃষিজীবী শ্রেণী।[৫৬] ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জমি হস্তান্তরের দলিলের সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষের ওপর। জমি হস্তান্তরের এই ভয়াবহ-রূপ দেখে সরকারও খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়। তাই এই হস্তান্তরিত জমি সম্পর্কে প্রথমে অর্ডিন্যান্স ও পরে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় জমি

হস্তান্তর আইন (অস্থায়ী বিধান) তৈরি করা হয়। কিন্তু এই আইনের বিধানগুলি এত ত্রুটিপূর্ণ ছিল ও সরকারী উদ্যোগের এত অভাব ছিল যে এই আইনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।[৫৭]

দুর্ভিক্ষের সময়ে গ্রাম বাংলায় প্রায় ৭ লক্ষ পরিবারের আয় হ্রাস পাওয়ায় আর্থিক দিক থেকে তাদের অবস্থা আরও নীচে নেমে যায়। যদি প্রতি পরিবারে গড়পড়তা ৫.৪ জন ব্যক্তি ধরা যায় তাহলে যারা আর্থিক দুরবস্থায় পতিত হয় তাদের সর্বমোট সংখ্যা হয় ৩৮ লক্ষ। এই দুর্ভিক্ষে যারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা হল, গ্রামের গরীব কৃষক, দিনমজুর, কারিগর ও জেলে প্রভৃতি।[৫৮]

এই দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মানুষ দুঃস্থ হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাসের সময় বাংলাদেশে দুঃস্থ মানুষের সংখ্যার হার (rate of destitution. যারা অন্যের বদান্যতার ওপর নির্ভরশীল ছিল তাদের এখানে দুঃস্থ বলা হচ্ছে) ছিল ১.০৭%। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে দুঃস্থদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। যদি এই সংখ্যা অব্যাহত আছে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে গ্রামের ৫৫.২ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে ৬.০ লক্ষ দুঃস্থ ছিল বলা যায়। কিন্তু একটি সমীক্ষায় জানা যায়, এই সময়ে ৭.৫ লক্ষ দুঃস্থ ছিল। অর্থাৎ ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের সুরুতে ১.৫ লক্ষ দুঃস্থ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জানুয়ারী ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে আরও ৩.৩ লক্ষ দুঃস্থ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ মোট দুঃস্থ ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১০.৮ লক্ষ। এই সংখ্যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলাদেশে ৪.৮ লক্ষ ব্যক্তি দুঃস্থ হয়।[৫৯] বলা বাহুল্য, এই দুর্ভিক্ষের ফলে দরিদ্র ব্যক্তিরাই নিঃস্ব ও দুঃস্থ হয়। দুর্ভিক্ষের আঘাত এই দরিদ্র শ্রেণীর ওপরই পড়ে। যাদের জমিজমা ও অন্য সম্পদ ছিল, সেই ধরণের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আর উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা শুধু দুর্ভিক্ষের ছোঁয়াচ থেকে মুক্তই থাকেনি; তারা এই সময়ে আরও বিত্তশালী হয়।[৬০] পীপলস্ রিলিফ কমিটির বিবরণ

থেকে জানা যায়, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর নিঃস্বম্বল অবস্থায় পতিত হয় ২৭ লক্ষ ক্ষেতমজুর, ১৫ লক্ষ গরীব কৃষক, ১৫ লক্ষ কারিগর এবং ২৫০০০ স্কুলের শিক্ষক।[৬১] ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, অন্ততঃ ৩৬ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের কবলে প্রাণ হারায়।[৬২]

(ঙ) আত্মপ্রতিষ্ঠায় উন্মুখ মুসলিম সমাজ—উপরে বর্ণিত তথ্য থেকে বিংশ শতাব্দীর গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের একটি ছবি পাওয়া যায়। এই পটভূমিতে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানের প্রসার এবং তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি বিশ্লেষণ করলে বাঙালী জীবনে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রভাব অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে কিছু কিছু বড় ও ছোট মুসলিম জমিদারদের জমি-জমা তাঁদের অপদার্থতার জন্য তাঁদের জমিদারীর হিন্দু আমলাদের হাতে চলে যায়। ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম জমিদারদের স্থলে হিন্দুরা জমিজমার মালিক হচ্ছে—এই বিষয়ের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকজন মুসলিম লেখক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর সুরুতে জমি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে জমিতে হিন্দুদের মালিকানা স্বত্ত্ব বৃদ্ধি পেলেও স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে পূর্ববঙ্গের কৃষি অর্থনীতিতে অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দুর তুলনায় শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানের সংখ্যা খুবই অল্প হলেও তাঁদের সুস্পষ্ট অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। তাঁরা অনেকটা সংগঠিত হয়ে নিজেদের দাবি-দাওয়া প্রকাশ করতে থাকেন। এই সময় থেকেই আরও বেশী করে বিত্তের অধিকারী মুসলমানেরা জমি-জমায় টাকা লগ্নী করে নিজেদের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হন। যেহেতু পূর্ববঙ্গ পাট চাষের ও পাটের বাজারের প্রধান কেন্দ্র ছিল, সেজন্য রপ্তানী দ্রব্য হিসেবে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি

পাওয়ায় এই পাট চাষ ও ব্যবসাকে ভিত্তি করে এক শ্রেণীর সম্পন্ন মুসলিম কৃষক ও ব্যবসায়ীর আবির্ভাব হয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অত্যধিক রপ্তানীতে ভারতের প্রভূত লাভ হয়। এই লাভের একটি অংশ সম্পন্ন মুসলিম কৃষক ও ব্যবসায়ীর পকেটেও যায়।[৮৩] মুসলিম সমাজে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ও তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হলে বাংলা দেশের কৃষি অর্থনীতির প্রধান তিনটি স্তরের কথা মনে রাখতে হয়, যথা—(১) ১৯০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ; (২) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ; (৩) ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ের মধ্যে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলিম শ্রেণীর প্রসারণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। সরকারী চাকরি, ওকালতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জমি-জমায় অর্থলগ্নীর মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রসারণ হয়। মুসলিম জমিদার, জোতদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের ও মহাজনদের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় কম হলেও, জমি হস্তান্তরের ফলে অপেক্ষাকৃত অর্থবান মুসলমানেরা জমিতে বিভিন্ন মালিকানা স্বত্ব অর্জনে সক্ষম হন। এই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার্থে 'মুসলিম চেম্বার অব কমার্স' এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এইভাবে মুসলিম সমাজের একটি বিশেষ প্রভাবশালী অংশ জমি-জমার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করেন। আর তার ফলেই গ্রাম বাংলায় ও মফস্বল শহরে বসবাসকারী বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মধ্যস্বত্বভোগী মুসলমানদের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাঁরা দেখতে পান, সরকারী চাকরি, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দুরা। আর যেহেতু হিন্দু জমিদার ও জোতদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যাই ছিল

বেশী এবং যেহেতু মুসলিম কৃষকেরাই সংখ্যায় বেশী ছিল, সেজন্য গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক সমস্যা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে মিশে থাকে। স্বভাবতই যখন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন তাঁদের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুদের বিরুদ্ধে, তখন তাঁরা সহজেই গ্রামের সাধারণ মুসলমানদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। গ্রাম বাংলায় মূল বিরোধ ছিল দুটো শ্রেণীর মধ্যে—হিন্দু জমিদার-জোতদার-মহাজন প্রভৃতি একদিকে, আর অন্যদিকে মুসলিম কৃষক। গোটা বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার কথা সামগ্রিকভাবে মনে রাখলে এই চিত্রই আমরা পাই। যদিও অঞ্চল বিশেষে এর তারতম্যও লক্ষ্য করা যায়। যেমন কোথাও হয়তো মুসলিম জমিদার-জোতদার-মহাজন একদিকে, আর অন্যদিকে মুসলিম কৃষক অথবা তপশীলী কৃষক, অথবা কোথাও হয়তো হিন্দু জমিদার-জোতদার-মহাজন একদিকে, আর অন্য-দিকে তপশীলী কৃষক ; অথবা কোথাও মুসলিম-তপশীলী কৃষক একই স্থানে রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে সাহা সম্প্রদায়ভুক্ত মহাজনদের বিশেষ প্রভাব ছিল। তাছাড়া নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আরও কয়েকটি অংশ মহাজনরূপে গ্রামবাংলায় প্রভাব বিস্তার করে। স্বভাবতই এইসব মহাজনদের সঙ্গেও কৃষকদের বিরোধ ছিল। এইসব অঞ্চলগত পার্থক্যের ও বিরোধের কথা মনে রেখেও প্রধান বিরোধের ক্ষেত্রটি এখানে আলোচনা করা হল।[৬৪] কৃষকের অপরিসীম দারিদ্র্য ও অনুন্নত চেতনার কথা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে অর্থনৈতিক নিপীড়ন সত্বেও কেন কৃষকদের ওপর উচ্চ ও মধ্যবিত্তের প্রভাব বজায় থাকে তা বোঝা সহজ হবে। অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কারণেই বাংলাদেশের অগণিত কৃষকের পক্ষে শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উর্ধে ওঠে নিজস্ব শ্রেণী সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা ও চেতনার মান উন্নয়নে

কৃষক সভা সচেষ্ট হলেও, এই সংগঠন গ্রাম বাংলার ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রভাব হ্রাস করতে বিশেষ সক্ষম হয়নি।[৬৫] উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে যেভাবে ভূমি ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে ও ইংরেজ শাসনের ফলে নতুন শ্রেণীবিন্যাস গড়ে ওঠে বিচ্ছিন্নতাবাদের উপকরণসমূহকে পুষ্ট করে, তাকে প্রতিহত করার মত কোন শক্তিশালী সংগঠন ছিল না। তাই দেখি বিংশ শতাব্দীতে এই নতুন শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণী বৈষম্য গ্রাম বাংলায় দ্রুত অশান্তি ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। তেরোশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ এই পট-পরিবর্তনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়।[৬৬]

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রজা-লীগ মন্ত্রীসভার আমলে বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী আরও প্রসারিত ও সংহত হয়। সরকারী চাকরিতে ও অন্যান্য বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অর্থ, সম্পদ ও শিক্ষায় উন্নত মুসলমানেরা আরও বেশী আত্মসচেতন হন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় একটানা দীর্ঘকাল মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র পরিচালনা করায় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা দ্রুত সমগ্র পরিবেশকে নিজেদের অনুকূলে আনতে সক্ষম হন। কৃষকের দুর্দশা লাঘবে ভূমি ব্যবস্থার কোন আমুল পরিবর্তন না হওয়ার ফলে এই শ্রেণীর মুসলমানদের পক্ষে সমগ্র বাঙালী মুসলমানদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা এবং হিন্দুদের নিকট হতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে এক স্বাধীন মাতৃ-ভূমি প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়।[৬৭]

(৩) বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যা : হ্রাস-বৃদ্ধি :

(ক) মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি—আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলাদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টিতে পরিণত হওয়ায় তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীতেও মুসলিম

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকে। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পড়ে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে মুসলমান জনসমষ্টির সংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নরূপ ছিল :[৬৮]

মুসলমান, ১৮৮১-১৯৩১

প্রদেশ, ইত্যাদি	শতকরা ভিন্নতার মাত্রা (Variation%) ১৯২১-১৯৩১	শতকরা ভিন্নতার মাত্রা (Variation%) ১৮৮১-১৯৩১
ভারত—	+ ১৩.০	+ ৫৫.০
ব্রিটিশ প্রভিন্সেস—	+ ১২.৭	+ ৪৮.৫
আজমির-মারওয়াড়া—	− ৪.৬	+ ৬৮.০
আসাম—	+ ২৫.১	+ ১০৯.৩
বালুচিস্থান—	+ ১০.৪	—
বেঙ্গল—	+ ৯.১	+ ৪৬.৩
বিহার এবং ওড়িশা—	+ ১৫.৬	
বোম্বে—	+ ১৬.৭	+ ৪৭.৫
বার্মা—	+ ১৬.৮	+ ২৪৬.৩
সি. পি. এবং বেরার—	+ ২১.২	+ ৪৭.৪
কুর্গ—	+ ৫.৮	+ ৯.৯
মাদ্রাজ—	+ ১৬.৪	+ ৭১.০
দিল্লি—	+ ৪৬.০	+ ৪৯.৮
পাঞ্জাব—	+ ১৬.৫	
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—	+ ৮.০	
যুক্তপ্রদেশ—	+ ১০.৮	+ ২১.৩
ষ্টেটস এবং এজেন্সিস—	+ ১৪.৭	+ ১১৩.৪

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যা এইরূপ ছিল :[৬৯]

ব্রিটিশ জেলা	সমস্ত বয়সের (All Ages)	মোট সংখ্যার শতকরা হার (Percentage of total)	কেবলমাত্র বয়স্ক (কুড়ি বৎসর এবং তার ঊর্ধে)	মোট সংখ্যার শতকরা হার (Percentage of total)
বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা	৫০,১১৪,০০২	১০০	২৪,৮৭৩,৩০৯	১০০
মুসলমান	২৭,৪৯৭,৬২৪	৫৫	১২,৮৫৫,৪৭০	৫২
হিন্দু	২১,৫৭০,৪০৭	৪৩	১১,৫০৩,৬৬৮	৪৬

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির যে হিসেব পাওয়া যায় (Number per 10,000 of the population) তা হল :[৭০]

সম্প্রদায়	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১
হিন্দু	৪,১৫৫	৪,৩০৪	৪,৩২৭	৪,৪৮০	৪,৬৬০
মুসলমান	৫,৪৭৩	৫,৪৮৭	৫,৩৯৯	৫,২৭৪	৫,১৫৮
খ্রীষ্টান	২৮	৩৬	৩১	২৯	২৫
জৈন	২	২	৩	১	১
শিখ	৩	২	—	১	—

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার হিন্দু ও মুসলমান লোকসংখ্যার যে তালিকা প্রস্তুত করেন তা থেকে হিন্দু প্রধান ও মুসলিম প্রধান জেলাসমূহের লোকসংখ্যা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করা যায়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ যে টেবিল প্রস্তুত করেন, তা নিম্নে দেওয়া হল : [১১]

(ক) যে সমস্ত জেলায় হিন্দুর সংখ্যা বেশী :

জেলার নাম	লোকসংখ্যা (হাজার)	শতকরা কত জন		
		মুসলমান	হিন্দু	অন্যান্য
(১) বাঁকুড়া—	১২৯০	৪·৩	৮৩·৬	১২·১
(২) বীরভূম—	১০৪৮	২৭·৪	৬৫·৫	৭·১
(৩) বর্ধমান—	১৮৯১	১৭·৮	৭৩·৭	৮·৫
(৪) মেদিনীপুর--	৩১৯১	৭·৭	৮৪·১	৮·২
(৫) হাওড়া—	১৪৯০	১৯·৯	৭৯·৫	০·৬
(৬) হুগলী—	১৩৭৮	১৫·০	৭৯·৮	৫·২
(৭) ২৪ পরগণা--	৩৫৩৬	৩২·৫	৬৫·৩	২·২
(৮) কলিকাতা--	২১০৯	২৩·৬	৭২·৬	৩·৮
(৯) খুলনা—	১৯৪৩	৪৯·৪	৫০·৩	০·৩
(১০)জলপাইগুড়ি-	১০৯০	২৩·০	৫০·৬	২৬·৪

(খ) যে সমস্ত জেলায় মুসলমানের সংখ্যা বেশী ঃ

জেলার নাম	লোক সংখ্যা (হাজার)	শতকরা কতজন		
		মুসলমান	হিন্দু	অন্যান্য
(১) বাখরগঞ্জ	৩৫৪৯	৭২.৩	২৭.০	০.৭
(২) বগুড়া	১২৬০	৮৪.০	১৪.৮	১.২
(৩) চট্টগ্রাম	২১৫৩	৭৪.৬	২১.৩	৪.১
(৪) ঢাকা	৪২২২	৬৭.৩	৩২.২	০.৫
(৫) দিনাজপুর	১৯২৭	৫০.২	৪০.২	৯.৬
(৬) ফরিদপুর	২৮৮৯	৬৪.৮	৩৪.৮	০.৪
(৭) যশোহর	১৮২৮	৬০.২	৩৯.৪	০.৪
(৮) মালদহ	১২৩৩	৫৬.৮	৩৭.৮	৫.৪
(৯) মুর্শিদাবাদ	১৬৪১	৫৬.৬	৪১.৭	১.৭
(১০) ময়মনসিংহ	৬০২৪	৭৭.৪	২১.৫	১.১
(১১) নদীয়া	১৭৬০	৬১.২	৩৭.৪	১.৪
(১২) নোয়াখালী	২২১৭	৮১.৪	১৮.৬	০.০
(১৩) পাবনা	১৭০৫	৭৭.১	২২.৫	০.৪
(১৪) রাজসাহী	১৫৭২	৭৪.৬	২১.০	৪.৪
(১৫) রংপুর	২৮৭৮	৭১.৪	২৭.৯	০.৭
(১৬) ত্রিপুরা	৩৮৬০	৭৭.১	২২.৮	০.১

(গ) যে সমস্ত জেলায় অন্য সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশী :

জেলার নাম	লোক সংখ্যা (হাজার)	শতকরা কতজন		
		মুসলমান	হিন্দু	অন্যান্য
(১) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	২৪৭	২.৮	২.০	৯৫.২
(২) দার্জ্জিলিং	৩৭৬	২.৪	৪৭.৩	৫০.৩

(ঘ) আসামের একটি জেলার হিসেব :

জেলার নাম	লোকসংখ্যা (হাজার)	শতকরা কত জন		
		মুসলমান	হিন্দু	অন্যান্য
(১) শ্রীহট্ট	৩১১৭	৬০.৭	৩৬.৯	২.৪

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, কেবলমাত্র বাংলাদেশে নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও মুসলিম লোকসংখ্যার হার অনেকটা বৃদ্ধি পায় [৭২]

অবশ্য ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাসের যথার্থতা সম্পর্কে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন। নৃতত্ত্ববিদ তারকচন্দ্র দাস ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে যে তথ্যপূর্ণ সমীক্ষা করেন, তাতে তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লোকসংখ্যার হিসেব বিশ্লেষণ করে দেখান, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লোক-সংখ্যা হঠাৎ এতটা বৃদ্ধি পায় যে, এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া যায় না। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ

পর্যন্ত বাংলাদেশে লোকসংখ্যা পরিবর্তনের পরিমাণ (দেশীয় রাজ্য বাদ দিয়ে) এখানে উল্লেখ করা হল ঃ [৭৩]

বছর	প্রকৃত লোক সংখ্যা	পরিবর্তন	শতকরা পরিবর্তন	পরিবর্তনের সময়
১৮৯১	৩৯,০৯৭,০২৩			
১৯০১	৪২,১৪৯,১৫৪	+ ৩,০৫২,১৩১	+ ৭·৮	১৮৯১ থেকে ১৯০১
১৯১১	৪৫,৪৯১,০৫৬	+ ৩,৩৪১,৯০২	+ ৮·০	১৯০১ থেকে ১৯১১
১৯২১	৪৬,৭০৩,৭০২	+ ১,২১২,৬৪৬	+ ২·৮	১৯১১ থেকে ১৯২১
১৯৩১	৫০,১১৫,৫৪৮	+ ৩,৪১১,৮৪৬	+ ৭·৩	১৯২১ থেকে ১৯৩১
১৯৪১	৬০,৩০৬,৫২৫	+১০,১৯০,৯৭৭	+২০·৩	১৯৩১ থেকে ১৯৪১
		মোট = +২১,২০৯,৫০১	+৪৩·১	১৮৯১ থেকে ১৯৪১

এই হিসেব থেকে দেখা যায়, ১৯৩১-১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার হল ২০·৩। অথচ ১৮৯১-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা বৃদ্ধির হার ৭·৮, ১৯০১-১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ৮·০, ১৯১১-১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ২·৮ এবং ১৯২১-১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৭·৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ও ব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ফলে ১৯১১-১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার হঠাৎ এতটা হ্রাস পায়। এই তথ্য পরিবেশন করে তারকচন্দ্র দাস মন্তব্য করেন, ১৯৩১-১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার রাজনৈতিক কারণ ছাড়া অন্য কোনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে হিন্দুরা ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস বয়কট করেন। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাসের সময় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে নিজ নিজ

সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশী করে দেখান। সুতরাং বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের লোকসংখ্যার হিসেব ব্যবহার করা মোটেই নিরাপদ নয়।[৭৪] অবশ্য লোকসংখ্যার হিসেব নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ আরও জোরের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেন।

(খ) বাঙালী হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়া—মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টিতে পরিণত হওয়ায়, হিন্দুদের মনে এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কংগ্রেসের গোঁড়া-পন্থী হিন্দুমহল, হিন্দু মহাসভা, কয়েকটি হিন্দু ধর্ম রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান (মাতৃসদন, হিন্দু মিশন ইত্যাদি) প্রভৃতি খুবই উদ্বিগ্ন হয়। এই সময়ে সাম্প্রদায়িক ও বৈজ্ঞানিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্নটি আলোচিত হয়। অনেক তথ্যের সাহায্যে যতীন্দ্রমোহন দত্ত যেভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন তাতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যক্ত হয়। স্বাভাবিক কারণেই যে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তা তিনি মানতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অন্ততঃ ৩,৪৯৯ জন হিন্দু নারী অপহৃত হয়। এই সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত দোষী ব্যক্তিদের তিন-চতুর্থাংশ ছিল মুসলিম, আর বাদ-বাকী দোষীরা ছিল হিন্দু। হিন্দু সমাজের কঠিন নিয়মের ফলে এইসব অপহৃতা নারীর পক্ষে হিন্দু সমাজে ফিরে আসার কোণই সম্ভাবনা না থাকায় তারা মুসলমান হয়। এই পাঁচ বছরের অপহৃতা নারীর সংখ্যা থেকে যতীন্দ্রমোহন দত্ত সিদ্ধান্ত করেন, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতি বছর গড়পড়তা ৭০০ জন হিন্দু নারী অপহৃত হয় ও তারা মুসলমান হয়। আর এইসব নারী যেহেতু অল্পবয়স্ক ছিল, সেজন্য যতীন্দ্রমোহন দত্ত তাদের বয়স ও প্রজনন ক্ষমতা অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে দেখান, কি পরিমাণে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পায় ও মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। হিন্দু নারী অপহরণের সমস্যা

হিন্দু সমাজকে কতটা উদ্বিগ্ন করে তোলে এবং মুসলমানদের প্রতি কি ধরণের বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে, তার বিশদ বিবরণ হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়।[৭৫]

অন্যদিকে এস. জি. পানানডিকার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণভিন্ন দৃষ্টিকোণথেকে বিষয়টি আলোচনা করেন। কিভাবে স্বাভাবিক কারণে বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তার এক সুচিন্তিত আলোচনা পানানডিকারের গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি লেখেন, ধর্মান্তকরণের ফলে মুসলিম লোকসংখ্যার হার সামান্যই বৃদ্ধি পায়। তাঁর মতে, যেসব কারণে হিন্দুদের তুলনায় মুসলিম লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তা হল : প্রথমতঃ হিন্দু সমাজের তুলনায় মুসলিম সমাজে বাল্য-বিবাহের প্রচলন কম হওয়ায় মুসলমান মহিলাদের সন্তান ধারণের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে। তৃতীয়তঃ মুসলিম সমাজে হিন্দুদের মত কঠোর জাতিভেদ প্রথা না থাকায় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অনেক কম। চতুর্থতঃ মুসলমানদের খাদ্য তালিকা হিন্দুদের চেয়ে পুষ্টিকর। মুসলমানেরা নিয়মিত মাংস ও ডিম আহার করায় হিন্দুদের চেয়ে তাঁদের প্রজনন ক্ষমতা অনেক বেশী। পঞ্চমতঃ স্পেন্সারের তত্ত্ব অনুযায়ী নিম্নস্তরের প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা উচ্চস্তরের প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশী। পূর্ববঙ্গের নদীবহুল অঞ্চলের মুসলমানেরা চিন্তার দিক থেকে হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশী পশ্চাৎপদ। সুতরাং এখানেও স্পেন্সারের তত্ত্ব প্রয়োগযোগ্য।[৭৬] রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মুসলমান লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করে বলেন : "প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিন্দু-মুসলমান সংখ্যার অসমতার প্রধান কারণ হইলেও হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ ক্ষয়ের কারণকেও উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।...বাংলার নিম্নজাতি সমুদয়েরই মত মুসলমানেরও প্রজননশক্তি প্রবল।...বাংলার মুসলমানেরা বেশীর ভাগই সমাজের নিম্নস্তরের সেই

আদিম বীর্য্যবান কর্ম্মঠ জাতি সমুদয় হইতে উদ্ভূত।”[৭৭] রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বাংলার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ও ব্রাহ্মণ সমাজের নানা ত্রুটির ফলে কিভাবে হিন্দুসমাজ বিশেষ করে উচ্চবর্ণসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তার এক সুন্দর ছবি তুলে ধরেন। তিনি লেখেন, আধুনিক যুগের কলকাতা নগরীর মত অতীত যুগেও বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে ক্রমান্বয়ে তাম্রলিপ্ত, গৌড়, চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম, হুগলি ও কাশিমবাজার গড়ে ওঠে। অনেকদিন পর্যন্ত হুগলি ও কাশিমবাজার বন্দর সপ্তগ্রামের স্থান দখল করতে পারেনি। পদ্মানদীর দ্রুত বৃদ্ধি ও পূর্বদিকে অভিযানের ফলে সরস্বতী নদীর পরে ভাগীরথীরও দ্রুত অধোগতি দেখা দেয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে একই সঙ্গে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক বিপ্লব ঘটায় বাঙালীর জীবনে এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর নদী তার পুরাতন গতিধারা পরিবর্তন করার ফলে ভাগীরথীর অধোগতি আরও দ্রুত সম্পন্ন হয়। তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই মধ্যবঙ্গের সমস্ত নদী, যথা ভৈরব, জলঙ্গী, মাথা-ভাঙ্গা ইত্যাদিরও অধোগতি হয়। এইসব নদী বর্ষাকাল ছাড়া অন্যান্য ঋতুতে যাতায়াতের অনুপযোগী হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত চতুর্দ্দিকে নদী বেষ্টিত কাশিমবাজার দ্বীপ একটি বিখ্যাত তন্তুবয়নের কেন্দ্র ছিল। তাছাড়া এই বন্দর ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্য উদ্ধারের স্থানও ছিল। এখানে ও নিকটবর্তী ভাগীরথীকূলে ইউরোপীয়রা কারখানাও গড়ে তোলে। আর এখান থেকেই রেশম দ্রব্য ও নানা প্রকার সুতীবস্ত্র এশিয়া ও ইউরোপে রপ্তানী করা হত। এইভাবেই কাশিমবাজার দ্বীপ একটি সমৃদ্ধিশালী ও স্বাস্থ্যপ্রদ নগরীতে পরিণত হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে নদী মজে যাওয়ায় এই নগরী ক্রমান্বয়ে জীর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।[৭৮]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া রোগ

দেখা দেয়। যশোহর জেলা জীর্ণ নদীসমূহের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় এখানেই ম্যালেরিয়া মহামারী আকার ধারণ করে ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে বর্ধমান ও হুগলি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে ওখানকার অসংখ্য গ্রাম উজাড় করে দেয়। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের যখন এই অবস্থা তখন উত্তর ও পূর্ববঙ্গে অনেক নতুন নদী প্রবাহিত হয়ে সমতল ক্ষেত্রকে নতুন করে গড়ে তোলে। জলপ্লাবন ও ভূমিকম্পের ফলে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মপুত্র নদী ময়মনসিংহ জেলা ছেড়ে যমুনার খাতে প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে কীর্ত্তিনাশা ও নায়াভাঙ্গিনী নামক দুইটি নদী বিক্রম-পুরের পুরাতন রাজধানী, মন্দির ও প্রাসাদ ধ্বংস করে পলিমাটির সাহায্যে নতুন গ্রাম ও নগরীর পত্তন করে, আর কৃষির শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধি করে।[৭২]

গাঙ্গেয় ভূমির প্রাকৃতিক বিপর্যয় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, হিমালয়ের সানুদেশে যেখানে গঙ্গার উপনদনদীসমূহ প্রবাহিত সেখানে যুগে যুগে বহু সমৃদ্ধিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু নদীগুলির গতিধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব অঞ্চলের জনপদের অনেক বিপর্যয় ঘটে। "হিমালয়ের ক্রোড়ে বৃষ্টিপাতের প্রাবল্য, জলপ্লাবন, ম্যালেরিয়া, জলাভূমি ও জঙ্গলের আকস্মিক প্রসারণ, ভূমিকম্পহেতু হঠাৎ ভূমির সমতলতার পরিবর্তন এবং প্রধানতঃ নদীর বন্যা ও গতি-বিপর্যয়" ইত্যাদির ফলে বহুজনপদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইভাবে "গঙ্গার ব-প্রদেশের নদী ও তাহার শাখাপ্রশাখাগুলির গতির হ্রাস ও বৃদ্ধি বাঙ্গলার ভবিষ্যৎকে" আশঙ্কাময় ও অনিশ্চিত করে তোলে। কেন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গ কৃষি ও লোকসংখ্যা হিসেবে উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের তুলনায় ক্ষয়িষ্ণু হল তা গঙ্গার পূর্বদিকে অভিযান ও মধ্যবঙ্গের নদীসমূহের বিনাশের ফল পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। নদী মজে যাওয়ায় ও জলনিকাশের পথ নষ্ট হওয়ায় বাংলাদেশের এক বৃহৎ অঞ্চলে স্বাস্থ্যের ও কৃষির দুর্দশা প্রকট হয়ে ওঠে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় হিসেব করে দেখান, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ

পর্যন্ত মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গে কর্ষিত জমির পরিমাণ হুগলিতে হ্রাস পায় শতকরা ৪৫, বর্ধমানে ৪০, যশোহরে ৩১, মুর্শিদাবাদে ১৪ ও নদীয়ায় ৭ ভাগ। অন্যদিকে "পূর্ব্ববঙ্গে ব-প্রদেশের যে সকল অংশে নদী জীবন্ত ও সমস্ত অঞ্চলকে নিয়মিতভাবে জলপ্লাবনের দ্বারা সমৃদ্ধ করে, সেখানে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ খুব দ্রুত" বৃদ্ধি পায়। এই ত্রিশ বছরে ঢাকা ও ময়মনসিংহে কর্ষিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শতকরা ২৮, বাখরগঞ্জে ২৭ ও ফরিদপুরে ২১ ভাগ। যেসব স্থানে রাস্তা ও রেলপথ জলনিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি এবং যেসব স্থানে অবাধে জলপ্লাবন হয়, সেসব স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম। এই কারণেই পূর্ববঙ্গের জেলাসমূহে ত্রিশ বছরে লোকসংখ্যা শতকরা ২০ হতে ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, আর অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু ব-প্রদেশের জেলা সমূহে লোকসংখ্যা হ্রাস পায় অথবা তার বৃদ্ধির মাত্রাও খুবই অল্প।[৮০]

প্রাচীন জনপদের ক্ষয় ও নতুন জনপদ গঠনের ক্রিয়াটি লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয়ও অনুধাবন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের যেসব প্রাচীন জনপদ বিলুপ্ত হয় অথবা যে অংশ ক্ষয়িষ্ণু হয় সেখানে যেমন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল, তেমনি এইসব স্থানেই হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের প্রাধান্য ছিল। অন্যদিকে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির বেশীরভাগ স্থানেই অনুন্নত হিন্দু বর্ণের অধিবাসী ও মুসলমানদের প্রাধান্য বিদ্যমান। প্রাচীন জনপদের বিলোপ ও উচ্চবর্ণ হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস, আর মুসলমান সম্প্রদায় ও অনুন্নত হিন্দুবর্ণের উত্তরোত্তর সংখ্যাবৃদ্ধি সমগ্র বাংলাদেশের কৃষ্টিকে রূপান্তরিত করে। লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি একটা জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারাকে কতটা পরিবর্তিত করতে পারে বাংলাদেশের ইতিহাস তারই এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লেখেন, "ব্রাহ্মণ্য সমাজের জাতিভেদ, বংশভেদ, বিবাহের অতি সংকীর্ণ গণ্ডী স্থাপন, বিধবা বিবাহ নিষেধ, পণপ্রথা ও আরও অনেক সামাজিক বিধি-নিষেধের" ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের অনুপাতে খুবই হ্রাস পায়। তিনি লেখেন ঃ "প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের স্ত্রী-সংখ্যা ৮৪৭ ও ৯০১ এবং ইহাদের বিধবার সংখ্যা ২০০। কিন্তু মাহিষ্য, মুসলমান ও নমঃশূদ্রের স্ত্রী-সংখ্যা ক্রমান্বয়ে ৯৫২, ৯৫৮ ও ৯৬৪। ১৮৮১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত, এই পঞ্চাশ বৎসরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রত্যেকের সংখ্যা ১০ লক্ষ হইতে প্রায় ১৫ লক্ষ হইয়াছে; কিন্তু মাহিষ্যের সংখ্যা হইয়াছে ২০ লক্ষ হইতে ২৪ লক্ষ, নমঃশূদ্রের ১৬ লক্ষ হইতে ২১ লক্ষ, রাজবংশীর ৯ লক্ষ হইতে ১৮ লক্ষ।" তাছাড়াও আরও অনেক অনুন্নত সম্প্রদায় আছে যারা "উচ্চজাতির অনুশাসনে অপাংক্তেয় ও অস্পৃশ্য।"[৮১]

বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান এবং হিন্দু-সমাজের উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে বিরোধের ফলে যে বিদ্বেষের মনোভাব দেখা দিয়েছে তা দূর করে এক সুস্থ-সবল বাঙালী জাতি গঠনের কথাও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেন। তিনি বলেন, যদি বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদানের সহজ পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়, হিন্দু-সমাজের বৈবাহিক সম্বন্ধ গণ্ডীর প্রসারণ হয় এবং পল্লীসমাজে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অন্তর্বিবাহ যদি ধর্মান্তর গ্রহণ-সাপেক্ষ না হয়, তাহলে সামাজিক শান্তি ও সদ্ভাবের সৃষ্টি হবে। এই পথেই বাংলাদেশের "ঘোর কলঙ্ক নারীহরণের প্রতিরোধ" করা যায়, আর "সামাজিক শীলতা ও সদ্ভাবও রক্ষা পায়"। তিনি মন্তব্য করেন ঃ "ঘরে ঘরে উদারতর পারিবারিক নীতি ও অভিনব সামাজিক আচার-ব্যবহার অবিলম্বে গ্রহণ করিতে না পারিলে বাঙ্গলার ১ কোটী ৫০ লক্ষ অবনত ও পতিত জাতি বাঙ্গলার কৃষ্টিকে নীচের দিকে টানিয়া অতলে ডুবাইয়া দিবে।"[৮২] ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বাংলাদেশের হিন্দু বর্ণের হ্রাসের কারণ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, বিধবা বিবাহের অপ্রচলন ও অত্যধিক কন্যাপণ হিন্দুবর্ণ হ্রাসের অন্যতম কারণ।[৮৩]

যাঁরা শুধু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করেন; তাঁরা পূর্ববঙ্গে নিম্নবর্ণ হিন্দুদের প্রতি উচ্চবর্ণ হিন্দুদের অসঙ্গত আচরণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করেন না। বিভিন্ন সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে অনুন্নত বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা অনেক ছিল। অথচ হিন্দু সমাজের একমাত্র নিয়ামক ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। তাঁদের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পীড়নের ফলে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অনেক অনুন্নত বর্ণের হিন্দু ইসলাম অথবা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশেও এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[৮৪]

অন্যদিকে কয়েকজন মুসলিম লেখক সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে হিন্দু লেখকদের বক্তব্য খণ্ডন করে লোকসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনা করেন। এই বিষয়ে মোহাম্মদ আকরম খাঁ 'মোহাম্মদী' মাসিক পত্রে নিয়মিত লেখনী চালনা করেন।[৮৫]

লোকসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়টি সামগ্রিকভাবে ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে বিশ্লেষণ না করলে আলোচনা যথার্থ হয়না। নিঃসন্দেহে নারীনিগ্রহের বিষয়টি সামাজিক ক্রাইমের অন্তর্ভুক্ত। আর তার জন্য অন্য কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে অভিযুক্ত করা যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে লোকসংখ্যার বিষয়টি দীর্ঘকাল ধরে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার ফলে মূল অর্থনৈতিক-সামাজিক সমস্যা থেকে চিন্তাকে একটি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পথে পরিচালিত করা হয়। আর তার ফলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের ধর্ম বিপন্ন, এই জিগির তুলে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগ্রত করা হয়। এইসব কারণে, নানাজাতির সংমিশ্রণে, একই জল-বায়ুতে বসবাস করায় কতগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঙালী জাতির উদ্ভব সম্পর্কে যেসব বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সূত্রপাত হয় তার বিশেষ কোন প্রভাব সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পড়েনি।

(৪) মুসলিম সমাজে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবঃ

(ক) শিক্ষার প্রসার—সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর সুরুতে মুসলিম সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খুবই অনগ্রসর ছিল। সরকারী সূত্র থেকে ১৯১৯-১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৯-১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, প্রাইমারী স্তরে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হলেও, উচ্চ ও মধ্য স্তরে বিশেষ কোন অগ্রগতি হয়নি। এইসব স্তরে হিন্দু ছাত্ররাই প্রধান অংশ ছিল। মুসলমানদের মধ্যে মক্তবের ও মাদ্রাসার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাইমারী স্তরে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পায়। ১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের শিক্ষা সম্পর্কে মিঃ হর্ণেল যে রিপোর্ট দেন তাতে দেখা যায়ঃ

	ছাত্রসংখ্যা	
	কলেজ	প্রাইমারী স্কুল
হিন্দু—	১৮,৭৪৫	৫,৩২,১০৪
মুসলমান—	২,৩৩২	৫,৯৮,৫০৭

এই সময়ে কলেজ থেকে প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত মুসলমান ছাত্রদের শতকরা আনুপাতিক সংখ্যা ছিল নিম্নরূপঃ আর্টস কলেজে বৃদ্ধি পায় ১০% থেকে ১০·৮%; প্রফেসনাল কলেজে একই রকম থাকে অর্থাৎ ৮%; হাইস্কুলে ২০·১% থেকে অল্প পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২০·০৯%; মিডল স্কুলে ৩১·১% থেকে ৩০·৫% হ্রাস পায়; প্রাইমারী স্কুলে ৫১·৪% থেকে ৫২·৬% বৃদ্ধি পায় এবং স্পেশ্যাল স্কুলে ৬৪·৬% থেকে ৬৪·৯% হয়। প্রাইমারী স্কুলে মুসলিম ছাত্রদের আনুপাতিক সংখ্যা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হয়। এমন কি মুসলিম মেয়েদের মধ্যেও একই সময়ে শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। যেসব ছাত্র-ছাত্রী একই বিদ্যালয়ে (Mixed Schools)

অধ্যয়ন করে তাদের সংখ্যা ৩,০৭,৭৭৩ থেকে ৩২৩,৯৯২ বৃদ্ধি পায়। এরমধ্যে ১৪৯,০৮৮ হিন্দু; ১৬৬,৮৪৩ মুসলিম এবং ৮,০৬১ অন্যান্য সম্প্রদায়ের। লক্ষণীয় এই যে, হিন্দু মেয়েদের সংখ্যা ২২৯ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে মুসলিম মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৫,৭৫৯।[৮৬]

সরকারী সূত্র থেকে জানা যায়, ১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে আর্টস ও প্রফেসনাল কলেজে মুসলিম ছাত্রদের আনুপাতিক হার একই রকম থাকে, হাই ও মিডল স্তরে হ্রাস পায় এবং প্রাইমারী ও স্পেশ্যাল স্কুলে খুবই বৃদ্ধি পায়। দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে জীবন সুরু করার পক্ষে মোটেই সহায়ক নয় এমন একটা আশঙ্কাও যুক্ত হওয়ায় হাই ও মিডল স্কুলে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পায়। অন্যদিকে মক্তব ও মাদ্রাসার সংস্কারের ফলে মাদ্রাসা মুসলিম সমাজে সমাদৃত হওয়ায় প্রাইমারী ও স্পেশ্যাল স্কুলে মুসলিম ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এমন কি এই সময়ে সরকারী মাদ্রাসার ছাত্রদের বেতনও বৃদ্ধি করা হয়। তাছাড়া প্রাইমারী স্কুলের ধাঁচে মক্তবের পাঠ্যসূচী ঢেলে সাজানোর কথাও সরকার চিন্তা করে। এই সময়ে ঢাকার ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী বোর্ড পরিচালিত ইসলামিক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ৭৪ জন ও ইসলামিক ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষায় ১৮ জন পাশ করেন।[৮৭]

আর একটি সরকারী সূত্র থেকে ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়ে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র সংখ্যা যথাক্রমে ৭১৩,৪৪৭ হিন্দু এবং ৮৬৩,৫৯৩ মুসলিম ছিল। বিভিন্ন রকমের বালিকা বিদ্যালয়ও বৃদ্ধি পায়। তাতে শতকরা হিন্দু মেয়ে বৃদ্ধি পায় ২·৩%, আর মুসলিম মেয়ে ৩·৫%। ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১,৩০৪,৩৭৬ থেকে ১,৩৪৪.৯৪৫। সমস্ত ছাত্রদের তুলনায় মুসলিম ছাত্রদের শতকরা আনুপাতিক সংখ্যা ছিল ৫০·২%। তারমধ্যে আর্টস ও প্রফেসনাল কলেজে যথাক্রমে মুসলিম ছাত্র ছিল

মাত্র ১৩.৮% এবং ১৬.৮%; হাই ও মিডল স্কুলে যথাক্রমে মুসলিম ছাত্র ছিল ১৬.৬% এবং ২২.২%, এবং প্রাইমারী স্কুলে মুসলিম ছাত্র ছিল ৫২.৫% ও অন্যান্য স্পেশ্যাল স্কুলে ৭৩.০%।[৮৮] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদের তুলনায় মুসলিম ছাত্রদের সংখ্যা এখানে উল্লেখ করা হল।

১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা একই রকম ছিল, অর্থাৎ ৩টি। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২৯, আর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে হয় ১৪৩। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় এইসব কলেজ থেকে ৬৬ ছাত্রের মধ্যে ৩৭ জন উত্তীর্ণ হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ৭৬৩ মাদ্রাসা ছিল, আর মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭৪,০৫২, এর মধ্যে ৬২৭ নতুন ধরনের মাদ্রাসা (অর্থাৎ এখানে পাঠ্যসূচী ও শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করা হয়েছে), আর বাদবাকী পুরানো ধাঁচের। এই সময়ে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় ৪০৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ২১৬ জন কৃতকার্য হন। জুনিয়ার মাদ্রাসা পরীক্ষায় ২,২৫৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১,৫৪৪ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হন। মুসলমান ছাত্রদের জন্য স্থাপিত মক্তব অথবা প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ২৪,১৮৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪,৩৯১ হয়। এইসব বিদ্যালয়ে পঠনরত মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৭৬৯, ৪১১ জন, তারমধ্যে মুসলিম বালক ছিল ৫৫৩,১৪৬ জন এবং মুসলিম বালিকা ছিল ২১৬,২৬৫, জন। বিভিন্ন স্কুলে ও কলেজে পঠনরত মুসলিম ছাত্রীদের মোট সংখ্যা ছিল ২৬৭,৯২৪ (১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৫৭,৮৩০), এর মধ্যে ২ জন ছিল আর্টস ও প্রফেসনাল কলেজে, ৫৮ জন হাই স্টেজে, ১৩১ জন মিডল স্টেজে এবং ২৬৭,৩৭৩ জন প্রাইমারী স্টেজে এবং ৩৬০ জন স্পেশ্যাল স্কুলে। প্রাইমারী স্টেজের মোট ২৬০,০০০ মুসলিম ছাত্রীদের মধ্যে কেবলমাত্র ৩,৫৯১ জন বালিকা (অর্থাৎ ১.৩%) পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছিল।[৮৯]

উপরে বর্ণিত ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যায়, মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার মুসলমানদের মধ্যে এক ধর্মীয় ও সামাজিক বোধ উন্মেষে বিশেষ সহায়ক হয়। গ্রামাঞ্চলে এর অপরিসীম প্রভাব পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে আবদুল লতিফ ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলিম পরিবার ও সমাজের স্বার্থে মাদ্রাসা শিক্ষার ভিত্তিকে সুদৃঢ় রেখে, একই সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে সরকারী চাকরি ইত্যাদি সংগ্রহ করে মুসলিম সমাজের পশ্চাৎপদ অবস্থা দূরীভূত করার চেষ্টা করেন। ইংরেজের আশ্রয়ে ও সাহায্যে নিজেদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য তাঁরা যতটা যত্নবান ছিলেন, ততটা তাঁরা জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনের জন্য তৎপর ছিলেন না। ধর্মের ক্ষেত্রে পরিবারিক-সামাজিক সংহতিকে বজায় রেখে, ইংরেজি শিখে সরকারী চাকরি নিয়ে ও বিভিন্ন পেশায় হিন্দুদের মত নিযুক্ত থেকে বাস্তব জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য।[২০] এই ধারাটিকে আশ্রয় করেই বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে সচেষ্ট হন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মিডল স্তর হতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেলেও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষার মূল কাঠামোটি নানা সংস্কার সত্বেও অপরিবর্তিতই থাকে। স্বভাবতই নবজাগ্রত শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসে ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে। আর তাই মুসলিম রাজনীতি ধর্মমিশ্রিত হয়। অবশ্য অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল, পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের পক্ষে এই সহজাত দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা সহজ ছিল না।

(খ) বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতির সপক্ষে তত্ত্বগত প্রচার—আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলিম লেখকদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশশতাব্দীর সুরুতেই দেখা দেয়। এই সময়ে মুসলমান লেখকদের প্রধান

অভিযোগ ছিল এই যে, এক শ্রেণীর হিন্দু লেখক মুসলমানদের ধর্ম, ইতিহাস ও সমাজের প্রতি কটাক্ষ করে, কলঙ্ক লেপন করে, শিক্ষিত হিন্দু সমাজের প্রতি মুসলমানদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করেন। তারফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য তাঁরা একথাও স্বীকার করেন, এক শ্রেণীর হিন্দু লেখক সাম্প্রদায়িক ঐক্য কামনা করেন। তাঁরা এই অভিযোগও করেন, সাহিত্য চর্চায় মুসলমানদের অংশ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু লেখকদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ হয়। কারণ হিন্দু লেখকেরা সংস্কৃত প্রভাবিত বিশুদ্ধ বাংলার সমর্থকরূপে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের বিরোধিতা করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শেখ আবদুস সোবহান লিখিত 'হিন্দু-মোসলমান' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর থেকে প্রায় প্রত্যেকটি মুসলিম পরিচালিত পত্রিকায় সাহিত্য ক্ষেত্রে হিন্দু লেখকদের মুসলিম বিদ্বেষকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা হয়। তখন থেকেই মুসলমান সাহিত্যিকদের আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল হয়ে ওঠে। বাংলা ১৩১০ সালের বৈশাখ মাসে (ইংরেজি ১৯০৩ খ্রী) প্রকাশিত 'নবনূর' নামক মাসিকপত্র উপরিউক্ত ধারাটিকে অনুসরণ করে। অবশ্য এই কাগজে উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির উদ্দেশ্যেও অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। হিন্দু-মুসলিম বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ এই কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হিন্দু লেখকদের মুসলিম বিদ্বেষ কি ধরণের ছিল তার অনেক পরিচয় 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহে পাওয়া যায়। "এই সময়ে 'ভারতী' কাগজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রচার করে," 'নবনূর' কাগজে তার তীব্র সমালোচনা করা হয়। ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়, সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সাধারণ হিন্দু লেখকেরা পর্যন্ত অযথা মুসলিম সমাজের নিন্দাবাদ করেন। আর হিন্দু ঐতিহাসিকেরা মুসলিম জাতির অপযশ প্রচার করে তাঁদের গ্রন্থের পাতা পূর্ণ করেন। এইসব বিষয়ের প্রতি 'হিন্দু ভ্রাতাদের' দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'নবনূর'

সম্পাদক মন্তব্য করেন ঃ "ইহাই কি হিন্দু-মুসলমানের শুভ সম্মিলন সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় ?"[২১]

সাম্প্রদায়িক অসদ্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করে কিছু সংখ্যক হিন্দু লেখক এইসব অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন। কোন কোন হিন্দু লেখকের রচনায় 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্য' বন্ধনের প্রয়াসও দেখা যায়। 'নবনূর' কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'সতী' নাটিকা ও ক্ষীরোদ প্রসাদের 'রঘুবীর' নাটকের মুসলিম প্রীতির পরিচয় উল্লেখ করা হয়।[২২] উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর সুরুতে কয়েকজন হিন্দু ঐতিহাসিক অনুভব করেন, পরস্পরের ইতিহাস অনুশীলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানকে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করা সম্ভব। তাঁরা মনে করেন, ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের দেশ এবং এই দেশের উন্নতির জন্য হিন্দু-মুসলিম সম্মিলন আবশ্যক। তাঁরা আশা করেন, হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় গৌরব সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতীতি জন্মালে সম্মিলনের পথ প্রশস্ত হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ও রামপ্রাণ গুপ্ত মোগল রাজত্বের ইতিহাস আলোচনা করেন। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম মাসিক কাগজে কয়েকটি প্রবন্ধে ধারাবাহিকভাবে মোগল রাজত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারপরে বাংলা ১৩০৭ সাল হতে কেদারপুর (টাঙ্গাইল) নিবাসী রামপ্রাণ গুপ্ত 'সাহিত্য', 'উৎসাহ', 'আরতি' ও 'বান্ধব' প্রভৃতি কাগজে বিশদভাবে মোগল রাজত্বের ইতিহাস লেখেন। বাংলা ৫ শ্রাবণ, ১৩১১ সালে কেদারপুর হতে এই সকল প্রবন্ধ পরিবর্ধিত ও সংশোধিত আকারে রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত 'মোগল বংশ' নামক বৃহৎ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ রচনায় তিনি হিন্দু-মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাহায্যলাভ করেন।[২৩]

এই ধারাটিকে স্বীকৃতি দিয়েও মুসলমান লেখকেরা অভিযোগ করেন, বেশীর ভাগ হিন্দু লেখক মুসলিম বিদ্বেষ থেকে মুক্ত নন। তাই জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু সমাজের সদিচ্ছা সম্পর্কে তাঁদের মনে

সন্দেহ ক্রমান্বয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। শিক্ষিত মুসলমানেরা হিন্দুদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গণ্য করায় তাঁরা সামগ্রিকভাবে ইংরেজের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হননি। তাই এই শতাব্দীর সুরুতে বাংলাদেশের অঙ্গচ্ছেদের সময়ে কয়েকজন মুসলিম লেখক বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত করলেও এবং ইংরেজের ভুমিকার সমালোচনা করলেও প্রায় গোটা শিক্ষিত মুসলিম সমাজ এই অঙ্গচ্ছেদকে তাঁদের পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে উন্নতির সহায়ক মনে করেন। তাই আমরা দেখতে পাই, ফজলুল হকের মত ব্যক্তিও বঙ্গবিভাগ সমর্থন করেন। ফজলুল হকের মনোভাব বিশ্লেষণ করলেই পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মুসলিম মানসের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।[24] খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে এই মনোভাবই লক্ষ্য করা যায়।[25]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্ত হবার সময়ে বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য চর্চা এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক জীবনে যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মনোভাব জাগ্রত হয় তার প্রভাব সাংস্কৃতিক জীবনেও পড়ে। বাংলা ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসে (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-মে) কলকাতাতে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' নামক ত্রৈমাসিক মুখপত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার সূত্রপাত বলা চলে। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' নামক সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সংগঠন থেকেই এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করা হয়। সমিতির সভাপতি ছিলেন মৌলবী আবদুল করীম, আর সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকাতেই কবি নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়।[26] বাংলা ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'সওগাত' নামে সচিত্র মাসিক পত্র কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৯২০ খ্রী) 'মোসলেম ভারত' নামক একখানি

প্রথম শ্রেণীর সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। অনেক প্রখ্যাত হিন্দু-মুসলিম লেখক এই কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার প্রথম পাতায় রবীন্দ্রনাথের লেখা হতে এই অংশ উদ্ধৃত করা হয়ঃ "মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটীকে বড় করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে।" এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই সম্পাদক মোজাম্মেল হক্ পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। ১৩২৮ সালেও 'মোসলেম ভারত' প্রকাশিত হয়। এই কাগজে নজরুলের অনেকগুলি কবিতা ছাপা হয়।[২৭] এই সময়েই নজরুলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখনও সাহিত্যের অঙ্গনে ভেদ-বুদ্ধি বিশেষ প্রবল হয়ে ওঠেনি। তবুও মুষ্টিমেয় মুসলমান লেখকেরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে একান্তভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা উপলব্ধি করেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিলুপ্ত না করেও, তাঁদের নিজস্ব একটি সাহিত্য সংগঠন থাকা উচিত। আর তাই 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' গঠিত হয়।[২৮] তখন যাঁরা সাহিত্য চর্চা করতেন তাঁদের অনেকেরই ধারণা ছিল, মুসলিম পরিচালিত সাহিত্য পত্র হিন্দুরা কিনবেন না। যাতে মুসলমানেরা অনুভব করতে পারেন যে, এই পত্রিকা হল তাঁদের পরিচালিত পত্রিকা, সেজন্য নামকরণও সেভাবে করা হয়। অবশ্য "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকাও সাম্প্রদায়িক কাগজ ছিল না, মোসলেম ভারতও নয়।"[২৯] 'মোসলেম ভারত' বেশীদিন চলেনি। এর মধ্যে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত 'সওগাত' মাসিক পত্র এখনও প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকার 'মহিলা সংখ্যা' উল্লেখযোগ্য। এখানে শুধু মুসলিম মহিলা লেখিকাদের লেখাই প্রকাশ হত না, সেই সঙ্গে প্রতিটি মহিলা লেখিকার ছবিও প্রকাশিত হত। আর কোন মুসলিম পরিচালিত কাগজে এই ধরনের প্রচেষ্টা দেখা যায় না। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে লেখার

আগ্রহ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার বিশেষ অবদান রয়েছে।[১০০]

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহ্মদ এর সম্পাদনায় ও ফজলুল হক সাহেবের পরিচালনায় 'নবযুগ' নামক একখানি সান্ধ্য দৈনিক কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এক সুস্থ জাতীয় চেতনা বিকাশে এই পত্রিকার অবদান অসামান্য। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 'নবযুগ' বন্ধ হয়ে যায়। পরে 'নবযুগ' আবার প্রকাশিত হলেও এই কাগজের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়।[১০১] ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় 'সেবক' নামক একখানি বাংলা দৈনিক কাগজ কলকাতা হতে প্রকাশিত হয়। এই কাগজ অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক ছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসে অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় 'সেবক' এর প্রভাবও হ্রাস পায়। কবি নজরুল ইসলামও এই কাগজে লেখেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে নজরুলের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই 'ধূমকেতু' কাগজেই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নজরুল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানান। বাংলাদেশে নজরুলই সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরেন। কিন্তু সরকারী রোষে 'ধূমকেতু'র আয়ু স্বল্প হয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর নজরুলের পরিচালনায় 'লাঙল' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই কাগজে নজরুলের কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা প্রকাশিত হয়।[১০২] কবি নজরুলের আবির্ভাবের পরে যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। হজরত মোহম্মদের, পারসিক কবি সাদীর, কামাল আতাতুর্কের, রবীন্দ্রনাথের, রোমাঁ রোলাঁর বাণী ও রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা 'বুদ্ধির মুক্তি' মন্ত্রে দীক্ষিত হন। কাজী আবদুল ওদুদ এর একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সংগঠনের বার্ষিক পত্র 'শিখা'

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আত্মপ্রকাশ করে এবং পাঁচ বছর প্রকাশিত হয়।[১০৩]

এইভাবে বাংলাদেশের মুসলমান লেখকদের এক ক্ষুদ্র অংশের প্রচেষ্টায় এক উদার-মানবিক ভাবধারার উন্মেষ ঘটে। কিন্তু এই ভাবধারাকে রক্ষণশীল মুসলমানেরা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা সাহিত্যের আঙিনায় 'বুদ্ধির মুক্তি'র মন্ত্রকে মুসলমান ধর্ম-বিরোধী প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করেন। মুসলমান সমাজে এই রক্ষণশীলতার প্রভাব এতটা ছিল যে, এর বিরুদ্ধে যুক্তিনিষ্ঠ মননের অধিকারী লেখকেরা বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। তাই কবি নজরুল ইসলামও এক বিতর্কিত ব্যক্তিতে পরিণত হন। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদলাভে ধন্য নজরুল সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করলেও, শিক্ষিত মুসলমানদের একটি অংশ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন। এমনকি স্বরাজ্য পার্টির প্রভাব বিস্তারের যুগেও এই কুণ্ঠাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল শিশির কুমার ভাদুড়ী কলকাতার ৯১ হ্যারিসন রোডের আলফ্রেড থিয়েটার হলে কবি নজরুলের সম্মানার্থে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সভাগৃহ শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক পরিপূর্ণ ছিল। এই সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সহ অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় কেউ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। কবিরূপে তার সাফল্যের ও দেশের জন্য তাঁর আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করে নজরুলকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই সভায় চিত্তরঞ্জন দাশও ভাষণ দেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, কবি নজরুল দেশের জন্য নিজের জীবন দান করবেন। এই সম্বর্ধনার উত্তরে কবি নজরুল এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন এবং কয়েকটি স্বরচিত গান পরিবেশন করেন। তাছাড়া তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'ও আবৃত্তি করে শোনান। সভাশেষে সাফল্যের সঙ্গে 'বসন্তলীলা' মঞ্চস্থ হয়।[১০৪] শিশির কুমার ভাদুড়ীর

পূর্বে আর কেউ নজরুলের সম্মানার্থে এই ধরনের কোন সভার আয়োজন করেছিলেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। পরবর্তীকালে বাংলা ১৩৩৬ সালে কবি নজরুলকে জাতীয় সম্বর্ধনা দেবার ব্যবস্থা হলে কলকাতাতে মুসলমান লেখকেরা পরস্পরবিরোধী দুটো অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েন। মোহাম্মদ আকরম খাঁ নজরুলকে সম্বর্ধনা দেবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি নজরুলকে মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে জাতীয় কবিরূপে বরণ করতে অসম্মত হন। 'সওগাত' কাগজের সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাহেব এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। বাংলা ১৩৩৪ সাল থেকে মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় কলকাতা থেকেমাসিক 'মোহাম্মদী' কাগজ প্রকাশিত হয়। আর এই বছরেই নজরুল 'সওগাত' কাগজে চাকরি নেন এবং ১৩৪০ সাল পর্যন্ত এখানে কাজ করেন। ১৩৩৩ সাল থেকে নজরুল 'সওগাত' কাগজে লিখতে সুরু করেন।[১০৫]

মাসিক 'মোহাম্মদী' প্রকাশিত হবার পর থেকে এই কাগজের মাধ্যমে স্বতন্ত্র বাঙালী মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতির সপক্ষে একটানা দীর্ঘকাল তত্ত্বগত প্রচার চালানো হয়। অসহযোগ আন্দোলনের পরে যখন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি হয় তখন এই তত্ত্বগত প্রচার সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে আরও পরিপুষ্ট করে তোলে। এই আন্দোলনের প্রধান তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন প্রখ্যাত লেখক মোহাম্মদ আকরম খাঁ। বাঙালী মুসলিম মানস বিশ্লেষণে মোহাম্মদ আকরম খাঁর রচনাবলীর গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর অসংখ্য রচনাবলীর মধ্যে নির্বাচিত কিছু প্রবন্ধ এখানে উল্লেখ করা হল: (১) 'গণিত ও গণতন্ত্র' (মোহাম্মদী, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম-৭ম সংখ্যা, ১৩৩৭ সাল); (২) 'মিশ্র ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন' (মোহাম্মদী, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম-১১শ সংখ্যা, ১৩৩৮ সাল); (৩) 'হিন্দু বিবৃতি ও সংখ্যা বিজ্ঞান' (মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ সাল); (৪) 'মকতব-মাদ্রাছার পাঠ্য' (মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃষ্ঠা: ৫২১-৫২৭); (৫) 'লোথিয়ান

কমিটীর রিপোর্ট' (মোহাম্মদী, ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৯, পৃষ্ঠা : ৫৯৩-৬০০); (৬) 'আত্ম-বিচার' (মোহাম্মদী, ৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৯, পৃষ্ঠা : ৮১৭-৮২৪); (৪) 'পতন-যুগের প্রকৃত ইতিহাস' (মোহাম্মদী, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৪০); (৮) 'স্কুল-পাঠশালার পাঠ্য পুস্তক' (মোহাম্মদী, ফাল্গুন, ১৩৪০, পৃষ্ঠা : ৩৬২-৩৬৭ ; চৈত্র, ১৩৪০, পৃষ্ঠা : ৩৯৩-৩৯৮ ; বৈশাখ, ১৩৪১, পৃষ্ঠা : ৫০২-৫০৮) : (৯) 'বাঙলা সাহিত্য ও মুছলমান' (মোহাম্মদী, ৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪২) : (১০) 'মুছলমানের জাতিত্ব ও সংস্কৃতি' (মোহাম্মদী, ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ,, ১৩৪৫, পৃষ্ঠা : ২৩৪-২৪০)।[১০৬]

এই সব প্রবন্ধে মোহাম্মদ আকরম খাঁ জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়, প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম, বাংলা সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় সম্পূর্ণভাবে 'মুসলিম দৃষ্টি-কোণ' থেকে আলোচনা করেন। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে হিন্দুয়ানির প্রভাব থেকে মুসলমানদের মুক্ত করে প্রকৃত মুসলিমরূপে তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে সুদৃঢ় করাই ছিল এইসব প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইংরেজ কোম্পানী কেরানীর প্রয়োজনে মাদ্রাসা স্থাপন করে, ইসলাম শেখাবার জন্য নয়। আর তাই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যর্থ হয়। ইসলামের মূলনীতি শেখাবার ব্যবস্থা করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, পাঠশালা-স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে হিন্দু-য়ানির বিশেষ প্রভাব আছে। ভারতের মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের ইতিহাস বিকৃত করে পড়ানো হয়। ইসলামের মূলনীতি ও গৌরব-গাথার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করবার উদ্দেশে পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কি কারণে বাংলার মুসলমান অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়, তার ইতিহাস তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেন। আকরম খাঁ বলেন, ইসলামীয়করণ এবং ঐশ্লামিক ঐক্য

ও সংহতি সম্পাদন করেই বাংলাদেশের মুসলমানেরা পুনরায় আত্ম-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। মুসলিম সংস্কৃতির বিরুদ্ধে হিন্দু সংস্কৃতির অভিযান কিভাবে চলছে, তার প্রতিও তিনি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘকাল ধরে হিন্দুরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতমুখী করবার চেষ্টা করছেন। আর "প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়ই সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানের অবনতির চরম যুগ।"[১০৭] আধুনিক কালের হিন্দু লেখকদের রচনায় দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য দেখা যায়। সুতরাং এই অবস্থা থেকে বাংলাভাষাকে উদ্ধার করে মুসলমানদের উপযোগী করার জন্য আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ আমদানি করে মুসলমানী বাংলা তৈরি করা প্রয়োজন।[১০৮]

আকরম খাঁ সম্পাদিত মাসিক 'মোহাম্মদী' কাগজকে কেন্দ্র করে একদল মুসলিম লেখকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা বাঙালী সংস্কৃতিকে 'হিন্দু সংস্কৃতি' ও 'মুসলিম সংস্কৃতি'—এই দুটো ভাগে বিভক্ত করে হিন্দু সংস্কৃতির অভিযানকে বাধা দিতে সচেষ্ট হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রশ্নপত্র রচনায় হিন্দুয়ানির প্রভাব বৃদ্ধি নিয়ে অনেক প্রবন্ধ 'মোহাম্মদী' কাগজে প্রকাশিত হয়। তারমধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ এখানে উল্লেখ করা হল : (১) আল-ফারুক, 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' ; (২) খোন্দকার কেরামত আলী, 'ম্যাট্রিকুলেশন প্রশ্নপত্রে সাম্প্রদায়িকতা' ; (৩) আলী হায়দার, 'প্রশ্নপত্রে হিন্দুয়ানী' ; (৪) মোহাম্মদ আবুল খএর, 'যবন-বর্জ্জিত বিদ্যাপীঠ'।[১০৯] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু অধ্যাপকদের আধিপত্য চলছে, 'যবন-বর্জ্জিত বিদ্যাপীঠ' নামক প্রবন্ধে এই বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়। হিন্দু সাংবাদিকদের মনোভাব সমালোচনা করে আবদুল কাদির 'বাংলাভাষায় আরবী-পারসী শব্দ' নামক প্রবন্ধ রচনা করেন।[১১০] জরীন কলম লিখিত 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' নামক প্রবন্ধে হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের

অত্যাচার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।[১১১] লেখক এই অত্যাচার সম্পর্কে তথ্য 'কুমুদ পাঠক' নামক একটি গ্রাম্য গাথায় সংগ্রহ করেন। তাছাড়া লেখক হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিষয়ে কাজী আবদুল ওদুদের উদার মনোভাবও সমালোচনা করেন।[১১২]

মাসিক 'মোহাম্মদী'র প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য-বোধ থেকে অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংলাভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রচলন নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান লেখকদের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। কোন কোন মুসলিম লেখক রবীন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি লেখকের সমালোচনা করেন। তাঁদের ধারণা হল, হিন্দু লেখকেরা যখন বাংলাভাষাকে সংস্কৃতমুখী করার চেষ্টা করছেন, তখন তাঁদের কর্ত্তব্য হল আরবি-ফারসি শব্দ দিয়ে মুসলমানী বাংলাভাষার রূপ দেওয়া। এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে দিলীপকুমার রায় লেখেন ঃ "কেবল ভাষা সম্পর্কে আমার এক বিষয় একটু সন্দেহ জাগে। যেখানে বাংলা কথা আজ সহজেই মেলে সেখানে অপ্রচলিত পার্সী আরবী শব্দ কেন? রবীন্দ্র-নাথের কথা এক্ষেত্রে আমার সত্য মনে হয় যে, ভাষা স্বেচ্ছাচারি, তার পরে বেশী জোর-জুলুম চলে না। যদি ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে উর্দ্দু কথা দেওয়া সমর্থনীয় বলে গণ্য হয়, তা হ'লে (আমার মনে হয়, যদিও আমি বলছি না, এ বিষয় আমি অভ্রান্ত) ভাষার স্বাভাবিক পরিণতি ব্যাহত হবার আশঙ্কা থাকে।"[১১৩] কিন্তু এই বিতর্কের অবসান হয়নি।

হিন্দু লেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের যথার্থতা সম্পর্কে মুসলমান লেখকেরা নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের "অভিমান এবং হীনমন্যতাবোধ কার্যকরী ছিল"। মুসলিম লেখকদের রচনায় "মুসলমানকে জানার ব্যাপারে হিন্দুর অনাগ্রহ" এবং "সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর অসহিষ্ণুতা" প্রকাশিত হয়। 'সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য' মুসলমান লেখকদের মনকে আচ্ছন্ন করে। কোন কোন মুসলিম লেখক মনে

করেন, দুই ধর্মের মূলগত পার্থক্যের ফলেই সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি রচিত হয়। এইসব কারণে, দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করা সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমান একটি জাতি গড়ে তুলতে পারেনি।[১১৪]

মাসিক 'মোহাম্মদী' কাগজকে মুসলিম লীগের সাহিত্যিক মুখ-পত্ররূপে গণ্য করা হয়। আসাম প্রদেশের সিলেট থেকে প্রকাশিত 'আল ইসলাহ' কাগজও তাই ছিল। সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' কাগজও একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সুতরাং 'মোহাম্মদী' ও 'আল ইসলাহ' দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে পরস্পরের নিকটবর্তী ছিল। অবশ্য কলকাতা থেকে 'মোহাম্মদী' ও সিলেট থেকে 'আল ইসলাহ' প্রকাশিত হওয়ায় অঞ্চলগত পার্থক্যের ও দূরত্বের জন্য এই দুটো কাগজের বক্তব্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। 'সওগাত' কাগজ 'মোহাম্মদী'র চেয়ে কিছুটা কম রাজনৈতিক হলেও, 'সওগাত' কাগজও সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রচারক ছিল। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিকী'র বিশেষ ভূমিকা ছিল।[১১৫] 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত নিয়ে 'গোঁড়া হিন্দুদের অসহিষ্ণুতাও' বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সমালোচনা করা হয়। স্বাতন্ত্র্যবোধ এতটা প্রখর ছিল যে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধে' হিন্দু-মুসলমান মিলনের যে ছবি আঁকেন সেই দৃষ্টিভঙ্গীকেও বাঙালী মুসলমানেরা ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখেন।[১১৬] ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা হতে প্রকাশিত 'বুলবুল' কাগজ পরিচ্ছন্ন বাঙালীত্বের বাহক হলেও, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কাগজ মুসলিম সমাজে স্বাতন্ত্র্যবোধ পরিপুষ্ট করে তোলে।[১১৭] ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে 'দৈনিক আজাদ' প্রকাশিত হয়। তখন থেকে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী আরও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। অজস্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে, সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে ও বিভিন্ন লেখকের রচনায় 'দৈনিক

আজাদ' শহরের ও গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করে।[১১৮]

'মুসলিম সংস্কৃতি', 'হিন্দু সংস্কৃতি' থেকে পৃথক—এই মনোভাব মুসলিম লীগের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হয়ে ওঠে। এর বিরুদ্ধে যেসব মুসলমান লেখক প্রতিবাদ ধ্বনি উচ্চারণ করেন, শিক্ষিত মুসলিম সমাজে তার বিশেষ প্রভাব পড়েনি। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এই ধারণা এক তাত্ত্বিক আবরণে আরও জোরালোভাবে প্রচার করা হয়। এই সময়ে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক মুখপত্ররূপে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার ভূমিকা লক্ষণীয়।[১১৯] ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' ও ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কলকাতাতে প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' "পাকিস্তান আন্দোলনের যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবী প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে।" ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, সিলেটপ্রভৃতি স্থানেও পূর্ব্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাই-টির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২০] পাকিস্তান প্রস্তাব রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানকে যেমন একটি স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত করে, তেমনি সাহিত্য ক্ষেত্রেও হীনমন্যতাবোধ দূর করে ও হিন্দু লেখকদের প্রভাবমুক্ত করে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। বলা হল: "মুসলমানের কৃষ্টি, মুসলমানের তমদ্দুন, মুসলমানের সমাজ-ব্যবস্থা, মুসলমানের জীবনযাত্রা প্রণালী সাহিত্যে রূপায়িত করতে হবে, এবং তাতেই হবে মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার সার্থকতা।"[১২১] 'বাংলার মুসলমানের নিজস্ব সংস্কৃতি' ও 'নিজস্ব সাহিত্য' ভিত্তি করেই এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত। এই আত্মোপলব্ধির মূল বক্তব্য হল এই যে, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। কারণ "এর স্পিরিটও মুসলমানী নয়; এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়।" সুতরাং

"এটা বাংলার মুসলমানের সাহিত্য নয়।"[১২২] এই মনোভাব এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ হলে অনুষ্ঠিত 'পূর্ব্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ' সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে মূল সভাপতির অভিভাষণে আবুল মনসুর আহমদ বলেন: "সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানেরা যে আলাদা জাত, এতে কোন তর্কের জায়গা নেই।"[১২৩] এইভাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাব সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনেও পড়ে।

(৫) বাংলাদেশের রাজনীতির পট-পরিবর্তন:

(ক) **স্বরাজ্য পার্টির আবির্ভাব ও বেঙ্গল প্যাক্ট**—খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় (১৯১৯-১৯২২ খ্রী) সাময়িক কালের জন্য হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের পরেই অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। এই সময়ে ভারতের রাজনীতিতে স্বরাজ্য পার্টির আবির্ভাব। প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচী নিয়ে স্বরাজ্য পার্টির অভ্যুদয় হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে।[১২৪] চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন এই পার্টির অন্যতম নেতা। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকেই চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পরিচালনা করতে আরম্ভ করে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্বরাজ্য পার্টি লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে প্রবেশ করে এবং আইন সভার অভ্যন্তরে এক শক্তিশালী বিরোধী গ্রুপ গঠন করে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অচল করতে সচেষ্ট হয়। মুসলমানদের সমর্থনে চিত্তরঞ্জনদাশ এই উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হন। কাউন্সিলে স্বরাজ্য পার্টি কি নীতি অবলম্বন করবে, তা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' নামে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬-১৭ ডিসেম্বর কলকাতাতে স্বরাজ্য পার্টি কর্তৃক এই প্যাক্ট গৃহীত

হয়। স্বরাজ অর্জিত হবার পরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার কিভাবে সংরক্ষিত হবে, তা 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টে' উল্লেখ করা হয়। এই প্যাক্ট পুরোপুরি মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাতে বলা হয়ঃ বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য পৃথক নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। আর বিভিন্ন লোকাল বডির প্রতিনিধি শতকরা ৬০ ও ৪০ এই হারে নির্বাচিত হবে। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আসন সংখ্যা হবে শতকরা ৬০ ভাগ, আর সংখ্যালঘিষ্ঠদের আসন সংখ্যা হবে শতকরা ৪০ ভাগ। সমস্ত সরকারী পদের শতকরা ৫৫ ভাগ পাবেন মুসলিম সম্প্রদায়। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় বিরোধ মীমাংসার বিষয়ে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা এই প্যাক্টে ছিল, যথা মসজিদের সামনে গীত বাদ্য নিষিদ্ধ হবে, আর ধর্মীয় প্রয়োজনে গো-হত্যা করলে এমনভাবে করতে হবে যাতে হিন্দুদের ধর্মীয় মনোভাবে আঘাত না লাগে।[১২৫]

চিত্তরঞ্জন দাশের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন আবেগের সৃষ্টি করে। কিন্তু 'হিন্দু প্রেস' তাঁর প্যাক্টের সর্তসমূহকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে। জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই প্যাক্ট অনুমোদন করতে সম্মত হননি। তাই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত কোকনদ কংগ্রেস এই প্যাক্টকে স্বীকৃতি দেয়নি। তারফলে এই প্যাক্টের গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পায়। তাই স্বরাজ্য পার্টি কাউন্সিলের মুসলিম সদস্যদের সমর্থনে রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির ও নিপীড়নমূলক আইন রহিতের বিষয়ে সরকার পক্ষকে পরাজিত করে নিজেদের গৌরব বৃদ্ধি করতে সমর্থ হলেও, তা ক্ষণস্থায়ী হয়। কারণ, একদিকে যেমন 'হিন্দু প্রেস', 'কংগ্রেস কর্মী সঙ্ঘ' ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটি অংশ এই প্যাক্টের ও স্বরাজ্য পার্টির প্রতি বিরূপ ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে কয়েকজন প্রভাবশালী মুসলিম নেতাও স্বরাজ্য পার্টির প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে সক্রিয় হন।[১২৬] ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কাউন্সিলে খান

বাহাদুর মোশারফ হোসেন এক প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, হিন্দু মুসলিম প্যাক্টের সর্তসমূহকে অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারী চাকরির প্রতিটি বিভাগে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৫ ভাগ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারী পদে শতকরা ৮০ ভাগ করে মুসলমান নিয়োগ করতে হবে। এই প্রস্তাব এক জটিল পরিবেশের সৃষ্টি করে। তখন চিত্তরঞ্জন দাশ বলেন, স্বরাজ অর্জনের পরেই হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট কার্যকরী হবে।[১২৭] সরকার এই প্রস্তাবের সাহায্যে স্বরাজ্য পার্টিকে বিপর্যস্ত করতে চেষ্টা করলেও, এই প্রস্তাবের সর্তসমূহ কার্যকরী করা যে সরকারের পক্ষেও সম্ভব নয় তা তারা উপলব্ধি করতে পারে। তাই শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়।[১২৮] কিন্তু এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে কাউন্সিলের আলোচনা স্থগিত থাকলেও, হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের রচয়িতাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে কোন কোন মুসলিম মহলে সন্দেহের ভাব দেখা দেয়। কলকাতা করপোরেশনকে কেন্দ্র করে তা আরও বৃদ্ধি পায়। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ দখল করাও স্বরাজ্য পার্টির উদ্দেশ্য ছিল। কাউন্সিল নির্বাচনে সাফল্য অর্জনের পরে স্বরাজ্য পার্টি কলকাতা করপোরেশন দখলের চেষ্টা করে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়র ও এইচ. এস. সারওয়ার্দি ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন, এবং সুভাষচন্দ্র বসু চীফ একসিকিউটিভ অফিসার হন। অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিম নেতৃবৃন্দ অনুভব করেন, মুসলমানদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে স্বরাজ্য পার্টি মোটেই আগ্রহশীল নয়। কলকাতা করপোরেশনে কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই প্যাক্টের সর্ত পালনে হিন্দু সদস্যরা বিশেষ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। অথচ মুসলমানদের আশা ছিল, যেসব লোকাল বডিতে স্বরাজ্য পার্টি ক্ষমতাসীন হবে অন্ততঃ সেখানে তারা নিশ্চয়ই এই প্যাক্টকে কার্যকরী করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে পরিচালিত করপোরেশন তা কার্যকরী করতে পারেনি।

তাছাড়া মফস্বলেও কয়েকটি মিউনিসিপালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে স্বরাজ্য পার্টি সাফল্যলাভ করে, যথা—যশোহর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, নদীয়া ও মেদিনীপুর। এইসব লোকাল বডিতেও স্বরাজ্য পার্টি এমন কিছু কাজ করতে পারেনি যা মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম।[১২৯] সুতরাং হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট একটি সুস্থ পরিকল্পনা হলেও তা বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ছিল, তা স্বরাজ্য পার্টি নিতে পারেনি। তাই চিত্তরঞ্জন ক্রমান্বয়ে মুসলিম সমর্থন হারিয়ে ফেলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জে যে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় তাতে হিন্দু প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। এই সম্মেলন সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তা দূর করবার জন্য স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন মুসলমান নেতার বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তাতেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। প্রায় একই সময়ে সিরাজগঞ্জে স্বরাজ্য পার্টির বিরোধিতা করে 'মোসলেম কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে স্থানীয় মুসলমানেরা খুবই আকৃষ্ট হন। সুতরাং হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের প্রভাব খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়।[১৩০]

সমস্ত আবেগ ও শক্তি নিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলমানদের পশ্চাৎপদ অবস্থা দূর করে হিন্দু-মুসলিম উভয়কে নিয়ে এক নতুন বাংলাদেশ গঠনে প্রয়াসী হন এবং ভারতের রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব মুক্ত করে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনে উদ্যোগী হন। কিন্তু এক প্রতিকূল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিবেশে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তাছাড়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুন চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যুতে স্বরাজ্য পার্টি সুযোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। প্রসঙ্গতঃ স্বরাজ্য পার্টির আরও কয়েকটি দুর্বলতার প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কাউন্সিলের

অভ্যন্তরে স্বরাজ্য পার্টির কর্মসূচী গ্রহণের সময়ে এই সিদ্ধান্তও করা হয় যে, স্বরাজ্য পার্টির নীতি অনুযায়ী তারা প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নেও সচেষ্ট হবে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন এই কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পরে স্বরাজ্য পার্টি ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এমন একটি প্রস্তাব রচনায় উদ্যোগী হয় যা কৃষক ও জমিদার উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বরের মধ্যে একটি রিপোর্ট তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও স্বরাজ্য পার্টি ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারেনি এবং কোন রিপোর্টও প্রকাশ করতে পারেনি।[১৩১] তবে নভেম্বর মাসে বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে পেশ করবার জন্য যে 'টেনান্সি বিল' ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হয় সে বিষয়ে স্বরাজ্য পার্টির মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' কাগজে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, এই বিল কৃষক ও জমিদারের স্বার্থ রক্ষায় সহায়ক হবে না। উপরন্তু উভয়ের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি করবে। এই প্রবন্ধে একই সঙ্গে কৃষক ও জমিদারের স্বার্থ রক্ষার কথা সামনে রেখে ভূমি সমস্যাটি আলোচিত হয় এবং এইভাবে ভূমি সমস্যা সমাধানের কথা বলা হয়। তাতে ভূমি ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়নি। এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে এই সমস্যা সম্পর্কে স্বরাজ্য পার্টির মনোভাব বোঝা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বরাজ্য পার্টির যে প্রোগ্রাম রচিত হয় তাতে জমিদারী প্রথার অবসানের দাবি করা হয়নি।[১৩২]

চিত্তরঞ্জন দাশ জীবিত থাকাকালীন এই কাগজে অর্থনৈতিক অবস্থা ও জমিদারদের সম্পর্কে যে ধরণের মনোভাব ব্যক্ত হয় তাও লক্ষণীয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল 'ফরওয়ার্ড' কাগজে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বেঙ্গল কাউন্সিলে সরকার ও বিরোধী পক্ষের সদস্যদের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে স্বরাজ্য দলের মুসলিম সদস্যদের ভূমিকা প্রশংসা করা হয়। তাছাড়া কাউন্সিলের জমিদার

সভ্যদের ভূমিকারও প্রশংসা করে বলা হয়, কাউন্সিলের বিরোধী পক্ষের শক্তি জমিদারদের মনোভাবের ফলেই বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক অসুবিধার মধ্যেও জমিদার সভ্যরা যে অসামান্য সাহস প্রদর্শন করেছেন তার জন্য দেশ তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। দরিদ্র জনসাধারনের প্রতি তাঁদের যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। তাদের দুরবস্থা দূরীকরণে জমিদারদের প্রচেষ্টার ফলেই গ্রামের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। যাঁরা বলেন, জাতীয় আন্দোলন হল মধ্যবিত্ত শ্রেনীর স্বার্থরক্ষার আন্দোলন, তাঁদের অসত্য প্রচারের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ জমিদারদের ভূমিকায় প্রতীয়মান হয়। জমিদারেরা যেভাবে জনস্বার্থকে রক্ষা করছেন তাতে তাঁদের সমর্থন ও সহানুভূতি জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে জমিদারেরা স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের নেতৃপদে আসীন হন এবং প্রদেশের রাজনীতিতে জমিদারেরা যে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণে বদ্ধপরিকর তাও পরিস্ফুট হয়। পরিশেষে প্রবন্ধ লেখক তাঁদের সাফল্যও কামনা করেন। এই প্রবন্ধ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, স্বরাজ্য পার্টি জমিদারদের প্রগতিশীল ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের সহযোগিতারপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।[১৩৩] যেহেতু স্বরাজ্য পার্টি মনে করে, দেশের স্বাধীনতা অর্জিত না হলে দেশের মৌলিক সমস্যাসমূহ দূর করা সম্ভব নয়, সেজন্য ভূমি সমস্যার ক্ষেত্রে এক সমন্বয়ী পন্থা অনুসরণ করে এই পার্টি কৃষক ও জমিদারের মধ্যে তিক্ততা ও বিরোধ দূর করতে প্রয়াসী হয়। এই সমস্যার সমাধান না হলে কি জটিলতা দেখা দিতে পারে সে বিষয়ে কোন সুচিন্তিত আলোচনা স্বরাজ্য পার্টির রচনাবলীতে পাওয়া যায় না। স্বভাবতই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর হওয়া সত্বেও স্বরাজ্য পার্টি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিকে মুক্ত রেখে কোন নতুন পথ নির্দেশ করতে সক্ষম হয়নি।[১৩৪]

(খ) সাম্প্রদায়িক বিরোধ—১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো, প্রকাশ্য স্থানে গরু কোরবানি, নারী নিগ্রহ, নদীরচর দখল করা, জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে ক্রমান্বয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক জটিলরূপ ধারণ করে। এই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি স্থানে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার মুসলিম কৃষকেরা সাহা সম্প্রদায়ভুক্ত মহাজনদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বয়কট আন্দোলন পরিচালনা করে। ফরিদপুর জেলায় জমি দখল নিয়ে মুসলমান ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ব্যাপক আকার ধারণ করে। হিন্দুনারী হরণের বিষয় নিয়ে পাবনা ও রংপুরে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। যশোহরে ও উলুবেড়িয়াতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দেয়। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই বিরোধ মীমাংসায় অগ্রসর হলেও, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস কতটা বৃদ্ধি পায়, এইসব বিক্ষিপ্ত ঘটনা তারই পরিচায়ক।[১৩৫]

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঢেউ আরও প্রবল হয়ে ওঠে। হিন্দু ও মুসলমান পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে অনেক সংবাদ পরিবেশন করা হয়। এই সময়ে সম্প্রদায়গত স্বার্থরক্ষার্থে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সংগঠন তৎপর হয়, যথা—শুদ্ধিসভা, হিন্দুসভা, হিন্দু মিশন, হিন্দুসংগঠন, বিভিন্ন আঞ্জুমান, খিলাফৎ কমিটি, তন্‌জীম কমিটি, তবলীগ, জমিয়ৎ-ই-উলেমা ইত্যাদি। হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে শুদ্ধি আন্দোলন ও ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তনজীম আন্দোলন পরিচালিত হয়। আর্যসমাজ ও হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ শুদ্ধি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এই আন্দোলন ব্যাপ্ত হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সারাভারত হিন্দু শুদ্ধিসভা'র দিল্লি শাখা ৮৪টি অ-হিন্দু গ্রাম শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে। এই কাজের সঙ্গে পণ্ডিত মদন মোহন

মালবীয়া ও লালা লাজপত রায় যুক্ত ছিলেন। তাঁরা শুদ্ধি আন্দোলনের প্রয়োজনে দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহের জন্যও একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। শুদ্ধি ও তনজীম আন্দোলনের প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু সঙ্ঘ' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক বাংলাদেশে শুদ্ধি আন্দোলনের পক্ষে প্রচার করে। হিন্দু সমাজের সংহতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নতুন করে 'শিবাজী উৎসব' পালিত হয়। কুমিল্লার 'অভয় আশ্রম' আড়ম্বর করে এই উৎসব পালন করে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে অনেক 'আঞ্জুমান' গড়ে ওঠে এবং উলেমারাও সংগঠিত হন।[১৩৬] অন্যদিকে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে 'হিন্দু মিশন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল : (১) হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার করা। (২) হিন্দু আদর্শ অনুযায়ী গোঁড়া হিন্দু সমাজের-সংস্কার সাধন করা। (৩) যাঁরা হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করেন তাঁদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। (৪) সনাতন ধর্মের আদর্শ অনুযায়ী ভারতীয় ও অ-ভারতীয় উৎস থেকে উদ্ভূত সমস্ত মত ও পথের মানুষকে এক মহান ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ করা।[১৩৭] ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতাতে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভার যে অধিবেশন হয় তাতেও হিন্দু ধর্ম রক্ষার্থে একই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে প্রায় একই আদর্শে আরও কয়েকটি হিন্দু সংগঠন সক্রিয় হয়। এইসব হিন্দু সংগঠনের কার্যাবলীকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ 'হিন্দুরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বলে উল্লেখ করেন। এইভাবে হিন্দু ও মুসলিম সংগঠনসমূহের তৎপরতায় গ্রাম-বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক বিপর্যস্ত হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে বরিশাল-ফরিদপুর জেলায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ দ্রুত অবস্থার অবনতি ঘটায়।[১৩৮]

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৮৫ খ্রী)

সংশোধনের ফলে জমিদার কর্তৃক রায়তের খাজনা বৃদ্ধির অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় জমিদার-রায়তের সম্পর্কের আরও অবনতি হয়। সেটেলমেণ্ট কোর্টের মারফত জমিদারেরা খাজনা বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন জেলায় কি পরিমান খাজনা অবৈধভাবে বৃদ্ধি পায় তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত সেটেলমেণ্ট রিপোর্টসমূহে পাওয়া যায়। এই কারণেই গ্রাম বাংলায় জমিদার-রায়ত বিরোধ সহজেই সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণত হয়। কয়েকটি ঘটনায় তা প্রমানিত হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। কয়েকমাস পরে (জুলাই মাসে) ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমাতেও দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধারণ করে। ঢাকার দাঙ্গার মূল কারণ অনুসন্ধান করার জন্য যে কমিটি নিয়োগ করা হয় তার রিপোর্টে বলা হয়ঃ (১) হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষের মনোভাব রয়েছে। (২) বেশীর ভাগ কৃষক মুসলমান। পাটের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় তাদের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং তারা ঋণের জালে আবদ্ধ হয়। অন্যদিকে তাদের জমিদার ও মহাজনেরা সবাই হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। (৩) মুসলমানেরা হিন্দু প্রাধান্যের কথা ভেবে খুবই উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হন। স্বায়ত্তশাসনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হওয়ায় তাঁদের এই ভয় ও অবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায়।[১৩৯]

কিশোরগঞ্জের দাঙ্গার প্রকৃতিও লক্ষনীয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুলাই মুসলিম কৃষকেরা দলবদ্ধভাবে একজন বড় হিন্দু মহাজনের বাড়ি আক্রমণ করে, তার ঘর-বাড়ি লুঠপাট করে ও পুড়িয়ে দেয়। এই দাঙ্গায় কয়েকজন নিহত হয়। আরও ছয়জন হিন্দু মহাজনের বাড়ি লুঠপাট ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ১১ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত ব্যাপকভাবে হিন্দুমহাজনের ঘরবাড়ি লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং ঋণপত্রগুলিকে ভস্মীভূত করা হয়। প্রায় ৩৫টি গ্রাম আক্রান্ত হয়। একটানা ১৬ জুলাই পর্যন্ত উত্তেজনা চলার পরে অবস্থা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। হিন্দু ও কংগ্রেস পরিচালিত

কাগজে এই দাঙ্গাকে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারূপেই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই দাঙ্গার মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক। প্রায় সব মহাজনই ছিল হিন্দু। যে অল্প সংখ্যক মুসলিম মহাজন ছিল তাদের বাড়িও আক্রান্ত ও লুন্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে ঋণপত্রগুলি অপহৃত হয়।[১১০] এইসব ঘটনা পূর্ববঙ্গের ভূমিসমস্যাকে আরও প্রকট করে তোলে। এর প্রকৃত সমাধানে সচেষ্ট না হলে সমস্যা যে আরও গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে সেই ইঙ্গিত বহন করে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দিক থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঢেউ প্রতিহত করার কোনই প্রয়াস হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

(গ) পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা—স্বাভাবিকভাবেই ১৯২৬-১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব ভারতের রাজনীতিতে পড়ে। মুসলিম স্বার্থ রক্ষার প্রভাবশালী দুটো প্রতিষ্ঠান অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স ও অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা (Separate Electorates) ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal Award) বজায় রাখবার জন্য মুসলমানদের সজ্ঞবদ্ধ করে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আগা খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সারাভারত মুসলিম কনফারেন্সে অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারপরে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার দাবি সম্বলিত মহম্মদ আলি জিন্না রচিত 'চৌদ্দ পয়েণ্টে' (Jinnah's 14 Points) একই অভিমত ব্যক্ত হয়।[১১১] ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আইন-অমান্য আন্দোলনে এই দুটো প্রতিষ্ঠান যোগদান করেনি এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের সাংবিধানিক সমস্যার সমাধানের জন্য যেসব মতামত ব্যক্ত করেন তাতেও সম্প্রদায়গত স্বার্থের কথাই ব্যক্ত হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৫-৬ এপ্রিল সারাভারত মুসলিম কনফারেন্স এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের পুনরুক্তি করে দাবি করে বাংলাদেশের আইন সভায় জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলিম সদস্যের সংখ্যা

যাতে বেশী হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্য কোন ব্যবস্থা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সারাভারত মুসলিম লীগও একই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। উপরন্তু মুসলিম লীগের প্রস্তাবে 'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের' সমালোচনা করা হয় এবং যে সমস্ত প্রদেশে কৃষকেরা খাজনা দিতে অস্বীকার করে তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর আক্রমণ আখ্যা দিয়ে তারও সমালোচনা করা হয়।[১৪২] এইভাবে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দুইটি প্রভাবশালী মুসলিম সংগঠন হিন্দু সম্প্রদায়কে প্রধান প্রতিপক্ষ মনে করে সরকারী সহযোগিতায় পৃথক নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অন্যান্য মুসলিম সংগঠনগুলোতে এই মনোভাবের প্রতিফলন হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সারাভারত জামিয়াত-উল-কোরেশ, আঞ্জুমান-ই-হিমায়াত-ই-ইসলাম (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজের মুসলমানদের সংগঠন), আসাম মুসলিম এসোসিয়েশন, আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া (বাতালা), সুন্নত-ওয়াল-জামাত (লায়ালপুর), মাদ্রাস মুসলিম এসোসিয়েশন কনফারেন্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সপক্ষে আন্দোলন সুরু করে।[১৪৩] এইসব প্রতিষ্ঠান জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ভূমিকার সমালোচনা করে। ইতিমধ্যে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে কংগ্রেসের বিচ্ছেদ হয় এবং তার ফলে কংগ্রেস বিরোধী মুসলিম রাজনীতি আরও সংহত হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মওলানা মহম্মদ আলির মৃত্যু হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিল্লিতে মওলানা শৌকত আলির সভাপতিত্বে 'অল পার্টিস মুসলিম কনফারেন্স' হয়। এই সভাতে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার্থে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতেও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা সমর্থন করা হয়।[১৪৪] এইসব প্রতিষ্ঠানের ও সভার সঙ্গে যুক্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দের কংগ্রেস ও হিন্দু সম্প্রদায় বিরোধী মনোভাব এতটা প্রবল হয়ে ওঠে যে, তাঁরা অনেকেই জাতীয় আন্দোলনের ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের

সঠিক মূল্যায়ন করার প্রতি যত্নবান হননি। তাই অমৃতসরের 'মারকাজিবাজাম-ই-ইসলাম' নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ভারত সরকারের চীফ সেক্রেটারীর নিকট একটি পত্রে সরকার কর্তৃক ভগৎ সিংহের মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করেন।[১৪৫]

মুসলিম সমাজের যে অংশ যুক্ত নির্বাচন প্রথার সপক্ষে ছিলেন তাঁরা বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন না। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ কোন আসন সংরক্ষণ না করে যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে। তারা মনে করে, সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা মুসলিম সম্প্রদায়ের ও দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। পুনরায় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বেঙ্গল প্রেসি-ডেন্সী মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভাতে লণ্ডনে বেনামে প্রকাশিত 'মুসলিম ম্যানিফেস্টোর' সমালোচনা করা হয়। এই সভার সভাপতি ছিলেন মৌলবী মুজিবর রহমান। আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন ঃ মওলানা মুহম্মদ আকরম খান, মোল্লা জানমহম্মদ, মৌলবী মোয়াজ্জেম হোসেন, মৌলবী রফিকুর রহমান, অধ্যাপক আবদুর রহিম, মৌলবী আবদুল মজিদ, চৌধুরী গোলাম মহম্মদ, মৌলবীবজির আহমদচৌধুরী, মহম্মদ মানোয়ার, খান বাহাদুর মোয়াজ্জেম আলি এবং ডাঃ বি· আহমদ। এই ম্যানিফেস্টোতে মুসলমানদের জন্য এতটা সুযোগ-সুবিধা দাবি করা হয় যা মোটেই যুক্তিনির্ভর নয়। আর প্রতিবেশী হিন্দুদের বিরোধিতা করেই মুসলিম স্বার্থ রক্ষার এইসব দাবিসমূহ উত্থাপন করা হয়। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ বলে, আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে ও অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন করে দেশ গঠনে উদ্যোগী হওয়া উচিত। এই সময়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগের সঙ্গে সারা ভারত মুসলিম লীগের মতপার্থক্য হয়। সরকারী রিপোর্টে বলা হয়, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা প্রতিনিধিত্ব করে। এই মতবাদের জন্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ সম-ধর্মীদের নিকট হতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

অবশ্য এই বিচ্ছিন্নতা খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। ক্রমবর্ধমান কংগ্রেস-লীগ বিরোধের পরিবেশে যখন মুসলিম লীগ ধীরে ধীরে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয় তখন সম্প্রদায়গত স্বার্থ এতটা গুরুত্ব অর্জন করে যে, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগের যে অংশ জাতীয়তাবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন তাঁরা তা পরিহার করে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হন। অবশ্য ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বেশী প্রভাবশালী ছিল বেঙ্গল মুসলিম কনফারেন্স।[১৬] ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৯-১০ জুলাই কলকাতার টাউন হলে এ. এইচ. গজনভীর সভাপতিত্বে বেঙ্গল মুসলিম কনফারেন্সের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পৃথক নির্বাচন প্রথার সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সংস্থা সারা ভারত মুসলিম কনফারেন্সের প্রাদেশিক শাখা ছিল। সভাপতির ভাষণে এ. এইচ. গজনভী বলেন, মুসলিম স্বার্থ রক্ষার জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বজায় রাখা উচিত। তিনি আশা করেন, লোথিয়ান কমিটি রিপোর্ট (Lothian Committee Report) প্রকাশের পরে এবং সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার সাম্প্রতিক ভাষণের পরে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে দীর্ঘ প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত আর বিলম্বিত হবে না। তিনি একথাও বলেন, এতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের যেভাবে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং অতীতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লখনৌ প্যাক্টে তাঁদের স্বার্থ যেভাবে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে, সেইসব তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে বাঙালী মুসলমানেরা খুবই অস্থির হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় বাঙালী মুসলমানদের দাবি হল এই যে, যেহেতু এই প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি সেজন্য এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাঁরা বাংলাদেশের আইনসভাতেও সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকেন। বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যার পরিমাণ হল শতকরা ৫৪.৮৫। সুতরাং আইনসভাতেও এই সংখ্যার প্রতিফলন হওয়া প্রয়োজন। এই ভাষণে গজনভী স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ

বিরোধী আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১ খ্রী) কথা উল্লেখ করে বলেন, পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে 'মহান ভাইসরয়' কার্জন কর্তৃক যে নতুন প্রদেশ গঠিত হয় তাতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু স্বদেশীর নামে যে প্রচণ্ড আন্দোলন সুরু হয় তারফলে কার্জনের স্বপ্ন শূন্যে বিলীয়মান হয় এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের স্থিরীকৃত ঘটনা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বাতিল হয়ে যায়। এই কারণে যুক্ত বাঙলায় মুসলমানেরা এমন এক সঙ্কটে পড়েন যে জনসংখ্যা অনুপাতে আইনসভায় তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করায় তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। গজনভী এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন, যদি বর্তমানে মুসলমানেরা সচেতন না হন তাহলে পূর্বের মত তাঁরা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।[১৪৭]

লক্ষণীয় এই যে, প্রায় একই মনোভাব অনুসরণ করা সত্বেও মুসলিম লীগ ও মুসলিম কনফারেন্স আলাদাভাবে মুসলিম জনমত গঠনের চেষ্টা করে। উপরন্তু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মুসলিম লীগ দুটো অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগের সঙ্গে মুসলিম কনফারেন্সের মিলনের প্রশ্নেই মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত। সুতরাং এই সময়ে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে ভিত্তি করে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার পক্ষপাতী মুসলিম জনমত তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল। অবশ্য এই অংশের তুলনায় কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা মুসলিম সমাজে বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন না, অথবা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ততটা সংগঠিত ছিলেন না। এই অবস্থায় মুসলিম লীগ ও মুসলিম কনফারেন্সকে যুক্ত করে এবং মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে বিরোধ মীমাংসা করে এক শক্তিশালী মুসলিম সংগঠন গড়ার জন্য আগা খাঁ ও জিন্না উদ্যোগী হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জিন্না মুসলিম লীগের নেতৃত্বভার গ্রহণ করায় কংগ্রেসের সমর্থক কিছু পত্র-পত্রিকা এই আশা প্রকাশ করে, পূর্বে জিন্নার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংগঠনের যোগাযোগ

থাকায় বর্তমানে হয়তো সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার পথ অনেকটা সুগম হবে। কিন্তু জিন্নার ভূমিকায় তাঁরা খুবই নিরাশ হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মুসলিম লীগ ও মুসলিম কনফারেন্স একসঙ্গে মিলিত হয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্য একটি যৌথ নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে। ১৩ আগস্ট এই যৌথ নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। এই ইস্তাহারে মুসলমানদের যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধীদের মোকাবিলা করতে বলা হয়। একথাও বলা হয়, পণ্ডিত মালবিয়া প্রতিষ্ঠিত নতুন ন্যাশন্যালিস্ট পার্টি হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। কার্যতঃ কংগ্রেসও এই দুটো প্রতিষ্ঠানের মত একই উদ্দেশ্য সাধন করার চেষ্টা করছে। ১৩ আগস্ট গৃহীত এই ইস্তাহারে আসন্ন নির্বাচনে মুসলমানদের মুসলিম স্বার্থ রক্ষার সমর্থক প্রতিনিধিদের ও উপরে উল্লিখিত প্রধান দুটো দাবির পক্ষে ভোট দিতে বলা হয়।[১৪৮] এইভাবে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাবিরোধী মুসলিম রাজনীতি আরও সংগঠিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচনের পরে মুসলিম লীগ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। তখন থেকে মুসলিম লীগ ভারতের রাজনীতির অন্যতম নিয়ামক হয়।

(ঘ) **মুসলিম লীগের প্রাধান্য বিস্তার**—১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক শাসনের সূত্রপাত হয় বল্লে অত্যুক্তি হয় না। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত সময় বাদ দিলে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের দেশভাগের সময় পর্যন্ত একটানা দীর্ঘকাল মুসলিম লীগের শাসন এখানে বজায় থাকে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষে ফজলুল হকের সঙ্গে মিলে মুসলীম লীগ বিরোধী কোন কোয়ালিশন করা সম্ভব হয়নি। তেমনি

কংগ্রেস সংগঠনে হিন্দু জমিদার-জোতদার ও মহাজনদের প্রভাব থাকায় কংগ্রেসের পক্ষে কৃষি-সংস্কারের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।[১৫৯] এই বিষয়ে কংগ্রেস নেতাদের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে অতুল চন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করেন : "মহাত্মার প্রথম অসহযোগ-আন্দোলনে বাংলার চাষী, যাদের অধিকাংশ মুসলমান, কংগ্রেসের ডাকে প্রবল সাড়া দিয়েছিল, কংগ্রেসকে মনে করেছিল নিজের জিনিস। তেমন ঘটনা পূর্বে কখনো ঘটেনি। এই অভূতপূর্ব অবস্থার সুযোগে বাংলার কংগ্রেসের নেতারা বাংলার রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি ও আন্দোলনকে ধর্মভেদের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেবার কোনো চেষ্টাই করেননি। নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থের চিন্তা তাঁদের বুদ্ধিকে অন্ধ ও কর্মকে পঙ্গু করেছিল। বাংলার চাষীর অনায়াসলভ্য নেতৃত্ব বাংলার কংগ্রেসের পক্ষে অসাধ্য হয়েছিল। ১৯২৮ সালের আইন-সংশোধন ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ হ'ল বাংলার আইন সভার কংগ্রেসী সভ্যদের কাছে চাষীর স্বার্থের চেয়ে জমিদারের স্বার্থ বড়। এই প্রস্তাবিত আইনের আলোচনায় স্বরাজ্যদলের এক বৈঠকে একজন বিখ্যাত নেতা বলেছিলেন যে, গাছ কেটে নেবার যে টানা স্বত্ব চাষীকে দেওয়া হ'ল it will strike their imagination, অর্থাৎ তাতেই বাংলার চাষীরা বাংলার কংগ্রেসের চাষী-হিতৈষনায় মুগ্ধ থাকবে। বাংলার চাষী চাষা বটে, কিন্তু অতটা বোকা নয়। এর পর বাঙালী চাষীর আনুগত্য বাংলার কংগ্রেস আর ফিরে পায়নি। কিন্তু জমিদারের স্বার্থরক্ষার এই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিফল হ'ল। ১৯২৮ সনের বিধান বেশিদিন টিকে থাকল না। অর্থাৎ বাংলার কংগ্রেসের পিঁয়াজ ও পয়জার দু-ই হ'ল।"[১৬০]

ফজলুল হকও কৃষক-প্রজা পার্টির প্রোগ্রামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের দাবি রাখলেও কৃষিতে কোন মৌলিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হননি। এই কৃষক প্রজাপার্টিতে জোতদার শ্রেণীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আইনে কৃষক কিছু সুবিধা লাভ

করলেও ও চাষের জমির মালিকী স্বত্ব পেলেও "বাংলার চাষীর আর্থিক দুর্দশা কিছুই ঘোচেনি।"[১০১] অন্যদিকে মুসলিম লীগের নেতৃত্বেও জমিদার-জোতদার-ব্যবসায়ীদের প্রভাব থাকায় তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সাধারণ মুসলমানদের স্বার্থে মাঝে মাঝে জমিদারী প্রথার অবসানের কথা বল্লেও কার্যতঃ কোন গঠন-মূলক ভূমি সংস্কারে তাঁরা তৎপর হননি। তাঁরা ভূমি সমস্যাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়াররূপেই ব্যবহার করেন।[১০২] স্বভাবতই এই পরিবেশে কোন মৌলিক কৃষি সংস্কারের মাধ্যমে নতুন বাংলা গঠনে যৌথ প্রয়াসের অভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের উপকরণ-সমূহ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করে। তা থেকে উদ্ধারের কোন পথই খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই পরবর্তীকালে দেশভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে গোটা বাংলাদেশের ১৯টি জেলায় তেভাগার আন্দোলন গ্রামের হিন্দু-মুসলিম কৃষকদের এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলেও ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রতিহত করার মত সাংগঠনিক ক্ষমতা কৃষকসভার ছিল না।[১০৩] তখন কংগ্রেস-লীগ বিরোধে রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক প্রশ্নসমূহ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হয়ে সমগ্র পরিবেশকে খুবই জটিল করে তোলে। তাই ১৯৪৬-১৯৪৭ খ্রীষ্টব্দের পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলের দিকে তাকালে আমরা হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের এক করুণ চিত্র দেখতে পাই। পূর্ববঙ্গের কোন কোন জেলায় মুসলমান কৃষকেরা হিন্দুর জমিজমা চাষ করতে অস্বীকার করে। কয়েকটি অঞ্চলে নমঃশূদ্র কৃষকদেরও প্ররোচিত করা হয় যাতে তারা বর্ণহিন্দুদের জমিজমা চাষ না করে। এই সময়ে বিভিন্ন কারণে হিন্দু-মুসলিম তিক্ততা গ্রাম্য জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। এই পরিবেশে কংগ্রেস কর্মীরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর নিকটে পত্র লিখে তাঁর পরামর্শ চান এবং তাঁকে তাঁদের কর্তব্য নির্দেশ করতে অনুরোধ করেন। জাতীয় ঐতিহ্যে লালিত এইসব

কংগ্রেস কর্মীরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হলেও, তাঁরা ঘটনার গতিকে নিজেদের আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হন। আর তাই তাঁরা এক গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হন। যে ভূমি ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষ ঘটে এবং যাঁদের মধ্য থেকে অসংখ্য আত্মত্যাগী রাজনৈতিক কর্মীর আবির্ভাব হয়, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমগ্র অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে।[১৫৪] অনেকদিন আগে বাঙালী সমাজকে এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে রক্ষা করবার জন্য প্রমথ চৌধুরী লেখেন : "সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে বাঙালী সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের সঙ্গে জমিদারের কো-অপারেশন-এর প্রয়োজন আছে, বিশেষত যখন বাংলার বেশিরভাগ জমিদার হিন্দু, আর বেশির ভাগ রায়ত মুসলমান।[১৫৫] কিন্তু বাংলাদেশের জমিদারেরা এই দিক থেকে সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেননি। তাঁরা ভূমি ব্যবস্থার মূল কাঠামোকে বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এমনকি ফ্লাউড কমিশনের নিকট সাক্ষ্যে জমিদারদের প্রতিনিধি স্যার বিজয় চাঁদ মহাতব ও ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী বলেন, যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব বিপন্ন করা হয়, তাহলে বাংলাদেশে এক সামাজিক অভ্যুত্থান হবে, যার ফলে কমিউনিজমের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে।[১৫৬] কিন্তু তাঁরা কখনই একথা উপলব্ধি করতে পারেননি যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটিয়ে নতুনভাবে কৃষি কাঠামো তৈরী করতে না পারলে সত্যিই এক অভূতপূর্ব সামাজিক-রাজনৈতিক আলোড়ন হবে, যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গোটা অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

সূত্রনির্দেশ

১. Mustafa Nurul Islam, Bengali Muslim Public Opinion As Reflected in the Bengali Press 1901-1930, Bangla Academy, Dacca, September, 1973, Chapters I-III.
২. Ibid, pp. 42-45, 107-108.
৩. Ibid, pp. 141-143.
৪. Ibid, pp. 143-144.
৫. Ibid, p. 109.
৬. Ibid, pp. 169-170.
৭. Ibid, pp. 170-171.
৮. Ibid, pp. 173-175.
৯. Ibid, pp. 198-200.
১০. Sedition Committee, 1918, Report, Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1918, p. 13 ; কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত, কলিকাতা, জানুয়ারী, ১৯৩৭, পৃষ্ঠা : ২৩৪-২৩৬, ২৫১
১১. প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৭, পৃষ্ঠা : ৫৭৮ ; নির্মলকুমার বসু, হিন্দুসমাজের গড়ন, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা : ১৪০-১৪২ ; R. C. Majumdar, History of the Freedom Movement in India, vol. II, Calcutta, 1963, Chapters I-II & IV ; Amales Tripathi, The Extremist Challenge, Chapters 3, 5-6 ; Kamruddin Ahmad, A Social History of Bengal, Dacca, 1970, p. 2 ; Mustafa Nurul Islam, op. cit., pp. 47-51.
১২. কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত, পৃষ্ঠা : ২৩৭
১৩. ঐ, পৃষ্ঠা : ২৪৯
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা : ২৪২-২৪৩
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা : ২৫৪
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা : ২৩৬ ; The Bengalee, 17 January, 1906, p. 3 ; Muin-ud-din Ahmad Khan, History of the Fara'idi Movement, pp. 141-142 ; Murray T. Titus, Islam in

India and Pakistan, pp. 194-195 ; মুজফ্ফর আহ্মদ: সমকালের কথা, কলিকাতা, আগস্ট, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা : ৬-৭

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী নতুন ভাইসরয় আর্ল অব মিণ্টোকে সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশনের পক্ষথেকে একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। এই সময়ে সরকারী ভবনে এই এসোসিয়েশনের যে সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন তা এখানে উল্লেখ করা হল : মৌলবী মুহম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর, আবুল হোসেন খান, মৌলবী সিরাজুল ইসলাম খান বাহাদুর, অনারেবল নবাব মমতাজউদ্দৌল্লা ফয়েজ আলি খান (সি. আই. ই), মৌলবী বুজলাল খান, মৌলবী মুসস্তফের খান (বি. এল), প্রিন্স মির্জ্জাকান্ত কাদের বাহাদুর, অনারেবল নবাব সৈয়দ মুহম্মদ বাহাদুর, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, প্রিন্স হবিবুজ্জমান, প্রিন্স দোরাজহের বাহাদুর, প্রিন্স আক্রাম হোসেন বাহাদুর, মৌলবী দেলওয়ার হোসেন খান বাহাদুর, মৌলবী সিরাজুল হক খান বাহাদুর, মোহনদোল হক, এ. আসগর, খোদা বক্স, মৌলবী আবদুল হামিদ, মৌলবী বদরুদ্দিন হায়দর খান বাহাদুর, মৌলবী মির্জ্জা মুহম্মদ মুস্থম, সৈয়দ আমির আলি (এম. এ.), মৌলবী আবদুল লতিফ, মুহম্মদ হাফিজ, মুহম্মদ ভাই, হাজি নূর মুহম্মদ জাকারিয়া, ইসমাইল খান মহম্মদ, নূর মহম্মদ ইসমাইল, হোসেন ভাই, হাজি শেখ বক্স এলাহি, মৌলবী ইবনা আহমেদ, মির্জ্জা সোজাথ আলি বেগ খান বাহাদুর, মৌলবী সৈয়দ আশরাফউদ্দিন খান বাহাদুর, মৌলবী আবদুল কাদের খান বাহাদুর, মৌলবী গোলাম রসিম খান বাহাদুর, মৌলবী আবদুল মজিদ খান বাহাদুর, নবাব সরফরাজ খান বাহাদুর, নবাব সৈয়দ বাদশা নবাব, কাজী মমতাজ-উদ্দিন, চৌধুরী মহম্মদ শেখ, আগা সৈয়দ হোসেন সোস্তানি, করমালিভাই হোসেন সোবে, মৌলবী শামসুল হুদা, মৌলবী সৈয়দ নাসিরুদ্দিন খান বাহাদুর, নবাব বাহাদুর সৈয়দ আমির হোসেন (সি. আই. ই.)। নবাব বাহাদুর সৈয়দ আমির হোসেন প্রতিনিধিদের ভাইসরয়ের সঙ্গে পরিচয় করে দেন এবং খান বাহাদুর মৌলবী মুহম্মদ ইউসুফ অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন। এই অভিনন্দনপত্রে বলা হয়, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য এই এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য হল সরকারের সাহায্যে ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতি সাধন করা। (Vide An Address presented to the Viceroy by the Central National Mahomedan Association, in The Bengalee, 17 January, 1906, p. 3). এই এসোসিয়েশনের নেতা নবাব বাহাদুর সৈয়দ আমির হোসেন স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলিম জনমত গঠন করেন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি তাত্রউনি আন্দোলনের নেতা ইংরেজ বিরোধিতার লাইন পরিহার করেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারেরা এই নীতি অনুসরণ করেন।

আর যাঁরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন: আবদুল রসুল (ব্যারিষ্টার), আবদুল হালিম গজনভী (পরে স্যার আবদুল হালিম গজনভী), মৌলবী মনিরুজ্জমান ইসলাম আবাদী, মৌলবী কাজেম আলি (কাজেম আলি মাষ্টার নামে খ্যাত ছিলেন), সৈয়দ ইসমাইল হোসায়ন সিরাজী, বর্ধমানের মৌলবী আবুল কাসেম, মৌলবী মুজিবর রহমান ('দি মুসলমান' নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকের সম্পাদক), মৌলবী মোহাম্মদ আকরম খাঁ ('আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক), পাটনার আলি ইমাম (পরে স্যার আলি ইমাম), তাঁর ভ্রাতা হাসসান ইমাম, মুজহারুল হক, ব্যারিষ্টার (পরে পাটনার সাদাকত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা), মৌলবী লিয়াকত হোসায়ন ও ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী প্রভৃতি (দ্রঃ সমকালের কথা, পৃষ্ঠা: ৭)

১৭. Mustafa Nurul Islam, op. cit., pp. 283-310. কাজী আবদুল মান্নান লেখেন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'আখবারে এসলামিয়া' প্রকাশিত হয়।

১৮. Ibid..

১৯. Ibid.

২০. Ibid.

২১. Ibid, Chapter VII

২২. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা: ৯৫

২৩. Mustafa Nurul Islam, op cit., pp. 50-51. কৃষ্ণকুমার মিত্র

লেখেন : "পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানেরা স্যার ব্যামফীল্ডের অনুরাগের পাত্র হইয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে নানা স্থানে গাত্রোত্থান করিল। তাহার ফলে ঢাকা, জামালপুর ও কুমিল্লার মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের রাজপুরুষগণও গবর্ণরের মতানুবর্ত্তী হইয়া মুসলমানদের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন।" (দ্রঃ আত্মচরিত, পৃষ্ঠা : ২৬১)

২৪. Mustafa Nurul Islam, op. cit., p. 55

২৫. Ibid, pp. 55-57

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন : "সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রথম পর্যায় (১৯০৪-১৯১৭) কঠোরভাবে হিন্দু ধর্ম-অনুশাসিত ছিল।…হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠাই তাঁদের অভিপ্রেত ছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আন্দোলন শুধু হিন্দু আন্দোলনও ছিল না, আসলে তা ছিল বর্ণ-হিন্দুদের আন্দোলন" (দ্রঃ সমকালের কথা, পৃষ্ঠা : ১০)

২৬. A Plea for the Publication of the Official Version, Editorial, in The Bengalee, 24 January, 1906, p. 3.

২৭. কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত, পৃষ্ঠা : ২৫৮-২৬০

২৮. Mustafa Nurul Islam, op. cit., pp. 198-203

২৯. An Address presented to the Viceroy by the Bengal Landholders' Association, dated 16 January, 1906, in The Bengalee, 17 January, 1906, p. 3. বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নতুন ভাইসরয় আর্ল অব মিণ্টোকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয় তাতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন : মহারাজা অব কাশিমবাজার, মহারাজা অব দ্বারভাঙ্গা, মহারাজা অব ময়মনসিংহ, মহারাজা অব দিনাজপুর, রাজা অব দীঘাপাতিয়া, রাজা অব দিমলা, মহারাজকুমার বুনওয়ারি আনন্দ, মহারাজকুমার শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব, লালমোহন ঘোষ, এ. চৌধুরী, এ. রসুল, এ. এইচ গজনভী, রাজা জানকী বল্লভ সেন, কুমার মন্মথ নাথ মিটার, রায় পশুপতি নাথ বসু, রায় সাহেব গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় পার্বতী শঙ্কর রায়, রায় বিজয়

সিংহ ধুধুরিয়া, মুরলীধর রায়, ভূপেন্দ্র নারায়ণ দত্ত, গোপাল দাস চৌধুরী, দ্বারকা নাথ চক্রবর্তী, চন্দ্রকান্ত ঘোষ, বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও সতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী। কাশিমবাজারের মহারাজা অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন। এই অভিনন্দন পত্রে বলা হয়ঃ "Owing to the beneficence of Permanent Settlement, Bengal has been a prosperous province."

৩০. মুজফ্ফর আহ্মদ, সমকালের কথা, পৃষ্ঠা ঃ ৬ ; আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন ১৯৭০, পৃষ্ঠা ঃ ২৭-২৮

৩১. Ramkrishna Mukherjee, The Dynamics of a Rural Society A Study of the Economic Structure in Bengal Villages, Akademie-Verlag-Berlin, 1957, pp. 6-7; Andre Beteille, Class Structure in an Agrarian Society: The Case of the Jotedars, in Society and Revolution: Essays in Honour of Engels, Delhi, 1971, এই প্রবন্ধে আন্দ্রে বেতেল জোতদার শ্রেণীর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন।

৩২. Ramkrishna Mukherjee, op. cit., pp. 10-12.

৩৩. ভবানী সেন, মুক্তির পথে বাংলা, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা ঃ ১১

৩৪. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১১-১২

৩৫. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০, ১২ ; শান্তিপ্রিয় বসু, বাংলার চাষী, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৫১।

৩৬. Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30, vol. I, Report, Calcutta : Bengal Government Press, 1930, Chapter II, p. 29.

৩৭. ভবানী সেন, মুক্তির পথে বাংলা, পৃষ্ঠা ঃ ৫

৩৮. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১২-১৩

৩৯. Report of the Land Revenue Commission Bengal, vol.I, With Minutes of Dissent, Bengal Government Press:

Alipore, 1940, p. 84 (Henceforth abbreviated as Report, vol. I, 1940); ভবানী সেন, মুক্তির পথে বাংলা, পৃষ্ঠা : ১০

৪০. Ibid, P. 82; ঐ, পৃষ্ঠা : ১৪

৪১. Note of Dissent by Dr. Radha Kumud Mookerjee, in Report, vol. I, 1940, pp. 311-348; ভবানী সেন, মুক্তির পথে বাংলা, পৃষ্ঠা : ১৪

৪২. R. Palme Dutt, India To-Day, Part II, Chapter V.; Nirmal Kumar Bose, Modern Bengal; pp. 26-30; ভবানী সেন, মুক্তির পথে বাংলা, পৃষ্ঠা : ১৫

৪৩. Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30, vol. I, Report, Chapter IV—Agricultural Indebtedness; ভবানী সেন, মুক্তির পথে বাংলা, পৃষ্ঠা : ১৫; R. Palme Dutt, op. cit., part III, Chapters VII-VIII. কৃষি সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রজনী পাম দত্তের গ্রন্থে রয়েছে।

৪৪. Sailendra Nath Sen, An Estimate of the Rural Indebtedness of Bengal, in Sankhya The Indian Journal of Statistics, Edited by P. C. Mahalanobis, Calcutta, vol. I, Parts 2 & 3, August, 1934, pp. 335-337; শচীন সেন, বাংলার রায়ত ও জমিদার, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১, পৃষ্ঠা : ২৭; R. Palme Dutt, op. cit.; Sirajul Islam, The Bengal Peasantry in Debt, 1904-1945, A paper read at a Seminar on 'The Life And Times of A. K. Fazlul Huq', in Dacca, on 12 November, 1973.

শৈলেন্দ্রনাথ সেন লেখেন যে, প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি কৃষি-ঋণের পরিমাণ খুবই কম করে দেখিয়েছে। কারণ পাঞ্জাবে মিঃ ডার্লিং (Mr. Darling) যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করায় তারা সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি

৪৫. ভবানী সেন, মুক্তির পথে বাংলা, পৃষ্ঠা : ১৫

৪৬. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিশাল বাঙ্গলা, কলিকাতা, আশ্বিন, ১৩৫২, পৃষ্ঠা : ৪৬-৪৭ : R. Plame Dutt, op. cit., Part III.

৪৭. Note of Dissent by Dr. Radha Kumud Mookerjee, in Report, vol. I, 1940, pp. 338-339.

৪৮. Ibid, p. 337 ; Note of Dissent by Sir Bijoy Chand Mahtab and Brajendra Kishore Roy Chowdhury, in Report, vol. I, 1940, pp. 227, 233 ; Birendra Kishore Roy Chowdhury, Permanent Settlement and After, Calcutta, June 1942, pp. 1—85, এইসব নোটে ও গ্রন্থে জমিদারী প্রথার সপক্ষে বক্তব্য পাওয়া যায়।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লাউড কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করে তা ছয়টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর পাঁচটি খণ্ডের পরিচয় এখানে দেওয়া হল : (১) Report of the Land Revenue Commission Bengal, vol. II, Appendices (I to IX) and Indian Land-System Ancient, Medieval and Modern, Bengal Govt. Press : Alipore, 1940 ; (২) Report of the Land Revenue Commission Bengal, vol. III, Landholders' replies to the questionnaire issued by the Land Revenue Commission and their Oral evidence, Bengal Govt. Press : Alipore, 1940 ; (৩) Report of the Land Revenue Commission Bengal, vol. IV, Landholders' replies to the questionnaire issued by the Land Revenue Commission, Bengal and their Oral evidence, Bengal Govt. Press : Alipore, 1940 ; (৪) Report of the Land Revenue Commission Bengal, vol. V, Replies to the Commission's questionnaire by Government officers and their oral evidence, Bengal Govt. Press : Alipore, 1941 ; (৫) Report of

the Land Revenue Commission Bengal, vol. VI, Replies to the Commission's questionnaire by the Associations Concerned with tenants, Bar Associations, etc., and their oralevidence, Bengal Govt. Fress : Alipore; 1941. ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর বাংলাদেশের সরকার ল্যাণ্ড রেভেনিউ কমিশন নিয়োগ করে। স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯ নভেম্বর থেকে কমিশন কাজ সুরু করে, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ মার্চ রিপোর্ট পেশ করে। এই কমিশনকে ফ্লাউড কমিশনরূপেও উল্লেখ করা হয়। কমিশনের মূল বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত প্রথম খণ্ডে আছে। কমিশনের বেশীর ভাগ সদস্য জমিদারী প্রথার অবসানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। তাঁরা প্রকৃত কৃষককে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীনে জমির অধিকারী করবার কথা বলেন। (দ্রঃ vol. I, p., 174)। তাছাড়া প্রথম খণ্ডে কমিশনের সদস্যদের নোটও রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের জমিদার ও মহাজনদের সমিতি, জমিদার-মহাজনদের পরিচয়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, মুসলিম চেম্বার অব কমার্স ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায় (দ্রঃ vol. II, pp. 18-21) তৃতীয় খণ্ডে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী, জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের বিষয়ে তথ্য আছে (দ্রঃ vol. III, pp, 134, 203-205)। জমিদারী প্রথার সপক্ষে বলতে গিয়ে জমিদারদের প্রতিনিধি রামমোহন রায়ের ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। এখানে রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফলের কথা বলেন (দ্রঃ vol. III, p. 159)। চতুর্থ খণ্ডেও জমিদারদের বক্তব্য রয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে সরকারী অফিসারদের মনোভাব জানা যায়। বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন শহরের ওকালতি পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা ভূমি সমস্যাকে কিভাবে দেখেন তার বিবরণ ষষ্ঠ খণ্ডে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে বার এসোসিয়েশনগুলোর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা সংগঠনে এঁরা ছিলেন শক্তিশালী অংশ। এই বার এসোসিয়েশনগুলোতে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। কেন ভূমি সমস্যার মৌলিক রূপান্তর সম্ভবপর হয় নি, তা

আলোচনা করতে হলে এই বার এসোসিয়েশনের ভূমিকাও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমি আলোচ্য প্রবন্ধে প্রধানতঃ এই বিরাট গ্রন্থের ছয়টি খণ্ডের তথ্যসমূহ ভিত্তি করেই বাংলাদেশের জমিদার-মহাজন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা আলোচনা করেছি।

৪৯. Report, vol. I, 1940, p. 71.

৫০. কৃষ্ণবিনোদ রায়, মন্বন্তরের পরিণতি ও পুনর্গঠনের পথ [বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা কর্তৃক বাংলা গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত পুনর্গঠন সম্পর্কিত স্মারকলিপির ভিত্তিতে রচিত খসড়া পরিকল্পনা], বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, নভেম্বর, ১৯৪৫, পৃষ্ঠা : ১৫-১৮, পরিশিষ্ট ; Ramkrishna Mukherjee, op. cit., pp. 38-39. কৃষ্ণবিনোদ রায় জমি হস্তান্তরের যে বিবরণ তাঁর পুস্তিকায় দেন তা এখানে উল্লেখ করা হল :

জমি হস্তান্তর

জেলা	১৯৩৯		১৯৪৩	
	হস্তান্তরের সংখ্যা (ভারতবর্ষীয় জমি রেজিষ্ট্রেশন আইন অনুযায়ী)	হস্তান্তরের সংখ্যা (বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী)	হস্তান্তরের সংখ্যা (ভারতবর্ষীয় জমি রেজিষ্ট্রেশন আইন অনুযায়ী)	হস্তান্তরের সংখ্যা (বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী
বর্ধমান	২৯,২০৭	২৭,৫৪৬	৫৫,৭১৭	৫৪,৫১৫
বীরভূম	১৯,০৬৭	১৮,১৩৪	৩১,৬৪৪	৩১,০৬৯
বাঁকুড়া	১২,৫৮৫	১১,৯৬৬	২৮,১৬৫	২৭,৫৫১
মেদিনীপুর	৫৯,৯৫৩	৫৯,১২০	১,১০,১৫৬	১,১২,৭৫০
হুগলী	১২,৪৩৬	১২,৩৭০	৩১,০৫১	৩০,৭৮২
হাওড়া	১১,৭৮৮	৯,৫৫৩	৩২,২২৪	৩০,৬১২
২৪ পরগণা	৩৬,৬৭৯	২৯,৯১৩	৯৫,৬৭৭	৮৯,১৯৮
কলিকাতা	১,৩৪৩	১১৭	১,৬১০	২১০

নদীয়া	৯,০৫৬	৭,৫৮৮	২০,৯৩০	১৮,৯১০
মুর্শিদাবাদ	১৫,৮৮৫	১৫,০৩৯	৪৭,৩৭৭	৪৭,১১৪
যশোহর	৯,৪৫২	৫,৬১০	১৯,১৩৭	১৪,৫০৭
খুলনা	১২,১০০	১০,৮৮৫	২৫,৬২৭	২৩,৮৮৭
ঢাকা	৫৩,৩৯৯	৫৯,৩২৩	১,৪১,৩৯৮	২,১৭,৩০৭
ময়মনসিং	৭৫,০১৯	৮৭,৫৩১	২,৫০,৭৮৪	২,৭৩,৫৮৮
ফরিদপুর	৩০,৫৪৩	৩০,৯২০	৮৯,৭৩৬	৮৯,৯৪৭
বাখরগঞ্জ	৩১,৬৪৩	৩৬,৭১৭	৬৭,৭৬২	৭১,৩৫৫
চট্টগ্রাম	৩৮,৬০৯	৩২,৩৮৩	৮৭,৫৩১	৭৪,১২৭
নোয়াখালি	৩০,২৪৩	২৬,৮০৫	৮২,৮৫১	৮১,৪৯০
ত্রিপুরা	৫৬,৬৬৬	৬১,৩৮৬	১,৫৯,৩৪৩	১,৮৪,৫৬৪
রাজশাহী	১২,৪৮৫	১৩,০৬৫	৪১,৫৬৪	৪২,৯৭২
দিনাজপুর	১৮,২৮৪	১৮,৯১৭	৪০,৮৫৭	৫১,৪৪৮
জলপাইগুড়ি	৫,৪৪৬	২৫৬০	১১,২১০	৬,২৪৪
রংপুর	২২,৪৬৯	২১,৪৯১	৮৩,৪১২	৮২,৭৩০
বগুড়া	১৬,৮৩১	২৩,৩৩৮	৪৮,০২০	৭৪,৬৪৩
পাবনা	২০,৬৫৫	২৩,৭৮৬	৫৯,৯৪৮	৮৬,৪৫১
মালদহ	১২,২৮০	১২,৩৭৬	২৪,৬৩৪	২৪,২৪৮
দার্জিলিং	৩৫২	—	৫৮৯	—
মোট	৬,৫৪,৮৭৫	৬,৭৮,৪৪৪	১৬,৯৮,০৩৪	১৮,৪২,২২১

(দ্রঃ মন্বন্তরের পরিণতি ও পুনর্গঠনের পথ, পরিশিষ্ট)

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সমস্ত জমি বিক্রি অথবা বন্ধক রাখা হয়, তার রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের সংখ্যা সরকারী তথ্যে

প্রকাশিত হয়। রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে তা এখানে উদ্ধৃত করা হল :

Year.	Number registered (in thousands)		Average value aper document (in Rs.)	
	Sold	Mortgaged	Sold	Mortgaged
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1930	25	51	292	182
1931	22	37	250	173
1932	24	34	217	162
1933	25	31	208	158
1934	30	35	183	129
1935	32	34	181	141
1936	34	35	179	137
1937	33	30	182	133
1938	41	16	178	175
1939	65	15	163	140
1940	65	76	185	125
1941	87	15	158	120
1942	88	10	172	110
1943	169	18	187	106

(vide Ramkrishan Mukherjee, op. cit., pp.38-39)

৫১. Karunamoy Mukerji, The Problems of Land Transfer, Visva-Bharati, 1957 ; Ramkrishna Mukherjee, op. cit., p. 39. কৃষি-অর্থনীতি, বিশেষ করে ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের পূর্বের ও

দুর্ভিক্ষের সময়ের অনেক তথ্য করুণাময় মুখোপাধ্যায় লিখিত গ্রন্থে আছে।

৫২. Famine Enquiry Commission Report on Bengal, 1945 ; P. C. Mahalanobis, Ramkrishna Mukherjea and Ambika Ghosh, A Sample Survey of After-Effects of the Bengal Famine of 1943, in Sankhya The Indian Journal of Statistics, Edited by P. C. Mahalanobis, Calcutta, vol. 7, part 4, July, 1946, p. 342. (Henceforth abbreviated as A Sample Survey) ; Tarak Chandra Das, Bengal Famine (1943). As revealed in a Survey of the Destitutes in Calcutta, University of Calcutta, 1949 ; Karunamoy Mukerji, Socio-Economic Survey of 49 Villages, Calcutta, 1952.

৫৩. A Sample Survey, Sankhya, vol. 7, Part 4, July, 1946, pp. 338-339.

৫৪. Ibid, P. 339.

৫৫. Ibid.

৫৬. Ibid, p. 340. স্ট্যাটিষ্টিক্যাল লেবরেটারী হতে অম্বিকা ঘোষ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের ৭৫ লক্ষ পরিবার জীবনধারণের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ পরিবার খুবই দরিদ্র ছিল। আর কৃষি হতে "উৎপন্ন আয়ের ১০ ভাগের এক ভাগ হাজার করা আড়াই জনের দখলে যায়। চাষের জমির শতকরা ৩৭.৮ ভাগ জমিদার-জোতদারদের খাস সম্পত্তি" ছিল। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট উল্লেখ করে ভবানী সেন লেখেন, সাধারণত ৫ একর জমি থাকলে একটি কৃষক পরিবারের সংসার চলে। কিন্তু বাংলাদেশের "২০ লক্ষ পরিবারের জমির পরিমাণ পরিবার পিছু ২ একর হইতে ৫ একরের মধ্যে এবং ৭৫ লক্ষ পরিবারের অর্দ্ধেক পরিবার ২ একরেরও কম জমির ভোগদখলকারী অথবা একেবারেই ভূমিহীন। প্রায় ১০ লক্ষ পরিবার হইল বর্গাদার।" (দ্রঃ ভবানী সেন, বঙ্গভঙ্গ ও

পাকিস্তান, কলিকাতা, মে, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা : ২৪-২৫)। কৃষকের দুরবস্থা কতটা প্রকট ছিল তা এই ভূমি ব্যবস্থা থেকে বোঝা যায়।

৫৭. কৃষ্ণবিনোদ রায়, মন্বন্তরের পরিণতি ও পুনর্গঠনের পথ, পৃষ্ঠা : ৩৪-৩৯। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় জমি হস্তান্তর আইন (অস্থায়ী বিধান) ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে কৃষক সভার তৎকালীন নেতা ও আইনজ্ঞ কৃষ্ণবিনোদ রায় বিস্তারিতভাবে এই পুস্তিকায় আলোচনা করেছেন।

৫৮. A Sample Survey, Sankhya, Vol. 7, Part 4, July, 1946, p. 341.

৫৯. Ibid ; K. P. Chattopadhyay, Famine and Destitution in Rural Bengal, in Science And Culture A monthly Journal of Natural and Cultural Sciences, Calcutta, November, 1945, Vol. XI, No. 5, pp. 228-239 ; কৃষ্ণবিনোদ রায়, মন্নন্তরের পরিণতি ও পুনর্গঠনের পথ, পৃষ্ঠা : ৯-১২ ; Tarak Chandra Das, op. cit., pp. 137-139.

যে সব পরিবারের জীবিকা দান বা ভিক্ষার উপর নির্ভর করে, তাদের নিঃস্ব পরিবাররূপে উল্লেখ করা হয়। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার নিঃস্বদের যে জীবিকা ছিল সেদিক দিয়ে বিচার করলে কৃষক, ক্ষেতমজুর, তন্তুবায়, মৎস্যজীবী প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন উপজীবিকার লোকের কিরূপ ক্ষতি হয় তার এক চিত্র নিম্নের তথ্য থেকে পাওয়া যায় :

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের উপজীবিকা	নিঃস্ব পরিবার সংখ্যা	নিঃস্ব লোক সংখ্যা
কৃষি	২৯,০০০	৯০,০০০
কৃষি ও মজুরী	১৫,০০০	৪৯,০০০
খেতমজুরী	৬৭,০০০	১,৯৯,০০০
নিজহস্তে চাষ করেন না এইরূপ কৃষিজীবী	৬,০০০	২৭,০০০
মৎস্যজীবী	১৭,০০০	৬৭,০০০
তন্তুবায় প্রভৃতি	১৮,০০০	৫৬,০০০
ধানভানা	২,০০০	৬,০০০
যানবাহন	৩,০০০	৮,০০০
ব্যবসা	১০,০০০	৪০,০০০
শিক্ষক প্রভৃতি চাকরিজীবী	১০,০০০	৪৪,০০০
(খেতমজুর ব্যতীত) গ্রাম্য মজুর	৪,০০০	১১,০০০
বিবিধ	৫,০০০	১৪,০০০
কোন কাজ কত	১,৬১,০০০	৪,৬৫,০০০
	৩,৪৭,০০০	১০,৭৬,০০০

(দ্রঃ কৃষ্ণবিনোদ রায়, মন্বন্তরের পরিণতি ও পুনর্গঠনের পথ, পৃষ্ঠা : ১২)

কৃষ্ণবিনোদ রায় লেখেন যে, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দুভিক্ষের পরে মোট ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার নিঃস্ব পরিবার ও ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার নিঃস্ব লোক ছিল। অবশ্য তিনি নিঃস্ব সম্পর্কিত তথ্যসমূহ ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ থেকে নিয়েছেন। (দ্রঃ ঐ, পৃষ্ঠা : ৯-১০)

৬০. A Sample Survey, Sankhya, vol. 7, part 4, July, 1946, p. 342.

৬১. পীপল্‌স্ রিলিফ কমিটির বিবরণ। ভবানী সেন তাঁর পুস্তিকায় উদ্ধৃত করেন (দ্রঃ মুক্তির পথে বাংলা, পৃষ্ঠা : ৫)

৬২. কৃষ্ণবিনোদ রায়, মন্বন্তরের পরিণতি ও পুনর্গঠনের পথ, পৃষ্ঠা : ২২। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন করুণাময় মুখোপাধ্যায় লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায় [See Karunamoy Mukerji, Agriculture, Famine and Rehabilitation in South Asia (A Regional Approach), Visva-Bharati, August, 1965.]

৬৩. কালীচরণ ঘোষ, ভারতের পণ্য, তন্তু, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪৭, পৃষ্ঠা : ১৬-২৭

৬৪. Files of The Bengalee, January-June, 1906 ; W. H. Thompson, Census of India, 1921, vol.v, Bengal, part I, Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1923, pp. 413-414 ; Report on the Administration of Bengal 1923-24, Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1925, part I, p. xi ; Report of the Administration of Bengal 1929-30, Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1931, part I, pp. xxv, xxvii-xxviii ; আনওয়ার হোসেন, 'মুসলমানের আর্থিক সমস্যা', প্রবন্ধ, 'শিখা', চৈত্র ১৩৩৩ ; মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'সমস্যা ও সমাধান', প্রবন্ধ, 'মাসিক মোহাম্মদী', শ্রাবণ, ১৩৩৫ ; আবদুল মজিদ, 'সুদ সমস্যা', প্রবন্ধ, 'মাসিক সওগাত', শ্রাবণ, ১৩৩৫ ; সাদাত আলী-আখন্দ, 'জীবন বীমা', 'প্রবন্ধ, 'মাসিক সওগাত', আশ্বিন, ১৩৩৬ ; 'বাংলার মহাজন', প্রবন্ধ, 'মাসিক মোহাম্মদী', ভাদ্র, ১৩৩৭ ; Mustafa Nurul Islam, op. cit., pp. 198-217.

১৯০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে যেসব মুসলমান সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের পরিচয় 'বেঙ্গলী' কাগজে প্রকাশিত 'গেজেটে' পাওয়া যায়। এই সময়ে তাঁরা অনেকেই দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম পত্র-পত্রিকা লক্ষ্য

করলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক জীবনে হিন্দুদের প্রাধান্যের ফলে মুসলমানেরা খুবই উদ্বিগ্ন হন। এই বিষয়ে 'নবনূর', 'ইসলাম-প্রচারক', 'আল্-এসলাম' (মাসিকপত্র, ১৯১৫-১৯২১, কলিকাতা), 'ছোলতান' (বাংলা ১৩৩০ সাল), 'শিখা', 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', প্রভৃতি মুসলিম পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়। তাঁরা মুসলমানদের আর্থিক দুরবস্থা প্রতিকারের পথও উল্লেখ করেন। মুসলমানেরা যাতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারেন, সেজন্য এইসব কাগজ তাঁদের উৎসাহিত করে। তাছাড়া এইসব কাগজ বাঙালী হিন্দু জমিদার-মহাজন-ব্যবসায়ীদের ও মারওয়াড়ী ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে মুসলমানদের আর্থিক দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরে। এইসব কাগজে মন্তব্য করা হয়, মুসলমানদের দূরদৃষ্টির অভাবেই হিন্দুদের আর্থিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলিম শ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পের ক্ষেত্রেও মুসলমানেরা অংশ গ্রহণ করছেন। আর তাঁরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে 'মুসলিম চেম্বার অব কমার্স' গঠন করেন। ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আবদুল হালিম গজনভী 'মুসলিম চেম্বার অব কমার্স'এর সভাপতি ছিলেন। মুসলমান জমিদারেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করছেন এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। তাছাড়া 'ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সে' মুসলমান ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের অংশ নিতে দেখা যায়। (Vide Report of the Land Revenue Commission, Bengal, vol. II, p 18; see my paper entitled 'Sir Abdul Halim Ghuznavi', in The Dictionary of National Biography, Edited by S. P. Sen, vol. II, Calcutta, 1973).

৬৫. মুজফ্ফর আহ্মদ, ভারতের কৃষক-সমস্যা, কলিকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মে, ১৯৪৩, পৃষ্ঠা : ১-৮০। কৃষক সভা ভূমি সমস্যাকে কিভাবে দেখে সে বিষয়ে অনেক তথ্য এই পুস্তিকায় আছে। পুস্তিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে।

৬৬. Report of the Land Revenue Commission Bengal, vols. I-VI, Calcutta, 1940-41.

৬৭. আবুল মনসুর আহমদ, রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, অধ্যায় ৩-১৩; অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক।

৬৮. J. H. Hutton, Census of India, 1931, vol. I, India, Part I, Report, Delhi, 1933, p. 390.

৬৯. Ibid.

৭০. M. W. M. Yeatts, Census of India 1941, vol. I India, Part I, Tables, Simla, 1943, pp. 102-103; মীনেন্দ্র নাথ বসু, বাঙালীর পরিচয়, কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৫২, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮; Amiya Kumar Bagchi, Private Investment in India 1900-1939, p. 430, in footnote No. 27.

বিভিন্ন সেন্সাস রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে নৃতত্ত্ববিদ মীনেন্দ্রনাথ বসু দেখান, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের শতকরা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৪২.০ ও ৫৪.৩। এই সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু ও মুসলমান লোকসংখ্যা হিসেবে শতকরা কতটা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তার পরিচয় দিয়ে তিনি এই তালিকাটি প্রস্তুত করেন:

স্থান	বৎসর						
	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
পূর্ব্ববঙ্গ							
হিন্দু	৩৬	৩৪	৩৩	৩১	৩০	২৮	২৭
মুসলমান	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭০	৭১	৭২
উত্তরবঙ্গ							
হিন্দু	৪০	৪০	৩৯	৩৭	৩৫	৩৬	৩২
মুসলমান	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬১	৬২
মধ্যবঙ্গ							
হিন্দু	৫০	৫০	৫০	৫০	৫১	৫১	৫৩
মুসলমান	৪৯	৪৯	৪৯	৪৮	৪৭	৪৭	৪৫
পশ্চিমবঙ্গ							
হিন্দু	৮৪	৮৩	৮৩	৮২	৮২	৮৩	৭৯
মুসলমান	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৪	১৪

(দ্রঃ বাঙালীর পরিচয়, পৃষ্ঠা : ৫৭-৫৮)

৭১. P. C. Mahalanobis, Distribution of Muslims in the Population of India. in Sankhya, vol. 7, Part 4, July, 1946, P. 430,

৭২. A. K. Bagchi, op. cit.,p. 430.

৭৩. Tarak Chandra Das, op. cit., pp. 101-102.

৭৪. Ibid, p. 102.

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর ইত্যাদি রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে বহুলোক মারা যায় (vide "Forward', 1 November, 1925, p. 3 ; Wednesday, 25 November, 1925, p. 6 (After C. R. Das's death P. K. Chakrabarti became the editor of 'Forward').

৭৫. Jatindra Mohan Datta (Fellow of the Royal Statistical Society), 'Continued Abduction of Hindu Women—Its effect on the growth of the Bengloe Hindus', in The Modern Review, Calcutta, October, 1941, pp. 358-359 ; 'প্রবাসী', পৌষ, ১৩২৯, পৃষ্ঠা : ৪২৯-৩২ ; ফাল্গুন, ১৩২৯, পৃষ্ঠা : ৭২৯ ; শ্রাবণ, ১৩৩৩, পৃষ্ঠা : ৭১৩ ; আর কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাসমূহ। 'মডার্ণ রিভিউ', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী' প্রভৃতি মাসিকপত্রে জনসংখ্যার বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ ও খবর প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রমোহন দত্ত তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে প্রকাশিত 'লাল ইস্তাহার বা রেড সার্কুলার'এর কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়া তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির তুলনামূলক আলোচনাও এই প্রবন্ধে করেন।

৭৬. S. G. Panandikar, The Wealth and Welfare of the Bengal Delta, pp. 231-233.

৭৭. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিশাল বাঙ্গলা, পৃষ্ঠা : ৩৯-৪৩ ; মীনেন্দ্রনাথ বসু, বাঙালীর পরিচয়, পৃষ্ঠা : ৫১, ৫৮।

৭৮. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিশাল বাঙলা, পৃষ্ঠা : ৩৬-৩৭

৭৯. ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৭-৩৮

৮০. ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৮-৪১

৮১. ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৯, ৪২-৪৩

৮২. ঐ, পৃষ্ঠা : ৫০-৫১

৮৩. Kshitish Prasad Chattopadhyay, 'Effect of Bride-Price and Dowry on Marital Condition Among Hindus of Bengal', in The Modern Review, October, 1941, pp 360-363.

হিন্দু বিধবার সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করলে হিন্দু সমাজের ক্ষয়ের একটি কারণ বোঝা যায়। এই বিষয়ে অনেক তথ্য প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ মাসিক পত্রে পাওয়া যায় (দ্রঃ প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৩, পৃষ্ঠা : ৪১৮-১৯ ; কার্তিক, ১৩২৩ ; ভাদ্র, ১৩২৫ ; প্রবাসী, পৌষ, ১৩২৯, পৃষ্ঠা : ৪৩০-৩১ ; বৈশাখ, ১৩৩২ ; আশ্বিন, ১৩৩৩, পৃষ্ঠা : ৯৯১)

৮৪. A. E. Porter, Census of India, 1931, vol. V, Bengal & Sikkim, Part I, Report, Calcutta : Central Publication Branch, 1933, Appendix III, pp. 501, 528 ; Files of Forward, 1924-25, Forward, Wednesday, 9 April, 1924, p. 7 ; Thursday, 24 April, 1924, p. 6 ; Thursday, 5 November, 1925, p. 5 ; নির্মলকুমার বসু, হিন্দু সমাজের গড়ন, পৃষ্ঠা : ১৪০-১৪২ ।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় সমগ্র বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা ৩৭ ভাগ ছিল তপশীলী হিন্দু। আর নমঃশূদ্রের মধ্যে যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাঁদের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। এই সেন্সাস রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় : "The present number of the Namasudras, large as it is, is only a moiety of their actual number as undoubtedly a large percentage has dropped off by conversion to Islam" (Vide A. E. Porter, op. cit., pp 501, 528). ঢাকা, ফরিদপুর,

বাখরগঞ্জ, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলার এক বৃহৎ অংশে নমঃশূদ্রের বসতি ছিল। উচ্চবর্ণ হিন্দুদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে নমঃশূদ্ররা নিজেদের হিন্দুসমাজ হতে পৃথক জাতি হিসেবে অস্তিত্ব দাবি করেন ও সরকারের নিকট হতে অনুগ্রহলাভের চেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষালাভ করেন তাঁরাই এই দাবি তোলেন এবং নমঃশূদ্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। নমঃশূদ্রদের একটি প্রতিষ্ঠানের নাম হল 'নমঃশূদ্র হিতৈষণী সমিতি'। তাঁরা 'পতাকা' ও 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' নামে পত্রিকাও প্রকাশ করেন। (দ্রঃ নির্মলকুমার বসু, হিন্দু সমাজের গড়ন, পৃষ্ঠাঃ ১৪১-১৪২)। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরওয়ার্ড কাগজে পূর্ববঙ্গে নমঃশূদ্রদের অবস্থা সম্পর্কে একটি পত্র প্রকাশিত হয়। তাতে জানা যায়, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে নমঃশূদ্ররা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে উদ্যোগী হন এবং খ্রীষ্টান মিশনারীরাও খুবই তৎপর হন। সিরাজগঞ্জ থেকে নমঃশূদ্ররা তাঁদের অভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করে 'প্রতিনিধি' নামে একখানি কাগজ প্রকাশ করেন। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নমঃশূদ্ররা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকার রক্ষায় তৎপর হন। (Vide Forward, 9 April, 1924, P. 7).

হিন্দুসমাজের দুর্বলতার কথা চিন্তা করে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে, বিধবা বিবাহের প্রচলন করে ও অস্পৃশ্যতা দূর করে হিন্দু সমাজের দুর্বলতা দূর করতে সচেষ্ট হন। এই বিষয়ে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন (দ্রঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জাতিভেদ সমস্যা, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩২৭ ; ফণীন্দ্রনাথ বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩, পৃষ্ঠাঃ ৮৩-৮৯, ১২৫-১২৭)। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পূর্ববঙ্গের কয়েকটি স্থানে জাতীয় শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, অস্পৃশ্যতা ও খদ্দর ইত্যাদি বিষয়ে ভাষণ দেন এবং এইসব সভায় বহুসংখ্যক হিন্দু উপস্থিত হন (Vide Forward, Friday 11 April, 1924, P. 5)। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল সোস্যাল রিফর্ম লীগ' হিন্দু সমাজের দুর্বলতার বিভিন্ন কারণ ও তার প্রতিকারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। (Vide Forward, Tuesday, 18 August, 1925, p. 9)।

সমাজ-সংস্কারক মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য (দ্রঃ অমলেন্দু দে, মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়)। পূর্ববঙ্গে নমঃশূদ্ররা যাতে ধর্মান্তরিত না হন তার জন্য হিন্দু মহাসভা ও হিন্দুসমাজের কোন কোন অংশের তৎপরতাও দেখা যায়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'লিবারেল নমঃশূদ্র এসোসিয়েশন'এর পক্ষ থেকে ঢাকার করোনেশন পার্কে পণ্ডিত কাশীগোপাল শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জনাকীর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিরাজগঞ্জের বহুসংখ্যক নমঃশূদ্র খ্রীষ্টান ধর্মগ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। এই ধর্মান্তকরণ কিভাবে বন্ধ করা যায়, তাই ছিল এই সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় (Vide Forward, 9 April, 1924, p. 7 ; 24 April, 1924, p. 6). এই সময়ে হিন্দু সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য 'হিন্দু-হিত-সাধিনী সভা,' উদ্যোগী হয়। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের নিয়ে সাভ্রোসিয়ার অস্পৃশ্য দাস সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হতে সামান্য জল-খাবার গ্রহণ করে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন (Vide Forward, 5 November, 1925, p. 5). বলাবাহুল্য, এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ে।

গ্রামবাংলায় নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের সামাজিক জীবন আলোচনা করলে দেখা যায়, এখনও তাঁদের মধ্যে এমন সব সম্প্রদায় আছে যাঁরা হিন্দু অথবা মুসলিম সমাজের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যেতে পারেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া বা চিত্রকর সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রধানতঃ বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, চব্বিশপরগণা, কলিকাতা, হাওড়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় পটুয়াদের বসতি আছে। এইসব জেলার কোন কোন স্থানে পটুয়ারা নিজেদের মুসলমান অথবা হিন্দু বলে পরিচয় দেন। আবার তাঁদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় প্রকারের নাম রাখার প্রচলনও দেখা যায়। আর তাঁরা যেসব আচরণ-বিধি অনুসরণ করেন তাতে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বীরভূম

জেলার পটুয়াদের বিষয়ে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেন তা থেকে জানা যায়, হিন্দু সমাজের অবহেলার ফলেই বীরভূমের পটুয়ারা ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই জেলার অধিকাংশ পটুয়া নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেন। বীরভূমের মুসলমানদের নিকট হতে পটুয়ারা যে সহানুভূতি ও সাহায্যলাভ করেন তার ফলেই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশভাগের পরেও কিভাবে বীরভূমের পটুয়া সম্প্রদায়ের ওপর ইসলামীয়করণ আন্দোলনের প্রভাব পড়ে তা লক্ষ্য করার বিষয়। (Vide Binayendra Narayan Bhattacharyya, 'Patuas—A Study on Inter-Cultural Oscillation', An Unpublished Research Work).

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা অনেকটা হ্রাস পায় তখনও পটুয়ারা স্বেচ্ছায় যেভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তা থেকে অনুমান করা যায়, যখন অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা আরও কঠোর ছিল তখন নিম্নশ্রেণীর অবহেলিত হিন্দুরা বা উপজাতীয় অধিবাসীরা আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের আশায় যে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে তাতো খুবই স্বাভাবিক। মুসলিম শাসনকালে বিভিন্ন অঞ্চলে সেনাবাহিনী নিযুক্ত থাকায় ও পরবর্তীকালে বিভিন্নকারণে বলপ্রয়োগের ফলে অনেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেও, হিন্দু সমাজের নিদারুণ অবহেলায় বৃহৎসংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দুদের স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার বিষয়টি মোটেই উপেক্ষা করার নয়।

৮৫. 'মাসিক মোহাম্মদী' কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ।

৮৬. W. W. Hornell, Bengal. Committee on Muhammadan Education, 1914. Report of the Committee appointed bv the Bengal Government, Calcutta, 1915 ; Hornell's Bengal Education Report, in The Modern Review, May, 1921, pp. 686-687.

৮৭. Report on the Administration of Bengal 1923-24, Part II, Chapter VII, p. 139.

৮৮. Report of the Administration of Bengal 1929-30, Part II, Chapter VII, pp. 173, 175, 177.

৮৯. Ibid, p. 177.

৯০. Syed Nawab Ali Chaudhuri, Vernacular Education in Bengal ; (being a speech delivered at the Thirteenth Session of the Mahomedan Educational Conference), Calcutta : Newman, 1900 ; Sir Muhammad Azizul Haq, History and Problems of Moslem Education in Bengal, Calcutta : Thacker, Spink, 1917 ; 'Mahomedan Eduoation in Calcutta', an article in The Calcutta Municipal Gazette, April, 1926 ; মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'মুসলমানদের শিক্ষা-সমস্যা', প্রবন্ধ, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৫ ; প্রবাসীতে প্রকাশিত আরও তথ্য, দ্রঃ আষাঢ়, ১৩৩২ ; ফাল্গুন, ১৩৩৩ ; Muhammad Qudrat-i-Khuda (Edited), Bengal Education Week, Calcutta, 1936. Proceedings. Working Committee of the Bengal Education Week, Calcutta, 1937, 2v. Text in English & Bengali ; Syed Murtaza Ali, 'Muslim Education in Bengal 1837-1937' (Journal and Year of publication not mentioned).

৯১. কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃষ্ঠা : ৩৪৫-৩৪৯

৯২, ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৫৫

৯৩, রামপ্রাণ গুপ্ত, মোগল বংশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা ১৩২২। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫১৬। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই গ্রন্থের অধিকাংশ অধ্যায়ের ভাষা বিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করার বিষয়ে লেখককে সাহায্য করেন।

৯৪. The Bengalee, Saturday, 16 June, 1906, p. 3.

৯৫. Kamruddin Ahmad, op. cit., Chapter I ; Mustafa Nurul Islam, op, cit.

৯৬. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি কথা, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৫, পৃষ্ঠা : ১৭-২১

৯৭. 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার ফাইল।

৯৮. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, কাজী নজরুল, পৃষ্ঠা : ৬০

৯৯. ঐ, পৃষ্ঠা : ৬১

১০০. 'সওগাত' পত্রিকার ফাইল।

১০১. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, কাজী নজরুল, পৃষ্ঠা : ১১১

১০২. ঐ, পৃষ্ঠা : ২৮৬-৩০৪, ৩৪৪.

১০৩. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, কলিকাতা, পৌষ, ১৩৬৩, পৃষ্ঠা : ১৯৪-১৯৬ ; Kazi Abdul Wadud, Creative Bengal, Calcutta : Thacker & Spink, 1950.

১০৪. Forward, Tuesday, 8 April, 1924, p, 4 ; Friday, 11 April, 1924, p. 4

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ এপ্রিলের 'ফরওয়ার্ড' কাগজে নজরুল সম্বর্ধনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন : চিত্তরঞ্জন দাশ, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, মৃণাল কান্তি বসু, প্রফুল্ল কুমার সরকার, কুমার শিব শেখরেশ্বর রায়, গিরিজা কুমার বসু, দেবকুমার রায় চৌধুরী, নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, হৃষিকেশ মিত্র প্রভৃতি। কবি নজরুলকে মাল্যভূষিত করা হয় ও কয়েকখানি গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়। অতুলচন্দ্র সেন লেখকরূপে কবির অবদান ও দেশের জন্য তাঁর স্বার্থত্যাগের কথা উল্লেখ করে ভাষণ দেন।

১০৫. 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাহেব বর্তমানে ঢাকায় আছেন। তিনি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখনও তা প্রকাশিত হয়নি। তাঁর এই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে আমি এইসব তথ্য সংগ্রহ করেছি।

১০৬. 'মাসিক মোহাম্মদী'র ফাইল।

১০৭. 'মাসিক মোহাম্মদী', আশ্বিন, ১৩৩৬, পৃষ্ঠা : ৭৪০-৭৪১

১০৮. ঐ, ফাল্গুন, ১৩৪২ ; চৈত্র, ১৩৪২, পৃষ্ঠা: ৪২৪-৪২৬

১০৯. ঐ, ৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

১১০. ঐ ৯ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৩

১১১. ঐ, ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৪৩, পৃষ্ঠা : ৪১-৪৭

১১২. ঐ

১১৩. ঐ, ৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪২

১১৪. সরদার ফজলুল করিম (সম্পাদনা), পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, চৈত্র, ১৩৭৪ (মার্চ, ১৯৬৮), পৃষ্ঠা : ৫৪

১১৫. ঐ, পৃষ্ঠা : ৪৬

১১৬. ঐ, পৃষ্ঠা : ৬৩

'জাতীয়ভাব—ভারতবর্ষে মুসলমান' নামক প্রবন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লেখেন, "ইংলণ্ডেও যেমন ধর্ম্মভেদ জাতীয় ভাবের ব্যাঘাত করিতেছে না, ভারতবর্ষেও সেইরূপ হইয়া আসিতেছে। এখানকারও হিন্দু এবং মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়া মিলিবে। হিন্দু এবং মুসলমান যে মিলিবে, তাহার সূত্রপাত অনেক দিন হইতেই হইয়া আসিতেছে" [দ্রঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সামাজিক প্রবন্ধ, বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফাণ্ড : চুঁচুড়া, সপ্তম সংস্করণ, ১৩৫৫ সাল, পৃষ্ঠা : ১১-১৩ (প্রথম প্রকাশ ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯২)]। কিভাবে দীর্ঘকাল পাশাপাশি থাকার ফলে ও বিবাহ বন্ধনের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের নিকটবর্তী হন এবং এই দেশে ভারতীয় মুসলমানেরা অন্যান্য দেশের মুসলমানদের চেয়ে একটি পৃথক সত্তায় পরিণত হন তার বিবরণ দিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লেখেন : "...এই ব্যাপার বহু শতাব্দী হইতে পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিয়া এক্ষণে ভারতবাসী মুসলমানমাত্রকে আফগান, পারস্য, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি সকল দেশের মুসলমান হইতে একটী বৈচিত্র্য প্রদান করিয়াছে—ইহারা আকার প্রকারে ভারতবাসী হিন্দুর যত সদৃশ হইয়াছেন, বহিঃস্থ কোন জাতীয় মুসলমানের আর তত সদৃশ নাই।...বস্তুতঃ ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বিভিন্নতা জন্য তীব্র বিদ্বেষ বেশী দিন থাকে না। বর্ণভেদ প্রণালী গ্রাহ্য থাকায়

এখানে বৈবাহিক বিষয়ে ও আহারাদিতে মিলন না থাকিয়াও লোকের সহানুভূতি রক্ষিত হওয়া চিরাভ্যস্ত। জৈন এবং শিখদিগকে যেমন সাধারণ হিন্দু সমাজের সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, কালে এখানকার মুসলমানেরাও যে ভারত সমাজের মধ্যে একটা বর্ণবিশেষ রূপেই লক্ষিত হইবেন তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" (দ্রঃ ঐ, পৃষ্ঠা, ১৩-১৪)। এই প্রবন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইংরেজের ভেদ-নীতির সমালোচনা করেন। (ঐ, পৃষ্ঠা : ১২-১৬)।

১৩৩৮ সালে 'শিখা' পত্রিকা 'স্বাধীন ভারতের দাস' নামক প্রবন্ধে লেখেন : "ভারতীয় জাতীয়তার যে আদর্শ হিন্দু গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ হিন্দু জাতীয়তা, তাহাতে স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট অন্য সম্প্রদায়ের স্থান নাই। পরলোকগত ভূদেববাবু তাঁহার 'সামাজিক প্রবন্ধে' হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক ছবি আঁকিয়াছেন। এই জটিল সমস্যায় তিনি যে সমাধান করিয়াছেন তাহা মৌলিক না হইলেও খুবই উপদেশব্যঞ্জক। তাঁহার মতে, 'জৈন ও শিখদিগকে যখন সাধারণ হিন্দু সমাজের অন্তর্নি-বিশিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, কালে এখানকার মুসলমানেরাও যে ভারত সমাজের মধ্যে একটি বর্ণবিশেষ রূপে লক্ষিত হইবে তাহার বিশেষ সম্ভাবনা'।" (দ্রঃ সরদার ফজলুল করিম, পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, পৃষ্ঠা : ৬৩)

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের প্রতি 'শিখা' পত্রিকা যে নরম মনোভাব ব্যক্ত করে তাকেও স্বাভাবিকভাবে শিক্ষিত মুসলমানদের একটি অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা মনে করেন ভূদেববাবুর লেখায় বলা হয়েছে, "বাঙালী মুসলমানকে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে হলে হিন্দুত্বে অন্তর্লগ্ন হতে হবে।" স্বভাবতই তাঁরা এই মনোভাবের বিরোধী ছিলেন। (দ্রঃ ঐ)

১১৭. সরদার ফজলুল করিম, পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, পৃষ্ঠা : ৪৮-৫০

১১৮. 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার ফাইল (১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট পর্যন্ত)। এই পত্রিকার, মাসিক ও সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সম্পাদক ও বাংলাদেশের প্রখ্যাত

মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আকরম খাঁর ভূমিকা সম্পর্কে এখনওকোন প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। ১৯৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজি বিভাগের ছাত্র মহীউদ্দিন হায়দার তাঁর এম. এ. পরীক্ষার থিসিস পেপারে মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর থিসিস পেপারের শিরোনামা হল: 'A Sociological Study on Maulana Akram Khan. এই থিসিসে Theoretical ও Historical Analysis এবং Thought Structure সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ নাজমুল করিম আমাকে এই থিসিস পেপার ব্যবহার করতে অনুমতি দেওয়ায় আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

১১৯. 'মাসিক মোহাম্মদী'র ফাইল ; 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার ফাইল (মার্চ, ১৯৪০-১৯৪৭ খ্রী) ; সরদার ফজলুল করিম, পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য।

১২০. 'মাসিক মোহাম্মদী', আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১ সাল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ ও ২ জুলাই কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ হলে পূর্ব্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের ভাষণসমূহ ও কার্যবিবরণী 'মাসিক মোহাম্মদী'র এই তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সরদার ফজলুল করিম তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে কয়েকটি ভাষণ মুদ্রিত করেছেন। 'মাসিক মোহাম্মদী'তে দেখতে পাই রেনেসাঁ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সুশোভন চন্দ্র সরকার এবং শিল্প ও সঙ্গীত শাখার সভাপতি ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। উল্লেখযোগ্য এই, পূর্ব্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির একটি সভায় সাহিত্যিক গোপাল হালদার 'পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান সমস্যা' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১২১. ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা মুসলিম হলে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ভাষণ (দ্রঃ সরদার ফজলুল করিম, পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, পৃষ্ঠা : ১২৪)।

১২২. ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ হলে আবুল মনসুর আহমদ এর ভাষণ (দ্রঃ ঐ, পৃষ্ঠা : ১৪৬)

১২৩. ঐ, পৃষ্ঠা : ১৩৮

১২৪. Report on the Administration of Bengal 1922-23, Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1924, pp. xv, xxiv ; The Calcutta Municipal Gazette, June, 1925 ; R. C. Majumdar, History of the Freedom Movement in India, Vol. III, Calcutia, 1963, p. 220. ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে চিত্তরঞ্জন দাশ কাউন্সিলে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী স্বরাজ্য পার্টি যে ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে তাতে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে স্বতন্ত্র পথে চলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় (Vide Report on the Administration of Bengal 1922-23)

১২৫. Report on the Administration of Bengal 1923-24, Part I, pp. i-ii ; Maulana Abul Kalam Azad, 'A Study of Deshabandhu Das', an article, in Forward, Saturday 18 July, 1925, p. 10 ; Maulana Abul Kalam Azad, India Wins Freedom An-Autobiographical Narrative, Calcutta, August 1964, pp. 20-21 ; R. C. Majumdar, op. cit, Vol. III, pp. 281-282. ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জুলাই 'ফরওয়ার্ড' কাগজে প্রকাশিত মৌলানা আজাদের তথ্যবহুল প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, 'বেঙ্গল-প্যাক্ট' নামক বিখ্যাত দলিল রচনাকালে চিত্তরঞ্জন দাশের মনে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিল না। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন এই পথেই হিন্দু-মুসলিম বিরোধ মীমাংসা করা সম্ভব।

১২৬. Report on the Administration of Bengal 1923-24, Part I, pp. ii-iii ; Hon'ble Maulvi Abdul Karim (Member, Council of State, India), Letters on Hindu-Muslim Pact, Oriental Printers & Publishers : Calcutta, 1924 ; Maulana Abul Kalam Azad, India Wins Freedom, p. 21 ; মুজফ্ফর আহ্মদ, কাজী নজরুল ইসলাম, পৃষ্ঠা : ৩৫৯-৩৬০.

হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট সম্পর্কে মুসলমানদের মনোভাব মৌলবী আবদুল করিম লিখিত পুস্তিকা থেকে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

১২৭. Report on the Administration of Bengal 1923-24, part I, p. iii.

১২৮. Ibid ; 'Bengal Council : Its Work' by Whip, an article, in Forward, Sunday, 13 April, 1924, p. 11.

১২৯. Report on the Administration of Bengal 1923-24, part I, p. v ; Forward, Thursday, 17 April, 1924, p. 4 ; Forward, Friday, 25 April, 1924, p. 4.

১৩০. Report on the Administration of Bengal 1923-24, part I, p. vi ; Manifesto issued under the signatures of Maulana Azad and Others, in Forward, Saturday, 5 April, 1924, p. 4 ; Rajen Sen (Compiled), Deshabandhu Chitta Ranjan Das, A Collection of Deshabandhu's Speeches, Vol. 1, Calcutta, 1927 ; আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃষ্ঠা : ৪৫-৫৬. বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সের পক্ষে প্রচারিত স্বাক্ষরকারী মুসলমান নেতৃবৃন্দের নাম হল : মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলবী মুজিবর রহমান, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মৌলবী শামসুদ্দিন আহমদ (নদীয়া), সৈয়দ মজিদ বক্স (যশোহর), আবদুল্লাহ বাগি (দিনাজপুর), মুহম্মদ কাজিম আলি (চট্টগ্রাম) এবং মৌলবী আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (ত্রিপুরা)।

১৩১. Bengal Swarajya Party : Council Meeting, in Forward, Wednesday, 26 August, 1925, p. 3 ; The Calcutta Municipal Gazette, June, 1925.

১৩২. 'Tenancy Bill', Editorial, in Forward, Tuesday, 24 November, 1925, p. 4 ; Forward, Sunday, 27 March, 1927, p. 17.

The Programme of the Swaraj Party 1923

I. "Destructive Aspects :—(1) Boycott of the Government controlled Schools and Colleges. (2) Boycott of law Courts. (3) Wrecking of the Councils. (4) Picketting at the gates of liquor shops. (5) Boycott of foreign cloth, in particular of British goods, and if necessary picketting to be resorted to.

II. "Constructive Aspects :—(1) Establishment of National Schools and Colleges. (2) Establishment of arbitration Courts. (3) Establishment of Congress Committees on a broad foundation so as to make the Congress a truly national organisation. (4) Elevation of the moral life of the nation and increase of temperance societies. (5) Khaddar production and revival of cottage industries.

III. "For National Regeneration :—(1) Formation of Labour Unions. (2) Formation of Peasants' Unions. (3) Asiatic Federation. (4) Establishment of branches of the Congress in all countries so as to cement a bond of union between all liberty-loving peoples.

IV. "The Final Blow : Resort to Wholesale Noncooperation :—(1) A long-continued Hartal on a nation-wide scale. (2) Renunciation of Government posts by all people all over the country. (3) Nonpayment of taxes. (4) Drafting of a Constitution. (5) The relations between different classes and communities under Swaraj Government.".

(Quoted from Forward, 27 March, 1927, p. 17.)

১৩৩. 'Middle-class Unemployed', Editorial, in Forward, 12 April, 1924, p. 4 ; 'Bengal Council : Its Work' by Whip, in Forward, 13 April, 1924, P. 11.

১৩৪. কংগ্রেস জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে ভূমি ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল না। জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোন কর্মপন্থা কংগ্রেস গ্রহণ করেনি। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি Deshabandhu Village Reorganisation Fund Committeeগঠন করে গ্রামোন্নয়নের এক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তখনও কংগ্রেস ভূমি সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের বিষয়ের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করেনি (Vide Forward, Sunday, 22 November, 1925. p 3). ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনে কমিউনিস্টরা একটি প্রস্তাবে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করার বিষয় উল্লেখ করে। এই প্রস্তাবটি দেখে বাংলাদেশের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "জমিদারেরা কংগ্রেসকে অর্থ সাহায্য করেন, আর উচ্ছেদ হবে তাঁদেরই"। অবশ্য এই প্রস্তাব পরাজিত হয় (দ্রঃ মুজফ্ফর আহমদ, সমকালের কথা, পৃষ্ঠা : ১১৯ ; মুজফ্ফর আহ্মদ, প্রবন্ধ সঙ্কলন, কলিকাতা, ১৩৭৭, পৃষ্ঠা : ৭৪-৭৫, ২০৬)।

১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ সম্পর্কে স্বরাজ্য পার্টির মুখপত্র ইংরেজি দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' ও বাংলা সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' নামক কাগজের সঙ্গে মুজফ্ফর আহ্মদ সম্পাদিত 'গণবাণী' কাগজের যে বিতর্ক হয় তা উল্লেখযোগ্য। এই বিতর্কে কবি নজরুল ইসলামও অংশ গ্রহণ করেন এবং তিনি 'ফরওয়ার্ড' ও 'আত্মশক্তি' কাগজের ভূমিকা সমালোচনা করেন (দ্রঃ 'আত্মশক্তি'র সম্পাদকের নিকট লিখিত কবি নজরুল ইসলাম লিখিত পত্র, কৃষ্ণনগর থেকে, ৮ই ভাদ্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)। তখন 'ফরওয়ার্ড' কাগজের সম্পাদক ছিলেন সত্যরঞ্জন বকসী, আর 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক ছিলেন গোপাল লাল সান্যাল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ এপ্রিল 'ফরওয়ার্ড' কাগজে The

Situation in East Bengal নামে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাতে হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। যাঁরা অর্থনৈতিক কারণসমূহকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন তাঁদের এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সমালোচনা করা হয়। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধটি 'গণবাণী' কে উদ্দেশ্য করেই লিখিত (Vide Forward, Saturday, 23 April, 1927, p. 4). মুজফ্ফর আহ্মদ 'গণবাণী'তে এই প্রবন্ধের সমালোচনা করেন। (দ্রঃ মুজফ্ফর আহ্মদ, প্রবন্ধ সঙ্কলন, পৃষ্ঠাঃ ৮৫-৯১, ৯৭-১০৭)।
এই সময়ে 'ফরওয়ার্ড' ও 'আত্মশক্তি' হিন্দু-মুসলিম বিরোধে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিষয়টি আলোচনা করতে পারেনি, তা এই দুটো কাগজের সংবাদ পরিবেশন থেকেই বোঝা যায়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২ জুলাই 'আত্মশক্তি' কাগজে 'প্রাথমিক শিক্ষা এবং হিন্দু ও মুসলমান' এই নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তাতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যক্ত হয়। এই প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে কোর্টে মামলাও হয় (Vide Forward, Tuesday, 11 January, 1927, pp 3, 7)

১৩৫. Report on the Administration of Bengal 1923-24, Part 1, p. xi ; Forward, Tuesday, 8 April, 1924, p. 3 ; Forward, Thursday, 10 April, 1924, p. 8.

১৩৬. J. H. Hutton, Census of India, 1931, vol. I, Part I, Report, p. 390 ; A. E. Porter, Census of India, 1931, vol. V, Part I, Report, p. 390 ; Forward, Friday, 14 January, 1927, p, 7 ; Forward, Tuesday, 1 March, 1927, p. 7 ; Forward, Wednesday, 27 April, 1927, p. 8 ; মুজফ্ফর আহ্মদ, প্রবন্ধ সঙ্কলন, পৃষ্ঠা : ১৪০ ; Mustafa Nurul Islam, op. cit., pp. 283-310.
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৭ মার্চ বোম্বাই নগরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ খ্রী) কর্তৃক আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী দয়ানন্দ শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে অ-হিন্দুদের হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করেন। তখন থেকেই শুদ্ধি আন্দোলন হিন্দু সংস্কার আন্দোলনের প্রধান বিষয়

হয়। স্বামী দয়ানন্দের পরেও এই শুদ্ধি আন্দোলন অব্যাহত থাকে। অনেকেই স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে গোরক্ষা-সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রবর্তক বলে উল্লেখ করেন। গোরক্ষার পথ প্রশস্ত করবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারী 'গোরক্ষিণী সভা' স্থাপন করেন। (দ্র: দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দয়ানন্দ-চরিত, দ্বিতীয়-সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯২৯)

'হিন্দু সঙ্ঘ' নামে বাংলা সাপ্তাহিক কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এই কাগজে 'শুদ্ধি আন্দোলন' ও 'বর্তমান হিন্দু-মুসলিম সমস্যা' নামে দুটো প্রবন্ধ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর প্রকাশিত হওয়ায় সম্পাদক অনুজা চরন সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে মামলা হয়।

১৩৭. A. E. Porter, Census of India, 1931, vol. V, Part I, Report, p. 394.

১৩৮. Forward, March-April, 1927 ; Craig Baxter, The Jana Sangh A Biography of an Indian Political Party, Oxford University Press, Bombay 1971, pp. 14-15, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বরিশাল জেলার পোনাবালিয়া গ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এপ্রিল মাসে হিন্দু মহাসভার নেতা ডাঃ মুঞ্জে বরিশাল জেলা সফর করেন। তিনি ২৫ এপ্রিল বরিশাল শহরে এক জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি হিন্দুদের 'সংগঠন ও শুদ্ধির' পথ অনুসরণ করে হিন্দু সমাজকে সংহত করে অবস্থার সম্মুখীন হতে বলেন। এই বিষয়ে তিনি হিন্দু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই সময়ে হিন্দু মহাসভার শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন জেলায় গড়ে ওঠে এবং লাঠিখেলা ইত্যাদির মাধ্যমে হিন্দু যুবকদের সংগঠিত করার চেষ্টা হয়। অন্যদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোবল রক্ষার জন্য স্যার আবদুর রহিম, আবুল কাসেম ও ফজলুল হক বরিশালে যান। তাঁরা ৫ মার্চ (১৯২৭ খ্রী) পোনাবালিয়া গ্রামে গিয়ে স্থানীয় মুসলমানদের খান বাহাদুর হেমায়েতউদ্দীনের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বলেন (Vide Forward, 27 April, 1927, pp. 5-6 ; Forward, 22, 28-29 April, 1927 ; Forward, 3, 5 March, 1927)

১৩৯. Report of the Administration of Bengal 1929-30, Part I, pp. xxiv-xxviii ; M. Azizul Huque, The Man Behind the Plough, Calcutta, 1939, pp. 285-297.

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই পাট একটি প্রধান বাণিজ্য পণ্যে পরিণত হয়। পূর্ববঙ্গের যে সমস্ত জেলায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন, প্রধানতঃ সেইসব জেলাতেই সবচেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হত। আর বেশীর ভাগ পাট চাষী ছিল মুসলমান। পাট ব্যবসা থেকে যে লাভ হত তার মোটা অংশ পাটকলের ইংরেজ মালিক, আর লাভেরকিছু অংশ বাঙালী হিন্দু ও মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী-মহাজনের পকেটে যায়। পাটচাষ ও ব্যবসাকে ভিত্তি করে এক শ্রেণীর সম্পন্ন মুসলিম কৃষক ও ব্যবসায়ীর আবির্ভাব হওয়ায় তাঁরা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হন। অন্যদিকে মুসলমান পাট চাষীর অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। এই অবস্থায় পাট চাষ ও ব্যবসাকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পথ প্রশস্ত হয়। ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সংকটের ফলে পাট ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয় ও পাটের মূল্য ভয়ানক হ্রাস পায়। সাধারণতঃ বেশীর ভাগ কৃষক পাট বিক্রি করে যে কাঁচা টাকা পায়, তাই দিয়ে সে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ কেনে এবং জমিদার-মহাজনদের পাওনা টাকা মিটিয়ে দেয়। কিন্তু এই অর্থনৈতিক সংকটের ফলে কৃষকেরা আরও বিপন্ন হয়। জমিদার-মহাজনেরা তাঁদের প্রাপ্য টাকা আদায়ে উদ্যোগী হওয়ায় যে বিরোধের সূত্রপাত হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের রূপ নেয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার দাঙ্গায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৪০. Ibid, pp. xxvii-xxviii

১৪১. Reforms Office Proceedings, File No. 171/30-R and File No. F. 194/31-R, in the National Archives of India, New Delhi. (Henceforth abbreviated as R. O.P.)

১৪২. R. O. P., File No. F. 194/31—R.

Risolutions by the All India Muslim League dated 26th & 27th December, 1931 :

"Resolution No. 8.—That this meeting of the All India Muslim League views with the greatest concern the movement set afoot in certain provinces inciting tenants to refuse to pay rents as calculated eventually to upset the principle of private property and thus to bring about a state of disordor and lawlessness in the country and expresses strong disapproval of all such movements."

"Resolution No. 9—That this meeting of the All India Muslim League expresses its strong condemnation of the terrorist movement culminating in dastardly and outrageous crimes and appeals to all sections of society to put forth their best efforts to combat such activities." (Ibid)

১৪৩. Ibid.

১৪৪. Ibid.

১৪৫. Ibid.

১৪৬. Ibid, File No. 159/32-R

১৪৭. Bengal Muslim Conference, Presidential Address by Mr. A. H. Ghuznavi, M. L. A., pp. 1-8, in R. O. P., File No. 159/32-R.

১৪৮. R. O. P., File No. F. 62/32-R ; File No, 10, 1933 ; File No. 10/34-R.

১৪৯. মুজফ্ফর আহ্মদ, প্রবন্ধ সঙ্কলন ; J. H. Broomfield, Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth Century Bengal, Bombay, 1968 ; আবুল মনসুর আহমদ, রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ; অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক।

১৫০. অতুল চন্দ্র গুপ্ত, জমির মালিক, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১, পৃষ্ঠা : ১১-১২

১৫১. ঐ, পৃষ্ঠা : ১২-১৩ ; Humaira Momen, Muslim Politics In Bengal A Study of Krishak Praja Party And The Elections of 1937, Dacca, 1972.

১৫২. The Bengal Legislative Assembly Proceedings, Thirteenth Session, 1942, vol, LXII, No. 2, Calcutta, 1942, pp. 34-37 ; অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক।

১৫৩. কৃষ্ণবিনোদ রায়, তেভাগার লড়াই, কলিকাতা, ১৯৪৬ ; মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, কৃষকসভার ইতিহাস, পৃষ্ঠা : ১৫৩-১৫৯ ; Sunil Kumar Sen, Agrarian Struggle in Bengal, 1946-47, New Delhi, 1972.

১৫৪. Professor Nirmal Kumar Bose's Diary and Gandhi Papers, in The Asiatic Society, Calcutta; Gandhi-Bose Papers, vol. II (1945 to 1947), MS-E-83, In 1946—pp. 139-203 ; 'Communal Rule in Bengal : Some Facts and Figures : 1937-46 in retrospect'—Typed copy, p. 469. অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর ডায়েরী থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর নিকট যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় : "In many portions of Bengal, the cultivators are Muslims and the proprietors Hindus. Recently in some places, the Muslim tillers have refused to till the land under Hindu owners. What should the Hindu owners do under the circumstances ?" (Gandhi-Bose Papers, vol. II, p. 139). ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারী কংগ্রেস কর্মীরা মহাত্মা গান্ধীকে বলেন, পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে। মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ নিয়েও বিরোধ হচ্ছে (Ibid, pp. 143-145). ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারী বরিশাল থেকে কংগ্রেস নেতা সতীন সেন মহাত্মা গান্ধীকে একই মনোভাব ব্যক্ত করে লেখেন, মুসলিম লীগ আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে (Ibid,

p. 185). ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধীকে লেখা হয়ঃ "Some interested people of scheduled caste especially 'Namasudras' are trying to induce the scheduled caste people to go against the caste Hindus. These are being done in connection with election campaign... Agents of Muslim League are trying to stop to cultivate lands owned by the caste Hindus. In many places they have become successful. Please show us the way to deal with this problem.." (Ibid, p. 187).

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারী বিক্রমপুরের (ঢাকা) কংগ্রেস কর্মীরা মহাত্মা গান্ধীকে লেখেনঃ "The communal situation in Eastern Bengal, particularly Dacca, is worsening day by day...In almost all the riots in Bengal the Hindus suffer the most···In many places in East & North Bengal, the immersion ceremony of images could not be held owing to the demand of the Moslems to stop music before mosques. Formerly they demanded the stopping of music only during prayer-time, but now they demand it for all time. This has been the cause of disturbances almost every year. Please advise us what to do in the matter" (Ibid, pp. I99-203)

১৫৫. প্রমথ চৌধুরী, রায়তের কথা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা, পুণর্মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৫৪, পৃষ্ঠাঃ ৪২

১৫৬. Note of Dissent by Sir Bijay Chand Mahtab and Brajendra Kishore Roy Chowdhury, in Report, vol. 1, 1940, p. 233.

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার বিজয় চাঁদ মহতাব ও ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী তাঁদের নোটে লেখেনঃ "To make extinct the great land-

holders in the Province may not be so difficult, although they might deserve greater consideration as they and their ancestors contributed in no small measure in the past to the establishment of many of the charitable and educational institutions to be found in the Province to-day. But with the disappearance of all intermediary landlords, who have formed the backbone of the Province, and the intelligentsia and are the creators of modern social and political Bengal, we shall be running the definite risk of a social upheaval of a magnitude which requires very careful thought, for with an undeveloped Proja Party and Raiyats' Associations we might easily usher in Communism which would become a menace to the state itself. The Province is not ready for such a revolutionary step and that is why we consider the proposal of state-purchase as unsound in practice, premature and inopportune." (Ibid).

পরিশিষ্ট 'ক'

[আমি এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে রাধাকান্ত দেবের ভূমিকার এক নবমূল্যায়ণ করার চেষ্টা করেছি। অনেকেই রাধাকান্তকে 'রক্ষনশীল' বলে সমালোচনা করেন। রাধাকান্তের মন যে কতটা আধুনিক জীবনধারার উপযোগী ও বিজ্ঞানমুখী ছিল তার পরিচয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ আগস্ট রাধাকান্ত লিখিত এই পত্র থেকে পাওয়া যায়। এই পত্র পড়ে বোঝা যায়, তখন কলকাতা শহরের যাঁরা 'উদারপন্থী' ও প্রগতিশীল' নামে খ্যাত ছিলেন তাঁরাও অনেকে বসন্তের টীকা দেবার প্রয়োজনীয়তা 'রক্ষণশীল রাধাকান্তের' মত ততটা উপলব্ধি করতে পারেননি। রাধাকান্তের ভূমিকা বিশ্লেষনে এই পত্রটি একটি মহামূল্যবান দলিল। ইতিপূর্বে আর কোন গ্রন্থেই এই পত্রটি কেউ উল্লেখ বা ব্যবহার করেননি। তাই ইণ্ডিয়া জার্নাল অব মেডিক্যাল সায়েন্স (ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৪ খ্রী, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) থেকে সমগ্র পত্রটিই এখানে উদ্ধৃত করা হল। এই বিষয়ে রাধাকান্ত দেব ক্যামিরুণকে আরও একখানি পত্র এর আগে লিখেছিলেন। কিন্তু সেই পত্রটি আমি উদ্ধার করতে পারিনি।]

Vaccination—Letter to Mr. Cameron

Vaccination.

By Baboo Radakant Deb.

To W. Cameron, Esq. &c. &c, Calcutta.

My dear Sir,—I have attentively perused the "History of the Cow Pox", contained in the accompanying (Plumbe's) work on Vaccination, which you did me the honor to hand to me ; some months ago, for the purpose of making my remarks on the same, as well as on your valuable report on

the present state of Vaccine inoculation in Bengal, and have found that Dr. Jenner's experiments and remarks as stated in the work in question are simple and satisfactory, and have therefore no hesitation in recommending their insertion in the second edition of your report, and its translation into the vernacular languages, for the use of the native practitioners.

The substance of the history alluded to, is, that about 64 years ago, or in 1768, Edward Jenner was aware of a distemper named Cow Pox which infected the teats of milk cows, and equally the hands of the milkers ; that from various incidents he was enabled to draw this conclusion that it was a peculiar property of the cow pox to prevent any infection from the small pox ; that it might be possible to propagate the cow pox by inoculation, not only from the cow to the human subject, but also from man to man ; that in 1796 "he had acquired a correct knowledge of the appearance of the malady, and selected a healthy boy to make the first trial of inoculating one human being from another with the cow pox virus ; that in 1798, being satisfied with the result of his experiments, he resolved to lay them before the public ; and that Mr. Cline made his first trial with the vaccine in St. Thomas's hospital."

Although the inoculation by the natural poc has been known to the natives of Bengal from time immemorial, long before Dr. Jenner made known his theory, yet this peculiarity in the cow pox as a preservation from small pox infection was totally unknown to them until of late, nor had they ever used the vaccine lymph on any occasion, for this reason, because when the disease becomes common

amongst cattle, which it does at certain seasons of the year, cows scarcely escaped it, and moreover they were ever averse from nature or the prejudices of caste, to insert the purulent matter* from the body of a beast into that of a human being, and therefore they particularly abominate the vaccine virus to the present day, and are very far from being made easy converts to the vaccine philosophy. Following the examples of their predecessors, their prejudices cannot I imagine, be easily overcome in this respect, while doubts still exist even in Europe, whether the prevention be finally established, as the author of the History of Cow Pox observes, that "the friends of vaccination sleep, but its enemies are wakeful and active, and with shame be it spoken they have enrolled themselves even in the ranks of that profession to whom Providence has condescendingly given the greatest power and influence in its support and propagation".

The religious prejudices of the natives respecting vaccination, might perhaps be abated, if the subject be properly explained to them, and its advantages pointed out with some comments, caculated to remove even their religious aversion to drawing matter from an incision on the corpus sacrum, so that although the slaughter of such animals as cows, and the consumption of their flesh in this Calee age are prohibited and severe penances prescribed by the "Hindu Shasters" or Laws, yet it is also strictly enjoined that every substance or matter derived from the cow is to be esteemed pure and

*The worthy Baboo is mistaken, the virus of lymph of the vaccine disease is not a purulent matter or pus, but a clear transparent viscous or gum-like fluid. When the pustule on the contrary puts on a purulent appearance, it is a sign that it is spurious.—Editors.

holy to the degree that even its animal putrescences are not to be abhorred, consequently no objection can be admitted for the use of vaccine matter, which is equally so derived, or make the case less objectionable, even if they may get their children vaccinated by their own Tikadars, and worship the goddess "Setula" and live with the same care and abstinence which they would observe in the use of the natural poc, till the recovery of the patients be effected, but their country customs and family usages being dictated by their religion, are so cemented within their breasts, that they cannot be altered without great difficulty.

With respect to your report, the chief causes of the slow progress of vaccination in this country as pointed out by Dr. Shoolbred, and cited by you, are just and proper, but the only reason I can assign, is, that the natives of this country; particularly the Hindus, are so addicted to religious prescriptions (which connect their moral and physical obligations), believing them to be the best and primary above all, as observed by the Sages from time immemorial, they cannot but regard every example of deviation from them or their ancestors, whom they consider to have been more civilized, enlightened, and learned than themselves, as highly criminal; wherefore they are indifferent to any improvement which their religious usages do not confirm, which is the case with every proposition of the moderns. They disregard the advice and publications, particularly foreigners, whom their females know nothing of, these females presiding over many domestic concerns, are always averse or afraid to introduce any new practice not within the limits of their own understandings. The coercive and compulsory measure, which in the first

instance, adapted against the same pox inoculators, for introducing the practice of vaccination, induced many to quit the presidency, hence the respectable native inhabitants of Calcutta sent their children to the interior, to have them inoculated, and a few of the lower classes were vaccinated in town. In consequence of which your expectations for the removal of the obstacles to the general extension of the practice amongst the native community, must have I think, been imperfectly realized, or much disappointed.

The natives of this place do not admit, that Calcutta, through its agency is the great generating focus of variolous infection, from whence it spreads to every other part of Bengal, as stated by you, because this disease and their practices are prevalent everywhere, and has been so from time out of mind. If variola is the cause of occasional alarm and to those who have been vaccinated, as mentioned by you, the individuals who are not friendly to vaccination, might have good reason to question its effiicacy in preventing the small pox.

You have indeed formed a wise plan, to prevail on the Tikadars to become Vaccinators, and to appoint them to offices under your charge, whereby they will no doubt discharge their duty with attention ; but you should not recommend any compulsion or punishment when they follow their long established operation, in order to introduce a new and unexplored practice in its stead, while the efficacy of the latter they have not yet been convinced of, as admitted by yourself.

You further report, that a few respectable natives in Calcutta have had their children vaccinated ; the original

cause of which I have herein before specified, and beg to propose a method of propagating the practice among them more extensively ; that as the Tikadars cannot exercise any influence over them, the medical gentlemen of Calcutta may therefore communicate first with those opulent young Baboos, that are styled by Europeans, liberal and enlightened, since they do not care much for their religion, or ancestors, and may easily come forward to get their children vaccinated, and then go on with the collegiates, who are anxious to imovate or reform them, and would perhaps readily adopt the improved practice, either now, or after the demise of their old parents. You will thus succeed step by step, as Dr. Jenner did, without annoying the poor Tikadars, or the orthodox Hindoos.

As it is mentioned in the replies to the Medical Board's circular, "that although vacccination is not so perfect an antidote as it was once thought to be against small pox, it is at least the best that is to be had", the enemies to vaccination might employ this deniable proof to oppose the vaccine practice by, as an imperfect antidote, and have just grounds to prefer their long experienced practice as one less defective.

In cases of a second attack of the natural small pox proving fatal, although the patient had been deeply pitted by the first attack, which is mentioned in the letters submitted by the Medical Board, it is not a satisfactory proof in the opinion of native practitioners, who ascribe the mark supposed to have been made by the first attack, to the chicken pox, or other eruptive diseases, as they are well convinced by long experience, that one who had undoubtedly had the natural small pox once, by proper inoculation or

infection, is never liable to the recurrence of the malady, in consequence of which they exert themselves to induce fever and pocks after inoculating their patients, as particularized in my first letter to you. If this case be well founded in fact, a similar course might be observed in vaccination, but rare cases in either practice should not be considered universal but accidental.

It is a favorable circumstance noticed by you, that when a most virulent epidemic of the small pox visited the city of Norwich in 1820, only two died of the small pox, out of ten thousand vaccinated persons (though they otherwise appear liable to contagion,) and that the Government have been pleased to order the persons educated at the native Medical Institution, to be instructed in the practice of vaccination, and sent to stations where the natives had previously no means of availing themselves of this blessing. The testimony you bear to the results of this experiment in Muneepore, is also promising.

A precautionary measure you recommend is that children sent from this country should be re-vaccinated on their arrival in England, as the constitution is liable to very great modifications by change of climate ; but the Tikadars assure us, and others positively declare that the children which have properly passed through the small pox inoculation, never require a repetition of the same, though they may traverse any part of the globe, for which they consider this practice more secure and salutary than any other.

Regarding the freedom of children from all diseases before the performance of the inoculation, the specific power of the mature dry scab, the time for taking lymph, and the

mode of insertion of the virus, our Tikadars quite concur with you, but the vaccine vesicle alone without communicating principle so as to produce pocks on the patients, appears by no means satisfactory and unobjectionable to them, or to the parents of the children, because they affirm that the human body is subject to variola, which having been produced ever so slightly, by variolous inoculation, prevents the recurrence and infection of the disease in future, for which especial reason they prefer the small pox inoculation to vaccination.

The opinion of Dr. Thomson, annexed in the concluding part of your Report, states, that the protection which vaccination affords against the fatality of small pox, is at least equal, if not superior, to that which is afforded by passing through the small pox themselves, even in the natural way. The natives agree with the celebrated Doctor, so far, that if the vaccinating and the passing through the natural small pox are in his opinion equal protections against the fatality of the disease, they have previously ensured similar security by adopting variolous inoculation, and thereby observed the ancient custom of their forefathers (which is incumbent on them,) with a firm conviction that they had practiced it with safety, before all other nations.

There are, I believe, the general opinions or prejudices of the natives of India in favour of variola, and their objections to vaccine practices. As I need not offer any remark on the documents contained in the appendix of your report, I finish this letter with esteem and regard,

My dear sir, yours very sincerely,

Radhakant Deb.

Calcutta, August 13, 1832.

[Quoted From : The India Journal of Medical Science, Edited by Messrs. J. Grant and J. T. Pearson, vol. I, No. 2. Calcutta, February, 1834, pp. 34-36].

নির্দেশিকা

মুদ্রণ ত্রুটি সংশোধন

৪ পৃষ্ঠায় প্রথম পংক্তির পরে 'পর্যবসিত হয়' এর পরে ফুটনোটের ৩নং ; ১১৮ পৃষ্ঠায় রসিক এর পরিবর্তে রফিক ; ১৫৯ পৃষ্ঠায় 'সচেতন করে তুলছে' এর পরে ফুটনোটের ৩১নং ; ১৭৩ পৃষ্ঠায় বগুড়া—৮০·৩৭ ; ১৯২ পৃষ্ঠায় প্রথম পংক্তির শেষে 'কাজ হবে' এর পরে ফুটনোটের ১০৩নং ; ১৯৪ পৃষ্ঠায় ১০৭ নং ফুটনোটে আমহার্ষ্ট এর পরিবর্তে অ্যাডাম ; ২১৫ পৃষ্ঠায় ৫নং ফুটনোটে Sinha, II, Chapter I, VIII-IX ; ২২৩ পৃষ্ঠায় ৫৭নং ফুটনোটে Buchanan ও ২২৪ পৃষ্ঠায় Table XIII ; ২৩২ পৃষ্ঠায় ফুটনোটের ৮৭নং এর পরিবর্তে ৭৯ ; ২৪১ পৃষ্ঠায় ফুটনোটের ১৫৬নং এর পরিবর্তে ১৫৩ ; ৩০৩ পৃষ্ঠায় 'ধূমকেতু'র আয়ু ; ৩২৮ পৃষ্ঠায় ১৫৫নং ফুটনোট পর্যন্ত উদ্ধৃত অংশ ; ৩৪৪ পৃষ্ঠার পরে ৩৪৫ পৃষ্ঠা হবে।